প্রকাশক :
ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
৬/১-এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন,
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
২৩ অগাস্ট, ১৯৭২

মুদ্রাকর :
বিনয় রতন সিংহ
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪১, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

শ্রীঅরবিন্দ সাত বছর বয়সে বিলেতে যান এবং তাঁর পিতা তাঁকে যেভাবে রেখেছিলেন তাতে তিনি নিজের মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলতেও পারতেন না। ১৩ বছর বিলেতে থেকে দেশে ফিরে আসার পর তিনি বাংলা শেখেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে বিলেতে থাকতেই তিনি নিজের দেশের রাজনীতিক অবস্থার কথা খুব ভালই জানতেন এবং এ বিষয়ে তিনি যে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন তার প্রমাণ দেশে ফিরে এসে বরোদায় চাকরী নেবার অল্পকাল পরেই তিনি বম্বে থেকে প্রকাশিত 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় "New Lamps for Old" এই নামে যে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন তাতেই তৎকালে প্রচলিত কংগ্রেসের মতবাদ ও কর্মপন্থার প্রতিবাদ সর্বপ্রথম ধ্বনিত হয়ে ওঠে। তারপরে যখন তিনি বাংলায় স্থায়ীভাবে এসে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, তখন 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় তিনি বহু প্রবন্ধ লেখেন এবং এক সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালীতে মুক্তি সংগ্রামের পথ নির্দেশ করেন।

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে কীর্তিমান ব্যক্তি। বহু বছর ধরে তাঁরা দুজনে জাতীয় ইতিহাসের গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। অসাধারণ নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের দ্বারা তাঁরা শ্রীঅরবিন্দের বহুসংখ্যক অতীব মূল্যবান রচনা দুষ্প্রাপ্য 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে বৈপ্লবিক 'যুগান্তর' পত্রিকা থেকে তাঁরা যে সকল প্রবন্ধ উদ্ধার করে পাঠকদের উপহার দিলেন, তা জাতীয় ইতিহাস রচনার পক্ষে অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে।

আমি একাধিকবার এরূপ মত প্রকাশ করেছি যে, যে-দুটি প্রণালীতে আমাদের মুক্তি সংগ্রাম অগ্রসর হয়েছে এবং যার ফলে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি—সে দুটিরই অগ্রদূত শ্রীঅরবিন্দ। বাংলার বিপ্লববাদ ও মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন—এই দুটি পথের কথাই আমি বলেছি। শ্রীঅরবিন্দ যে বিপ্লববাদের অগ্রদূত ছিলেন অনেকে তা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের নিজের স্বীকৃতিই তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আবার, অসহযোগ আন্দোলনের যে কটি পর্যায় মহাত্মা গান্ধী নির্দেশ করেছিলেন তার সবগুলিই অরবিন্দ তের চৌদ্দ বছর আগেই বিষদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন

এবং তাঁর এই প্রবন্ধগুলি Passive Resistance নামে পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অথচ মহাত্মা গান্ধী এই নূতন প্রণালীর উদ্‌ভাবন কর্তা হিসাবে Thoreau ও Tolstoy প্রভৃতির নাম করেছেন কিন্তু অরবিন্দের উল্লেখ করেন নি এবং এইজন্যই দেশের অনেকে তা জানে না। ১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস সর্বপ্রথমে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করে, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তার বহু পূর্বেই এই চরম লক্ষ্যের কথা পুনঃ পুনঃ বলেছেন। সুতরাং ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শ্রীঅরবিন্দের দান যে কত ব্যাপক অনেকেরই তা ধারণা নেই।

বর্তমান গ্রন্থখানিতে শ্রীঅরবিন্দের যে সমুদয় প্রবন্ধ ও উক্তি প্রকাশিত হয়েছে তা পড়লে শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিক চিন্তাধারার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে। শ্রীহরিদাস ও শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় শুধু দুষ্প্রাপ্য তথ্য উদ্ধার করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তাঁরা ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শ্রীঅরবিন্দের অবদানও নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে "শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ" সম্বন্ধে তাঁরা যে সুদীর্ঘ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন তা সরকারী ও বেসরকারী বহুরকম দলিলপত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত "ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতীয় বিপ্লববাদ" নামে তাঁদের প্রবন্ধটি বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকার উপর অভিনব আলোকপাত করছে। আই. বি. অফিস থেকে সংগৃহীত শ্রীঅরবিন্দের দুখানি দুষ্প্রাপ্য ফটো পুস্তকে সংযোজিত হওয়ায় পুস্তকের মূল্য আরও বেড়েছে। এগার বছর পূর্বে তাঁদের "স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ" গ্রন্থের ভূমিকা লেখাকালীন আমি মত প্রকাশ করেছিলাম, "বস্তুত বঙ্গদেশের —তথা ভারতবর্ষের—এই নবজাগরণের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহারা পথিকৃৎ (pioneer) বলিয়া পরিগণিত হইবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" আজ আমার সে ধারণা আরও দৃঢ়তর হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থখানির আমি বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার

৪ বিপিন পাল রোড,
কলিকাতা-২৬
২৩৮।১৯৭২

প্রস্তাবনা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বাংলার বৈপ্লবিক দলের মুখপত্র "যুগান্তর" পত্রিকার ভূমিকা অনন্য। এর পরমায়ু মার্চ, ১৯০৬ থেকে জুলাই, ১৯০৮ পর্যন্ত। কিন্তু এই স্বল্পপরিসর সময়ের মধ্যে "যুগান্তর" পত্রিকা যেভাবে জনমানসে নিয়ে এলো এক বৈপ্লবিক রূপান্তর—ভাবে, বিশ্বাসে ও কর্মনীতিতে—তা জাতীয় ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। "যুগান্তরে"র ভাবনায়ক ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। "বন্দে মাতরমে"র অরবিন্দ বয়কট বা নিরস্ত্র প্রতিরোধ দর্শনের উদ্গাতা, "যুগান্তরে"র অরবিন্দ বিপ্লবের দার্শনিক। আর এই দুইয়ে মিলে অরবিন্দের রাজনীতিক ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ। বয়কট দর্শনের উদ্গাতা অরবিন্দের উত্তরসাধক হলেন মহাত্মা গান্ধী, বৈপ্লবিক অরবিন্দের উত্তরাধিকারী হলেন নেতাজী সুভাষ বোস। এই দুই প্রতিনিধিপুরুষের সংগ্রামের সম্মিলিত ধারা সম্ভব করে তুললো ১৯৪৭-এর ভারতীয় স্বাধীনতা।

বৈপ্লবিক দলের মুখপত্র "যুগান্তর" পত্রিকা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এর পৃষ্ঠায় ১৯০৬–০৭ সনে যে সকল মূল্যবান রচনা বের হয়েছিল তা থেকে সঙ্কলন করে "মুক্তি কোন্ পথে" নামক পুস্তক "যুগান্তর" অফিস থেকে প্রকাশ করা হয়। "যুগান্তর" পত্রের ম্যানেজার অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন ঐ পুস্তকের প্রকাশক। আলাদা আলাদা চার ভাগে পুস্তকখানি বের হয়েছিল। প্রথম ভাগ বের হয় জানুয়ারী, ১৯০৭ সনে, দ্বিতীয় ভাগ ফেব্রুয়ারী মাসে; তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ বের হয়েছিল ১৯০৮-এর গোড়ার দিকে, খুব সম্ভবত ফেব্রুয়ারী মাসে।

বর্তমান গ্রন্থে "মুক্তি কোন্ পথে" পুস্তকের বিভিন্ন ভাগ থেকে বাছাই করে বত্রিশটি রচনা পুনর্মুদ্রিত হলো। "মিথ্যা ভয়" ও "মিথ্যার পূজা" প্রবন্ধ দুটি আমরা পেয়েছি অশ্বিনী কুমার দত্তের বাঁধানো Paper Cuttings থেকে। "মিথ্যার পূজা" প্রবন্ধটি অরবিন্দের রচনা। জাতীয় ইতিহাস রচনার আকর উৎস হিসাবে এই লেখাগুলির গুরুত্ব যে কত বেশী তা ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করবেন।

গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে আমরা সব থেকে বেশী উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছি আচার্য রমেশ চন্দ্র মজুমদারের কাছ থেকে। তিনি এই গ্রন্থের জন্য একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। সেই সঙ্গে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাবো আই. বি. অফিসের কর্তৃপক্ষকে যাঁরা

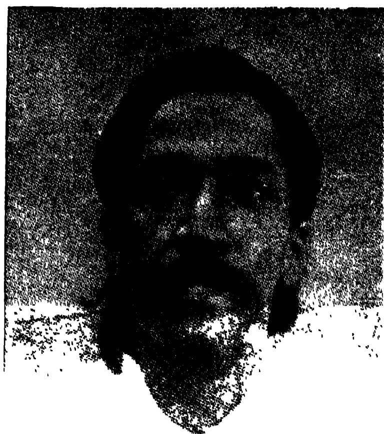
আমাদেরকে শুধু ঐ অফিসের রেকর্ডস্ পড়ার সুযোগ সুবিধাই দেন নি, তাঁরা আমাদের শ্রীঅরবিন্দের দুখানি দুর্লভ ফটোও দিয়েছেন—যে দুখানি ফটো অরবিন্দ আলিপুর বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হবার (২রা মে, ১৯০৮-এর) অব্যবহিত পরেই পুলিশ কর্তৃক তোলা হয়েছিল। ঐ ফটো দুখানি বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত হলো।

পরিশেষে আর একটা কথা। বিপ্লবের ধ্যান-ধারণা যুগে যুগে পাল্টায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম যুগের নেতারা বিপ্লবের যে ধ্যান-ধারণা পোষণ করতেন তাঁর সঠিক পরিচয় এই গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকেরা পাবেন বলে আশা করি। ব্যক্তি হত্যার থেকে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ার দিকেই তাঁদের নজর ছিল বেশী। শ্রীঅরবিন্দ "stray assassinations"কে বরদাস্ত করেন নি; বারীন ঘোষও তৎকালে বলেছিলেন, "I do not believe that such political murder will bring about our desired regeneration of our motherland." বৈপ্লবিক আদর্শের অনুকূলে জনমত সংগঠিত করতে না পারলে শুধু ব্যক্তি হত্যার দ্বারা কোনো দেশে বিপ্লব সাধন হতে পারে না—তৎকালীন বৈপ্লবিক দলের নায়কদের এই ছিল সুচিন্তিত ধারণা। "যুগান্তরে"র প্রবন্ধগুলি পড়লে পাঠকেরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, সেকালের বৈপ্লবিক আন্দোলন কতকগুলি হুজুগে ও ভাবপ্রবণ যুবকের শুধু খামখেয়ালীপনা ছিল না—আন্দোলনের পেছনে একটা মস্তবড় জীবন-দর্শন ও রাজনীতিক মতবাদ বর্তমান ছিল। বিপ্লবান্দোলনের প্রথম পর্বে (১৯০৬-০৮) যে আদর্শ প্রচারিত হলো, দ্বিতীয় পর্বে (১৯১১-১৯১৫) রাস বিহারী বোস ও বাঘা যতীনের নেতৃত্বে সেই আদর্শ সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টায় পরিণতি লাভ করে। ভারতের অভ্যন্তরে থেকে সশস্ত্র বিপ্লব ব্যর্থ হলে ভারতীয় বিপ্লব-সাধনা দেশের বাইরে শক্তি সংগঠনে আত্মনিয়োগ করে। ভারতীয় বিপ্লব-সাধনার এই শেষ পরিণতি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বে ও কর্মে অভিব্যক্ত হলো।

'শিক্ষাতীর্থ'
পি, ১২, শ্রীরামপুর, গড়িয়া
২৪ পরগণা
২৩শে অগাস্ট, ১৯৭২

উমা মুখোপাধ্যায়
হরিদাস মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র





"যুগান্তরের আবার সম্পাদক কে? যুগান্তর ত জাতীয় ভাবসমষ্টি মাত্র। লোকের প্রাণের ভিতর দিয়া যে ভাবস্রোত ছুটিয়াছে তাহার এক একটা কণা মাত্র যুগান্তরে আসিয়া ধাক্কা লাগে। সম্পাদক ত তাহা অভিব্যক্তির যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রকে ধরিলে যন্ত্রী ত ধরা পড়ে না; যন্ত্রী যে অশরীরী। ঐ যে পালে পালে উন্মাদ বালকের দল 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া অজানা লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে, ঐ যাহারা নৃমুণ্ডমালিনীর খর্পর তলে আত্মবলিদান দিয়া অমরত্ব লাভের জন্য উৎসুক—তাহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে; তাহারাই যুগান্তরের সম্পাদক।"

—অরবিন্দ ঘোষ, 'যুগান্তর', ৫ই আগস্ট, ১৯০৭।

শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ

॥ ১ ॥

স্বাধীনতা আন্দোলনে সহিংস পন্থার প্রয়োজনীয়তা

পরাধীন জাতির মুক্তি সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও শুধু বৈধ নিয়মতান্ত্রিকতার সরল পথ ধরে অগ্রসর হয় নি। ঘটনার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নব নব চিন্তাধারা আবির্ভূত হলে নতুন নতুন কর্মপন্থাও গৃহীত হয়ে থাকে। সাধারণত অহিংস ও নিয়মতান্ত্রিক পথ ধরে মুক্তি সংগ্রাম সুরু হলেও সময়ের যাত্রাপথে সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে হিংসাত্মক কর্মনীতি বা বিপ্লববাদ দেখা দেয়। আবেদন-নিবেদন বারে বারে নিষ্ফল হলে জনতার ধূমায়িত বিক্ষোভ একদিন বিপ্লবের আকারে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। সাধারণ অবস্থায় মানুষ ঝড় ও বজ্রপাতের মধ্যে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি দিতে চায় না, কিন্তু ঐ দুঃসাধ্য ব্রত অনিবার্য হলে তাকেও গ্রহণ করতে নিরস্ত হয় না। ১৭৮৯ সনের ৫ই মে ফরাসী দেশে বিপ্লব সুরু হলে প্রথম দিকে তা ছিল মূলত অহিংস ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এর বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক রূপ বদলে গেল, দেখা দিল এর ভয়ঙ্কর অগ্নিগর্ভ চেহারা। ১৪ই জুলাই মারমুখ জনতার প্রচণ্ড আঘাতে রাজ-কারাগার ব্যাস্টাইলের পতন ঘটলে সারা ইউরোপ আঁতকে ওঠে। আবার, বর্তমান শতকের প্রারম্ভে ডাঃ সুন ইয়াৎ-সেনের অধিনায়কত্বে চীন দেশে যে মুক্তি আন্দোলন আবির্ভূত হয় তার পরিণতি ঘটলো ১৯১১ সনের চৈনিক বিপ্লবে, কিন্তু এরও প্রথম সুচনা ঘটেছিল বৈধ নিয়মতান্ত্রিক শাসন সংস্কার আন্দোলনে। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে শাসন সংস্কারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পরই চীনাবাসীরা ডাঃ সুনের নেতৃত্বে গ্রহণ করতে বাধ্য হলো সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মধারা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসও ঐ একই সত্য নতুন করে উদ্‌ঘাটিত করেছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কোন অদ্ভুদ বা সৃষ্টিছাড়া কাহিনী নয়। অহিংস নীতি বা আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় প্রতিভার একচেটিয়া বৈশিষ্ট্য বলে কখনই দাবী করা চলে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের থেকে ভারতবাসীর সংসারনিষ্ঠা বা বস্তুতান্ত্রিকতা গভীরতায় ও ব্যাপকতায় কিছুমাত্র কম নয় * (১)। ভারতবর্ষ কেবল বুদ্ধ, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণকেই জন্ম দেয় নি ; কৌটিল্য, শিবাজী ও নেতাজীকেও প্রসব করেছিল। রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে অন্যান্য জাতিরা বাস্তব পৃথিবীর শতসহস্র আবেদনে যুগে যুগে যেভাবে সাড়া দিয়েছে, ভারতবাসীদের জীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। বিদেশীর শাসন শৃঙ্খল থেকে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় অন্যান্য দেশের বেলায় যা সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে, ভারতবাসাদের জীবনেও তার অন্যথা হয় নি। অন্যান্য দেশের মত এখানেও স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রথমে ক্ষুদ্রাকারে নিয়মতান্ত্রিকতার পথেই আবির্ভূত হয়েছিল। আবার অন্যান্য দেশের মত এখানেও সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে বিপ্লববাদের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে একটা নৈতিক লড়াই চালিয়ে ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সনে ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে নি * (২)। ১৯৪৭-এর ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য একমাত্র কংগ্রেস পরিচালিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে দায়ী বিবেচনা করলে ইতিহাসের ভুল ও বিকৃত ব্যাখ্যা করা হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনে নৈতিক শক্তি বা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের গুরুত্বকে হেয় মনে করবার কোনো কারণ নেই, কিন্তু অহিংসা মন্ত্রের জয়ধ্বনি তুলতে গিয়ে আমরা যেন সহিংস কর্মধারার গুরুত্বকে লঘু করে না দেখাই। মহাত্মা গান্ধীর কর্মসূচীর সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মনীতি যুগপৎ অনুধাবন করতে না পারলে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত গতি-প্রকৃতি সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। একথা আজ স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অরবিন্দের 'বয়কট' বা 'নিরস্ত্র প্রতিরোধ' (passive resistance) আন্দোলন অথবা গান্ধীর 'অহিংস অসহযোগ' আন্দোলন ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সর্বাংশে দায়ী নয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিকাশে ও পরিণতিতে বিপ্লববাদের স্বাক্ষর স্পষ্ট ও গণনীয়। ঊনিশ শতকের শেষ দশকে মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর তিলকের এবং চপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের রাজনৈতিক কাজকর্ম থেকে

সুরু করে ১৯৪৪ সনে পূর্ব ভারত-সীমান্তে ইম্ফল-কোহিমায় নেতাজীর সুগঠিত সামরিক অভিযান এবং ১৯৪৬ সনে বম্বেতে ভারতীয় নৌবহরে বিস্ফোরণ ও জলন্ত লাভা উদ্গীরণ পর্যন্ত যে রোমাঞ্চকর সংগ্রামী ঐতিহ্য তা' ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে কি অমিত প্রাণশক্তি ও দুর্বার গতিবেগ সঞ্চার করেছিল সে কাহিনী আজও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয় নি। আমাদের অন্যায় অবহেলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু যুগ-সারথীর স্মৃতিও ক্রমে ক্রমে জনমানস থেকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

॥ ২ ॥

কংগ্রেস আন্দোলনের প্রথম বিশ বছর

১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহের পর ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে যুগের সূত্রপাত হলো তাকে বলা যেতে পারে ভারতীয় জাতীয়তার ক্রমবিকাশের যুগ। পাশ্চাত্যের প্রবল ও সচল অভিঘাতে আমাদের জড়ত্বের অবসান হলো, জীবনে এলো আমূল পরিবর্তন, শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতিতে দেখা দিল বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবেগ। জাতীয় জীবনে দেশপ্রেম জাগ্রত হলো, ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতের মোহিনী মূর্তি মানুষের চেতনায় ভেসে উঠলো, মানুষ স্বাধীনতার জ্যোতির্ময় স্বপ্ন দেখতে সুরু করলো এবং সেই সঙ্গে দেখা দিল নিয়মতান্ত্রিক পথ ধরে স্বাধিকার লাভের একটা অস্ফুট ব্যাকুলতা। এই নব-উন্মেষিত জাতীয়তাবোধ মূর্তি পরিগ্রহ করলো ১৮৮৫ সনে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে কংগ্রেসের অবদান নিঃসন্দেহে বিরাট, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে যে ভারতীয় মুক্তি যুদ্ধের সমস্ত কৃতিত্ব শুধু কংগ্রেসের প্রাপ্য নয়। কারণ, কংগ্রেস-সংগঠন বহির্ভূত রকমারি শক্তি ও সংস্থা, বিশেষত ভারতীয় বৈপ্লবিকদের স্বদেশে ও বিদেশে বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টা—ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

ব্রিটিশ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস অল্পদিনের মধ্যেই (১৮৮৬ সন থেকে) রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে সীমাবদ্ধ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালাতে সুরু করে। প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রায় বিশ বছর ধরে (১৮৮৫—১৯০৫) কংগ্রেস ক্ষুদ্র আদর্শ ও সীমিত লক্ষ্য সামনে রেখে (যেমন

সমকালীন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা, ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত সভাসদের প্রবেশ, হোম চার্জ কমানো, দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ বিমোচন ইত্যাদি) আবেদন-নিবেদন ও প্রতিবাদের পথ ধরে তার কর্মপ্রচেষ্টাকে পরিণতি দিতে থাকে* (৩)। ইংরেজের স্বাভাবিক ঔদার্য ও মহানুভবতার উপর অগাধ আস্থা স্থাপন করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক আন্দোলনকে জয়যুক্ত করে তুলতে চাইলেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে তাঁরা সেদিন বিধাতার আশীর্বাদ বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনও থাকবে আবার সেই সঙ্গে ভারতবাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাও ঘটবে এই ছিল নেতৃবর্গের চিন্তায় প্রথম স্বীকার্য। বিংশ শতকের সূচনায়ও পুরানো আদর্শ ও পুরানো পন্থার মায়াজাল থেকে জাতীয় মানস মুক্ত হতে পারে নি। ১৯০২ সনে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির মঞ্চ থেকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের জন্য জাতির উদ্দেশে আবেদন রাখলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, "We plead for the permanence of British rule in India." স্বদেশী যুগের প্রাক্কালেও এ ধরণের বাণী বিপিন চন্দ্র পাল ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মত স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তির কণ্ঠেও বার বার উচ্চারিত হয়েছিল * (৪)। মোট কথা, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকালে এবং তারপরও বহুদিন পর্যন্ত আমাদের জনপ্রিয় নেতারা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার গণ্ডীবদ্ধ ধ্যান-ধারণাকে অতিক্রম করতে পারেন নি এবং সর্বাঙ্গীন জাতীয় পুনরুজ্জীবনের জন্য কোনো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণেও তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিদেশী শাসকদের সঙ্গে ভারতবাসীদের জাতীয় স্বার্থের যে অন্তর্নিহিত প্রকৃতিগত মৌল বিরোধ বর্তমান সে সত্য তৎকালে নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে ছিল অপ্রকট। সমাজের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী শিক্ষিত মুষ্টিমেয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাই সেদিন প্রতিফলিত হয়েছিল কংগ্রেসের ভাবে ও কর্মে। জনগণের সত্যকার প্রতিনিধিত্ব করবার মত শক্তি ও সাহস তখনও কংগ্রেস অর্জন করে নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতকে আবদ্ধ রেখে কংগ্রেস নেতারা তৎকালে বছর বছর কংগ্রেস মঞ্চ থেকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে শুভ প্রস্তাব পাশ করেই ক্ষান্ত থাকতেন।

॥ ৩ ॥

বাল গঙ্গাধর তিলক ও মহারাষ্ট্রে বিপ্লববাদ

এমন দিনে মহারাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক চাইলেন দেশের মধ্যে সত্যকার জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে। ইংরেজী শিক্ষিত বাবুদের পাশ্চাত্য-ঘেষা আন্দোলনকে ভারতীয়করণের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন তিলক। জনগণকে জাতীয় আন্দোলনে আকৃষ্ট করে তুলবার উদ্দেশ্যে তিনি মহারাষ্ট্রে গত শতাব্দীর শেষ দশকে প্রবর্তন করলেন শিবাজী উৎসব ও গণপতি উৎসব। জনমানসকে জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্মের আশ্রয় নিতেও দ্বিধাগ্রস্ত হলেন না। তিনি জনগণের সামনে তুলে ধরলেন স্বরাজ বা স্বাধীনতার নতুন ভাবাদর্শ। আরামকেদারায় বসে রাজনীতিক জ্ঞান জাহির করে আর আইন পরিষদে শব্দের তুফান তুলে স্বাধীনতার লড়াই এগুবে না। তার জন্য চাই দুঃখ ও কণ্টকের দুর্গম পথে পদযাত্রা। আবেদন নিবেদনের সহজ ও অভ্যস্ত পথ বর্জন করে তাই লোকমান্য তিলক মহারাষ্ট্রে গড়ে তুলতে লাগলেন কার্যকর প্রতিরোধের কর্ম-কৌশল। প্রয়োজন বোধে তিনি হিংসাত্মক কর্মনীতিকেও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হলেন না। ১৮৯৭ সনে পুণা সহরে চপেকার ভাইদের দ্বারা দুজন ইংরেজ অফিসার নিহত হলে সারা দেশে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তিলকের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয় না, কিন্তু একথা অস্বীকার করা চলে না যে, তৎকালে পুণা সমেত সমগ্র মহারাষ্ট্রে তিলকই ছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান মন্ত্রণাগুরু ও পরিচালক। পুণাতে সংগঠিত চপেকার ক্লাবও তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দামোদর চপেকার ও বালকৃষ্ণ চপেকার। গোয়েন্দা পুলিশী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, এই ক্লাবের প্রাথমিক উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে ছিল বিলাতী পণ্য বর্জন, বিলাতী ক্রীড়া বর্জন ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সাধন। অল্পদিনের মধ্যেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গুপ্ত হত্যার কর্মনীতিও এর আবহাওয়ায় গৃহীত হয়। চপেকার ক্লাব ছিল মহারাষ্ট্রে উদ্ভূত এক বিরাট আন্দোলনের অংশ বিশেষ। এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তকেরা হিন্দুজাতির পরম পবিত্র তীর্থস্থান বারাণসীতেও একটি কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৮৯৮ সনে তিলকের বিশিষ্ট

বন্ধু ও মহারাষ্ট্রীয় নেতা মাধো রাও কর্মকারের উদ্যোগে বারাণসীতে একটি মারাঠী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিলকের বারাণসী পরিদর্শন কালে সেখানে "কালিদাস" নামে একখানি মারাঠী পত্রিকাও স্থাপিত হলো। এইভাবে মহারাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গের উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে বারাণসীকে কেন্দ্র করে যুক্ত প্রদেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়েছিল। মহারাষ্ট্র থেকে বিপ্লববাদের তরঙ্গ এসে বাঙালীর রাজনৈতিক জীবনকেও আঘাত করে এবং তৎপর বাংলার পলিমাটিতে সে ভাবধারা পরিপুষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে ভারতের নানা প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। স্বদেশী যুগে বাঙালীর বিপ্লবসাধনা মহারাষ্ট্রীয় আদর্শ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা যে বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই* (৫)।

॥ ৪ ॥

অরবিন্দ ঘোষ ও নব রাজনৈতিক চিন্তাধারা

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা দেশে বিপ্লববাদের সর্বপ্রধান অধিনায়ক ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। বিলাত-প্রত্যাগত বরোদাস্থিত অরবিন্দের চিন্তাধারা বিপ্লব রসে পরিপুষ্ট। ১৮৯৩-৯৪ সনে বম্বে থেকে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক "ইন্দু প্রকাশে" তিনি "New Lamps for Old" শিরোনামায় যে ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করেন, তা তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ছিল কঠোরতম সমালোচনা * (৬)। প্রথম প্রবন্ধেই অরবিন্দ ঘোষণা করলেন, "একজন অন্ধ ব্যক্তি যদি আর একজন অন্ধকে চালনা করে, তাহ'লে তারা দুজনেই কি গভীর খাতে গিয়ে পড়বে না? প্রায় কোনো ভারতবাসীই একথা স্বীকার করতে চাইবেন না, বস্তুতঃ দু'বছর পূর্বে আমিও নিজে স্বীকার করতে চাইতাম না, যে এ কথা জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে সত্য সত্যই প্রযোজ্য।" কংগ্রেসের কাজকর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি লিখলেন, "আমি জানি যে সংস্থাকে আমি তিরস্কৃত করছি, তাকে আমার বহু দেশবাসী জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূস্বরূপ জ্ঞান করেন; কেউ কেউ একে পবিত্র আধার বলে বিবেচনা করেন যার ভিতর রয়েছে আমাদের উজ্জ্বলতম আশা ও মহত্তম আকাঙ্ক্ষা। কেউ বা একে কুহেলী সমাচ্ছন্ন পথের মধ্য দিয়ে সুদূর স্বর্গরাজ্যে আমাদের পৌঁছিয়ে দেবার ধ্রুবতারকা বলে মনে করেন। আমাদের এই বদ্ধমূল ধারণা একটা

ফাঁদ ও ছলনা মাত্র, এর পরিণতি অতি অশুভ। এই দৃঢ় বিশ্বাস যদি আমার না থাকতো তাহ'লে আমি আমার সংশয়কে প্রকাশ না করে নীরবতাই রক্ষা করতাম।" কংগ্রেসী নীতির সাফল্যের কথা তৎকালে ফিরোজ শা মেটা ও মনোমোহন ঘোষ যতই বাগাড়ম্বরের দ্বারা ঘোষণা করুন না কেন, অরবিন্দ মনে করতেন "প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে কংগ্রেসের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য হলো লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিলগুলির আয়তন বৃদ্ধি।...অন্য সব রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি মাত্র কথা বলা যায়—'ব্যর্থতা'।"

"New Lamps for Old" সিরিজের দ্বিতীয় প্রবন্ধে অরবিন্দ লিখলেন যে, কংগ্রেসের পুরানো নেতাদের সশব্দ দাবী "কংগ্রেস আমাদিগকে একত্রে মিলেমিশে কাজ করতে অভ্যস্ত করেছে" অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত। প্রতিবাদের সুরে তিনি লিখলেন, "কংগ্রেস যে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে শিক্ষা দিয়েছে তার সামান্যতম প্রমাণও দেখতে পাওয়া যায় না; আমরা অবশ্য একসঙ্গে কথা বলতে শিখেছি, কিন্তু তা হলো একেবারেই ভিন্ন জিনিষ।" তিনি ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বললেন, এমন কি মিলনের কাজেও কংগ্রেস বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি, কংগ্রেস পারেনি দেশের অগণিত জনসাধারণকে নিজের কাছে টেনে আনতে। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস একটা বলিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মপন্থা পর্যন্ত জনগণের হাতে তুলে দিতে পারে নি। যে সকল নেতা তখনও বিশ্বাস করতেন যে ভারতবাসীরা সিভিল সার্ভিসে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বড় বড় পদগুলি লাভ করলেই ভারতীয় প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান জুটবে, তাঁদের ভ্রান্ত বুদ্ধিকে ধিকৃত করে অরবিন্দ লিখলেন, "Our actual enemy is not any force exterior to ourselves, but our own crying weaknesses, our cowardice, our selfishness, our hypocrisy, our purblind sentimentalism * (৭)।" বাক্-সর্বস্বতা দিয়ে কংগ্রেসী নেতারা নিজেদের দ্বিধা ও দৌর্বল্যকে প্রথম দিকে সযত্নে আড়াল করে রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন; অনেকেই আশা পোষণ করতেন কংগ্রেসের শৈশবকালের এই দুর্বলতা (কাজের বদলে বাক্-সর্বস্বতা) ধীরে ধীরে কেটে যাবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল দুর্বলতা দূরীভূত না হয়ে একটা অভ্যাস ও নীতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে অরবিন্দ তদানীন্তন কংগ্রেসের আরও কঠোর সমালোচনা

করে অভিমত প্রকাশ করলেন, "এর আদর্শ ভ্রান্ত, যে মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে এ এগুচ্ছে তার মধ্যে নেই আন্তরিকতা ও পরিপূর্ণ নিষ্ঠা, লক্ষ্যে পৌঁছাবার যে পন্থা এ গ্রহণ করেছে তা সঠিক পন্থা নয়, এবং যে নেতৃবৃন্দের উপর এ বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাঁরা নেতা হবার মতো যোগ্য ব্যক্তি নন। সংক্ষেপে, বর্তমানে আমাদের অবস্থা হলো অন্ধ অন্ধের দ্বারা চালিত হচ্ছে, অন্ততপক্ষে কাণাদের দ্বারা"। তৃতীয় প্রবন্ধের উপসংহারে অরবিন্দ ঘোষণা করলেন, "উদাসীন বেলসাজ্জারের মত কংগ্রেস আর কতদিন পরস্পরের প্রশংসা গুঞ্জরিত উৎসব-সভা সাজিয়ে বসে থাকবে? ইতিপূর্বেই বিচারের রায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঘোষিত হয়েছে; যাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ তারাও দেখতে পাচ্ছে, কারণ একি রক্তের অক্ষরে লেখা হয় নি ?—দেওয়ালে লিখনের প্রথম বাক্যটি হলো, 'বিধাতার বিচারে রাজত্বের অবসান ও বিলুপ্তি ঘটেছে'। এই রূঢ় শিক্ষালাভের পরও কি আমরা চোখকাণ ঢেকে বসে থাকবো যতক্ষণ না আবার অদৃশ্য হস্ত এগিয়ে আসে এবং কঠোরতর ভাষায় দ্বিতীয় বাক্যটি লেখে 'তোমাকে নিক্তিতে বিচার করে দেখা হয়েছে এবং তুমি অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছো" * (৮)।

ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অরবিন্দই সম্ভবত সর্বপ্রথম হৃতসর্বস্ব, শোষিত, নিপীড়িত জনগণের কথা আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করেন। অরবিন্দ ভারতে প্রত্যাগমনের পর কংগ্রেসের ভাব ও কর্ম অনুধাবন করে বুঝতে পারলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 'isolated predominance' হলো তৎকালীন কংগ্রেসের লক্ষ্য। ১৮৯৩-৯৪ সনে কংগ্রেসকে তিনি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নিতে পারেন নি, কারণ কংগ্রেস ছিল তখন মুষ্টিমেয় ধনিক, বণিক ও নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটা প্রতিষ্ঠান মাত্র। জাতীয় জাগরণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুরুত্বকে অরবিন্দ অস্বীকার করলেন না, তাঁর অভিযোগ হলো কংগ্রেসের ধ্যান-ধারণায় হৃতসর্বস্ব জনগণের কোন ঠাঁই ছিল না ("the proletariate remained for any practical purpose a piece off the board.")। অরবিন্দ মনে করতেন যে জনগণই সত্যকার শক্তির উৎস এবং যে পর্যন্ত না জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে সে পর্যন্ত কংগ্রেসকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা অর্থহীন।

তাই তিনি স্বদেশপ্রেমিকদের কাছে আহ্বান জানালেন যে ধূল্যবলুণ্ঠিত, শোষিত, নিপীড়িত জনগণকে স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা তাদের স্বদেশসেবার 'প্রথম ও পবিত্রতম কর্তব্য'। অরবিন্দ লিখলেন, "...the proletariate is the real key of the situation. Torpid he is and immobile; he is nothing of an actual force, but he is a very great potential force, and whoever succeeds in understanding and eliciting his strength, becomes by the very fact master of the future."* (৯) অর্থাৎ "জনগণ চেতনাহীন ও নিশ্চল, কোন শক্তির প্রকাশই তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রসুপ্ত রয়েছে বিরাট শক্তির সম্ভাবনা এবং যিনি একথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন ও জনতার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করতে সমর্থ হবেন, তিনিই হবেন ভবিষ্যতের কর্ণধার"। ১৮৯৪ সনে দেশবাসীর উদ্দেশে এই ছিল অরবিন্দের আহ্বান। সেই সঙ্গে তিনি চাইলেন কংগ্রেসকে বাক্-সর্বস্বতা থেকে উদ্ধার করে স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সত্যকার কর্মক্ষম সংস্থায় রূপান্তরিত করতে। তিনি আরও ঘোষণা করলেন ভারতবর্ষ ইংল্যাণ্ড নয়, ইংল্যাণ্ডের মত মন্থর গতিতে ভারতকে অগ্রসর হলে চলবে না, তাকে এগুতে হবে ফ্রান্সের মত দুর্বার গতিতে। সাত শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড যে কাজ সম্পন্ন করতে পারে নি, ফ্রান্স তাকেই সফল করে তুললো মাত্র ভয়ঙ্কর পাঁচ বছরের মধ্যে। স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দেশবাসীকে দীক্ষা দিয়ে তিনি বললেন রক্তস্নান ও বারুদশিখার মধ্য দিয়ে পবিত্র হয়েই পরাধীন জাতি লাভ করে স্বাধীনতার আশীর্বাদ। শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা করেই অরবিন্দ সেদিন ক্ষান্ত থাকেন নি, তিনি বাংলা দেশে ইতালীর কার্বোনারি ধাচের গুপ্ত সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। বরোদা থাকাকালীন বম্বের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে তাঁর সংযোগ ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ, আমেদাবাদ কংগ্রেসে বিপ্লবী দলের সম্ভাব্য নেতা বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ও ভাববিনিময় তাঁর রাষ্ট্রিক মেজাজ উদ্ঘাটিত করে। অরবিন্দের রাষ্ট্রদর্শনে বিপ্লবের ঠাঁই খুব উঁচুতে। তিনি নপুংসক নীতিবাগীশ বা নিষ্ক্রিয় নিয়মতন্ত্রের পূজারী ছিলেন না। নিয়মতান্ত্রিকতার সঙ্গে বিপ্লববাদের সুর তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে প্রবল মাত্রায় সংমিশ্রিত ছিল। ইংরেজ আমলের গোয়েন্দা বিভাগীয় পুলিশের রিপোর্টে

দেখতে পাই যে, অরবিন্দই প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতবর্ষে দেশপ্রেমের নবধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যে পর্যটক সন্ন্যাসী দল গড়ে তোলার কথা চিন্তা করেছিলেন। "যুগান্তর" পত্রিকার ভাবনায়ক অরবিন্দ ঘোষ বরোদার বিপ্লবী অরবিন্দের পরিণত অভিব্যক্তি।

॥ ৫ ॥

যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলায় অগামন

স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণেরও পূর্বে (৪ঠা জুলাই, ১৯০২) অরবিন্দ সুদূর বরোদা থেকে বাংলার রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করবার প্রচেষ্টা সুরু করেন। অরবিন্দের নির্দেশে ১৯০১ সনে গাইকোয়াড়ের সেনাবিভাগে নিযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি পরবর্তীকালে স্বামী নিরালম্ব নামে পরিচিত হন) বাংলা দেশে বিপ্লববাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন এবং এর অল্পদিন পরে স্বীয় ভ্রাতা বারীন্দ্র কুমার ঘোষও। তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা দেশে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা * (১০)। তাঁরা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রমথনাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাস, বিজয় চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ঠাকুর পরিবারের কারো কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের এই সাক্ষাৎকারের ফলাফল কি হয়েছিল তা পরিষ্কারভাবে জানা না গেলেও একথা সত্য যে ঐ একই সময়ে কলিকাতায় ও বাংলা দেশের জেলায় জেলায় ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রাকার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলি বাহ্যত ও স্পষ্টত বিপ্লববাদী সমিতি না হলেও এদের সকলেরই লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ১৯০২ সনে কলিকাতার সার্কুলার রোড (রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর সন্নিকটে) যে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয় তা শরীরচর্চামূলক সমিতি হলেও এর ভিতরের উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লববাদের পথ অনুসরণ করে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনাকে কার্যকর ও জয়যুক্ত করে তোলা। পাঁচজন সদস্য নিয়ে এই সমিতি পরিচালনার জন্য একটি কার্যনির্বাহক কমিটিও গঠিত হয়েছিল। ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি. মিত্র) ছিলেন এর সভাপতি, সহকারী সভাপতি হলেন চিত্তরঞ্জন দাস (সি. আর. দাস) ও অরবিন্দ ঘোষ। ঠাকুর পরিবারের সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এর কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। আইরিশ দুহিতা ভারতপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতাকেও সভ্যরূপে সংশ্লিষ্ট রাখবার চেষ্টা করা হলো *(১০ক)। শীঘ্রই বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ যুবকেরা যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমিতিতে যোগদান করেন। এই বিপ্লবী দলের কাজকর্ম ইতালীর কার্বোনারি ও রাশিয়ার গুপ্ত সমিতিগুলির দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিল। আবার গীতার সংগ্রাম-দর্শনও এর আবহাওয়ায় খুব উঁচুতে ঠাঁই লাভ করে। শরীর চর্চার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পাঠও নিয়মিত শিক্ষাদানের ববস্থা সমিতিতে গৃহীত হয়েছিল। অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর, পি. মিত্র, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রধানত বক্তৃতা দিতেন। বই পড়িয়া সব বুঝাইয়া দেওয়া হইত" * (১১)। অবিনাশ বাবু আরও লিখেছেন যে, সমিতির কাজকর্মের জন্য যে অর্থভাণ্ডার খোলা হয়, তাতে সি. আর. দাস, পি, মিত্র প্রভৃতি চাঁদা দিতেন। অরবিন্দ প্রথম থেকেই মোটা টাকা দিতেন।

এই বিপ্লবী দলের একটি প্রতিজ্ঞা পত্র ছিল এবং তা ছিল সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করতে হলে প্রত্যেককে উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হতো। সর্ত ছিল—ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। কলিকাতায় গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি স্থাপিত হবার পর ধীরে ধীরে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেও অনুরূপ সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু বেশীদিন কাজ চলার পূর্বেই যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিপ্লবী দলের বারীন ঘোষ ও তরুণ সভ্যদের বাদবিসংবাদ সুরু হলে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিরক্ত হয়ে ঐ সমিতি পরিত্যাগ করেন এবং আরও কিছুদিন পরে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে অন্যত্র চলে যান। এর অল্প পরেই সার্কুলার রোডের আখড়া ভেঙে যায় এবং উত্তর কলিকাতার গ্রে স্ট্রীটে সমিতির প্রধান ব্যায়ামাগার স্থাপিত হয়।

বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ১৯০২ সনে বরোদা থেকে অরবিন্দ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে ১৯০৩ সনের মধ্যভাগ পর্যন্ত সারা বাংলা দেশ পর্যটন করেন এবং স্থানে স্থানে আখড়া ও সমিতি স্থাপন করে তিনি বরোদায় প্রত্যাবর্তন করেন। এর পরবর্তী ঘটনা ১৯০৪ সনে বাংলায় বিপ্লববাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বারীন ঘোষের দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আগমন। সারা বাংলা দেশে একটি

বৈপ্লবিক রাজনৈতিক দল সংগঠনের কাজে এই সময় বারীন ঘোষ আত্ম-নিয়োগ করেন। "কিছুদিনের মধ্যেই বৈপ্লবিক আন্দোলন এক কেন্দ্রীভূত সংস্থারূপে গড়ে উঠল। স্থানীয় কর্মীকে তার উপরস্থ কর্মীর নিকট কাজের হিসাব দিতে হত এবং উপরস্থ কর্মী আবার কাজের হিসাব দিতেন তার উপরের কর্মীর নিকট। এইভাবে সমস্ত কর্মীর খবর সভাপতির কাছে পৌঁছত। এক জনের কাজের হিসাব তার সহযোগী জানতেন না। কাজ চলত অনেকটা ইটালীয়ান কারবোনারী প্রথায়"*(১১ক)। এই সমস্ত রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও কাজকর্মের পশ্চাতে অরবিন্দ ঘোষের ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রগণ্য। গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে যে, বাংলার 'যুগান্তর' নামক বৈপ্লবিক কর্মীদের মধ্যে তৎকালে অরবিন্দই ছিলেন অগ্রণী এবং "ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনে বোধ হয় যে কোনো ব্যক্তির থেকে তিনিই বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন"। গোয়েন্দা বিভাগের মতে অরবিন্দ ছিলেন "the chief of the Yugantar band, who has exercised a greater influence over the revolutionary movement in India than perhaps any one other man" * (১২)।

॥ ৬ ॥

কলিকাতা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা

স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ কালে সতীশচন্দ্র বসু বিবেকানন্দ রোড ও কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সন্নিকটে মদন মিত্র লেনে একটি ছোট লাঠি খেলার ক্লাব স্থাপন করেন। বঙ্কিমী আদর্শের অনুসরণে তিনি এই ক্লাবের নামকরণ করলেন 'অনুশীলন সমিতি'। সতীশ বসু ছিলেন এই ক্লাবের সম্পাদক এবং ব্যারিষ্টার পি, মিত্র ছিলেন এর সভাপতি। প্রমথ মিত্রের নির্দেশেই এই 'অনুশীলন সমিতি' পরবর্তী সময়ে বৈপ্লবিক সমিতির সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে যায়। ১৯০৫-এর অগাস্ট মাসে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হলে বাংলার মরা গাঙে নতুন ভাব, আবেগ ও কর্মের জোয়ার এলো। রবিকণ্ঠে বের হলো—"জয় মা ব'লে ভাসা তরী।" প্রত্যক্ষদর্শী বিনয় সরকার বলেছেন, "শব্দই হ'ক আর বস্তুই হ'ক—দুইয়েই ছিল লাখ-লাখ মানুষের স্বার্থ, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও ভাবুকতা আর কৃতিত্ব, কর্মদক্ষতা, চরিত্রবত্তা ও স্বার্থত্যাগ মাখানো।

এরি নাম আন্দোলন। বহরটা রীতিমত পুরু। অসংখ্য বাঙালীর সুরৎ বদ্‌লে গেল। মেজাজ বদলে গেল" * (১৩)। স্বদেশী আন্দোলন ছিল সর্বাত্মক স্বাদেশিকতার আন্দোলন ও জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন। বাঙালী সেদিন ভারতের জন্য স্বরাজ চাইলো কারণ স্বরাজের মধ্য দিয়ে ভারতবাসী-দের জীবনের ঘটবে পুনরুজ্জীবন। এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে বাঙালী সেদিন নতুন তেজ ও নতুন সঙ্কল্প নিয়ে স্বাধীনতার মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হলো। এই প্রাণের স্পর্শ লাগলো জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, তেমন বিপ্লবী দলের কাজকর্মেও এক অভূতপূর্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হলো। বাংলার সহরে মফঃস্বলে প্রতিষ্ঠিত হলো নতুন নতুন আখড়া, ব্যায়ামাগার ও সমিতি এবং যৌবনের দল দেশোদ্ধারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রহণ করলো এর সভ্যপদ। স্বদেশী আন্দোলনের ধাক্কায় বৈপ্লবিক দলের কর্ম-পরিসর সহসা বিস্তৃত হলে বৈপ্লবিক দলের কার্যক্রম সম্বন্ধে নতুন নতুন চিন্তাধারাও আবির্ভূত হয়। দলের একটি শাখা ক্লাবে বা আখড়ায় শরীর-চর্চ্চা, ব্যায়াম, কুস্তি, লাঠিখেলা ইত্যাদির উপর বেশী করে জোর দিল, অন্য একটি শাখা শরীরচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রচারের দিকে ঝুঁকে পড়লো। সতীশচন্দ্র বসু প্রথম থেকেই কলিকাতা ব্যায়ামকেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন। ১৯০৫ সনের নভেম্বর মাসে পি. মিত্রের উৎসাহে পূর্ববঙ্গের ঢাকা সহরে গুপ্ত সমিতির যে শাখা স্থাপিত হলো সেখানেও মুষ্টি যুদ্ধ, ছোরা খেলা, লাঠিখেলা, ব্যায়াম, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার দেওয়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হতো। ঢাকা সমিতির নাম হলো 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'। পুলিন বিহারী দাস এর সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন এবং কলিকাতায় স্থাপিত আদি সংস্থার সঙ্গে (যার পরিচালক ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু)এ সংযুক্ত থাকলো। উভয় সংস্থারই—কলিকাতা অনুশীলন সমিতি ও ঢাকা অনুশীলন সমিতির—সভাপতি ছিলেন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র। রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্রুতগতির সঙ্গে তাল রেখে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলায় শরীরচর্চামূলক ক্লাব বা আখড়া প্রতিষ্ঠিত হলো। সেগুলিও থাকলো কলিকাতাস্থ অনুশীলন সমিতির অন্তর্ভুক্ত। সতীশ বসু ও পুলিন দাস উভয়কেই বৈপ্লবিক দলের প্রথম ধারার প্রতিনিধি বিবেচনা করা চলে, কারণ উভয়েই রাজনৈতিক প্রচারের থেকে যুবকদের

শরীর ও চরিত্র গঠনের উপর বেশী জোর দিয়েছিলেন * (১৩ক)। বস্তুত, এই দুই নেতার নেতৃত্বে বাংলার হাজার হাজার যুবক তৎকালে শক্তিযোগের সাধনায় তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। শক্তিযোগী বাঙালীর নতুন চরিত্র ও মেজাজ লক্ষ্য করে সেদিন সারা ভারতবর্ষের লোকেরা বিস্ময়াভূত হয়েছিল।

॥ ৭ ॥

বৈপ্লবিক আন্দোলনে 'যুগান্তরে'র প্রচারাভিযান

বৈপ্লবিক দলের দ্বিতীয় গ্রপ বা গোষ্ঠী উপলব্ধি করলেন যে, রাজনৈতিক প্রচার ছাড়া বৈপ্লবিক আন্দোলনের সম্প্রসারণ অসম্ভব। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু, উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যুবকের দল ক্রমশ রাজনৈতিক প্রচারের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং এই কার্যে তাঁরা অনুপ্রেরণা পান অরবিন্দ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর ও অবিনাশ চক্রবর্তীর কাছ থেকে। এই প্রচারধর্মী দলের মুখপত্ররূপেই ১৯০৬ সনের মার্চ মাসে 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তরে'র দল দুই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল না *(১৪)। এরা উভয়েই ছিল একই কেন্দ্রীয় সংস্থার দুই পৃথক শাখা—একটির মূল উদ্দেশ্য শরীরচর্চামূলক শিক্ষার আড়ালে রাজনৈতিক শিক্ষা দান, আর একটির প্রধান লক্ষ্য বিপ্লবাদর্শ প্রচার ও প্রসার। আর এই উভয় শাখারই সভাপতি ছিলেন পি, মিত্র। বাংলা দেশের বৈপ্লবিক সমিতির প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল কলিকাতায়। বাংলার এই বিপ্লবী দল আবার নিখিল ভারত বৈপ্লবিক সমিতির অঙ্গ ছিল। গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে একথা বহুবার উল্লিখিত হয়েছে।

সশস্ত্র বিপ্লব বা হিংসাত্মক সংঘর্ষের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্প বক্ষে ধারণ করেই 'যুগান্তর' পত্রিকা আবির্ভূত হয় (মার্চ, ১৯০৬)। 'যুগান্তরে'র ঈপ্সিত স্বাধীনতা ছিল ভারতের জন্য পূর্ণ স্বরাজ * (১৫)। কংগ্রেসের পুরানো নেতৃবৃন্দ তখনও এই আদর্শ সম্যকভাবে ধারণা করতে পারেন নি। নব্য জাতীয়তাবাদীর দল পূর্ণ স্বরাজের স্বপ্ন দেখলেও তখন পর্যন্ত বিপিন চন্দ্র পালের "নিউ ইণ্ডিয়া" ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পত্র ছাড়া তাদের আর কোনো উল্লেখযোগ্য মুখপত্র ছিল না। 'বন্দে

মাতরম্' পত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটতে তখনও চার-পাঁচ মাস বিলম্ব। তাছাড়া, 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'সন্ধ্যা' বা 'বন্দে মাতরম্' কোনোটিই হিংসাত্মক সংঘর্ষ বা সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক ছিল না। স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য তাদের অনুমোদিত পথ ছিল নিরস্ত্র প্রতিরোধ বা বয়কটের কর্মনীতি। কিন্তু 'যুগান্তরে'র পথ ছিল আরও ভয়ানক ও সক্রিয়। বিপ্লববাদ ছিল এর নিশ্বাস-প্রশ্বাস বিশেষ। 'যুগান্তর'-সম্পাদক ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বৈপ্লবিক দলের 'যুগান্তর' পত্রিকা বাহির হইবার পূর্বেই 'সন্ধ্যা' পত্রিকা বাংলা দেশে আসর জমাইয়া বসিয়াছিল। 'সন্ধ্যা'র সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়া 'যুগান্তর' পত্রিকাকে প্রথম হইতেই আরও বেশী চড়া সুরে কথা কহিতে হইল। 'যুগান্তরে'র সুর এত চড়া ছিল যে তৎকালের অন্য কোন পত্রিকাই ইহাকে হারাইতে পারে নাই *।" (১৬)

'যুগান্তর' পত্রিকার নামকরণে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' নামক সামাজিক উপন্যাসের প্রভাব লক্ষণীয়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, "শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল।" মাত্র ৩০০৲ টাকা সম্বল করে এই কাগজ প্রকাশিত হয়।

'যুগান্তর' ছিল বাংলা সাপ্তাহিক পত্র। মূল্য এক পয়সা। পত্রিকার অফিস প্রথমে ছিল ২৭নং কানাই ধর লেনে ও পরে ৪১নং চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনে। ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত বলেছেন যে প্রথম দিকে ১৭।১৮ খানার বেশী যুগান্তর বিক্রী হতো না। বাকী সব বিলি করা হতো। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাবাদর্শ এই পত্রিকা যেভাবে জনসাধারণের উপযোগী করে রূপ দিতে লাগলো, তার ফলে বাংলায় জনমানসে 'যুগান্তর' শীঘ্রই স্থায়ী ঠিকানা কায়েম করে নিল। ১৯০৭ সনে প্রায় ৭,০০০ কপি এবং আরও পরে প্রায় ২০,০০০ কপি পর্যন্ত যুগান্তর মুদ্রণের কথা নির্ভরযোগ্য সূত্রে শুনা যায়। 'যুগান্তর' পত্রিকা ১৯০৭ সনে বাংলা দেশে এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রাবাস ইডেন হিন্দু হোস্টেলের কতিপয় বিহারী ছাত্র 'যুগান্তরে'র হিন্দি সংস্করণের জন্য ৫০০৲ টাকা দিতেও প্রস্তুত হন। এই সকল বিহারী ছাত্রের মধ্যে রাজেন্দ্র প্রসাদও অন্যতম

ছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে 'যুগান্তরে'র উপর পুলিশের হামলা সুরু হলে উক্ত পরিকল্পনা আর কার্যকর করা সম্ভব হয় নি। রাজেন্দ্র প্রসাদ নিজেই ভূপেন দত্তকে একথা পরবর্তীকালে বলেছিলেন * (১৭)।

'যুগান্তরে'র লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান ছিলেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, দেবব্রত বসু, সখারাম গণেশ দেউস্কর, উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত। পত্রিকাধ্যক্ষ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য আমাদের বলেছেন, বিপিন চন্দ্র পালেরও কয়েকটি প্রবন্ধ 'যুগান্তরে' ছাপা হয়েছিল। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য আমাদের বলেছেন যে, 'অনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী'র নামে 'যুগান্তরে', প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর লেখক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'যোগাক্ষ্যাপার চিঠি' এই নামে যে সকল রচনা বের হয় তার রচয়িতা ছিলেন দেবব্রত বসু। "যুদ্ধই সৃষ্টির নিয়ম" এই নামে যে লেখাগুলি 'যুগান্তরে' বের হয়, তাঁর রচয়িতা ছিলেন বারীন ঘোষ। স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষও 'যুগান্তর' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বস্তুত, তিনিই ছিলেন বাংলার বৈপ্লবিক কর্ম-প্রচেষ্টার আদি মন্ত্রণাদাতা ও প্রেরণাস্থল। ১৯০৩ সনের শেষাশেষি তিনি বাংলাদেশে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে আরব্ধ বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে সুসংহত করতে সচেষ্ট হন, কিন্তু বাংলাদেশ তখনও তাঁর অগ্নিগর্ভ বাণী গ্রহণের জন্য সম্যকভাবে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কার্জনী কশাঘাত, শক্তি মদোন্মত্ত রাশিয়ার উপর জাপানের সামরিক বিজয়, চীনের বিপ্লব-সাধনা, রাশিয়ার বিপ্লব-প্রচেষ্টা, পারস্যের নব জাগরণ ইত্যাদি যে সব ঘটনা পর পর ঘটতে আরম্ভ করে তার প্রভাবে ভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, এক উগ্র জাতীয়তাবাদ ও বৈপ্লবিক চেতনা সঞ্চারিত হয়। ১৯০৫ সনের অগাস্ট মাসে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হলে বাংলার সংগ্রামী চেতনা আরও উগ্র ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ রহিত করণের প্রশ্নও অচিরে নেপথ্যে সরে গেলো—দেখা দিল ভারতীয় চেতনায় স্বরাজ লাভের জলন্ত আদর্শ। তখন শক্তিশালী শাসক জাতির সঙ্গে নিরস্ত্র ভারতবাসার সুরু হলো নতুন সংগ্রামের পালা। এই কঠিন সংগ্রামে ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য কোন পথে নির্ধারিত হবে সেই বিরাট জিজ্ঞাসার সম্মুখান হয়ে অরবিন্দ ঘোষ রচনা করলেন তাঁর 'ভবানী মন্দির' শীর্ষক প্রবন্ধ-পুস্তিকা * (১৮)। ১৯০৫ সনের শেষভাগে অথবা ১৯০৬ সনের

গোড়ার দিকে সম্ভবত এই ইংরেজী পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হয়। অরবিন্দ চাইলেন ভারতের কোনও এক পর্বত-শীর্ষে আরাধ্যা দেবী ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু অরবিন্দের কল্পিত এই ভবানী চিরাচরিত হিন্দুধর্মের কোনো দেবী নন; তিনি ভারতের ত্রিশ কোটি জনমানবের অন্তর্নিহিত শক্তি-সাধনার প্রতিমূর্তি। বহুদিনের পরাধীনতার পরিণামে যে ক্লৈব্য ও তামসিকতা ভারতবাসীর মানসকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তার কবল থেকে জনমানসকে মুক্ত করে অরবিন্দ সেখানে ক্ষাত্রতেজের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত করতে চাইলেন। অরবিন্দ স্পষ্ট অনুভব করলেন ভারতবাসী সাত্ত্বিকতার আবরণে ঘোর তামসিকতায় ভরপুর। বিবেকানন্দও এ সত্য শিরায় শিরায় উপলব্ধি করেছিলেন এবং ভারতবাসীকে তাই তিনি বার বার কশাঘাত করে প্রথমে রজোগুণের অধিকারী হবার জন্য। অরবিন্দও ভারতবাসীকে কিছুদিনের জন্য রজোগুণের সাধনায় মসগুল হতে বলেছিলেন। তাই তিনি সেদিন শান্তির ললিত বাণী উচ্চারণ না করে জাতির নয়ন সম্মুখে তুলে ধরলেন শক্তিরূপা ভবানীর মূর্তি * (১৯)। এই শক্তিরূপা মাতৃপূজায় তিনি সমগ্র ভারতবাসীকেই আহ্বান জানালেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে 'আনন্দমঠে'র দৃষ্টান্ত অনুসরণে তিনি একদল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী গড়ে তুলতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। কিন্তু অরবিন্দের পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি।

॥ ৮ ॥

অরবিন্দের 'আমাদের রাজনীতিক আদর্শ'

'ভবানী মন্দির' পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপ হলো 'যুগান্তর' নামক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিষ্ঠা। 'যুগান্তরে'র সঙ্গে অরবিন্দের সম্পর্ক ছিল নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বহির্ভূত ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বরাজলাভ এই ছিল 'যুগান্তরে'র রাজনৈতিক লক্ষ্য। কংগ্রেসের ক্ষুদ্র ও সীমিত রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে 'যুগান্তর' বিলকুল বর্জন করেছিল। অরবিন্দ পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন যে বিরাট লক্ষ্য সামনে না থাকলে বিরাট প্রচেষ্টা আসে না; ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবনের জন্য তাই প্রথমেই প্রয়োজন একটা বিরাট রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে দেশবাসীর দৃষ্টিকে অনিবদ্ধ করা। 'যুগান্তর' পত্রিকা

বের হবার অল্পদিন পরেই ওর একটি সংখ্যায় "আমাদের রাজনীতিক আদর্শ" শিরোনামায় একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় * (২০)। প্রবন্ধটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এবং জাতীয় সম্পদরূপে সংরক্ষিত হবার যোগ্য। ঐ প্রবন্ধের লেখক ছিলেন স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষ। ঐ প্রবন্ধে অরবিন্দ তৎকালীন কংগ্রেসের ভীরু, দুর্বল চিন্তাধারার কঠোর সমালোচনা করে লিখলেন, "আমরা শতাব্দীকাল ক্রমাগত পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষণে পড়িয়া জাতীয় উন্নতি ও রাজনীতিক স্বত্বপ্রাপ্তির চর্চা করিতেছি। কার্যে কিন্তু উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইয়াছে। রাজনীতিক স্বত্বপ্রাপ্তি দূরের কথা, আমাদের রাজনীতিক জীবন, বাণিজ্য, বিদ্যা, চিন্তাশক্তি ও ধর্মভাব সবই শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অন্নের জন্য, পরিধেয় বস্ত্রের জন্য, শিক্ষার জন্য, রাজনীতিক স্বত্বের জন্য এবং বুদ্ধিবিকাশ ও চিন্তাপ্রণালীর জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী। ইংরাজ আমাদিগকে কয়েকটি খেলনা দিয়াছে বলিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতার সীমা নাই।...যাহা স্বপ্রয়াসলব্ধ তাহাই স্বত্ব ; পরের দান স্বত্ব নহে। অতএব এই স্বত্বগুলি প্রকৃত স্বত্ব নহে, তাহাদের উপর আমাদের কোন স্থায়ী অধিকার নাই ; আজ রিপণ দিল, কাল কার্জন কাড়িয়া লইবে। আর আমরা 'হায় ! আমাদের খেলনা গেল, কি ঘোর অন্যায় !' বলিয়া সহস্র সভাসমিতিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিব। ছেলেমানুষী আমাদের বর্তমান রাজনীতিক জীবনের একটী মুখ্য লক্ষণ। আর একটী লক্ষণ দাসত্বের অভ্যাস। আমরা উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেও গোলাম, সিভিলিয়ান জজ, ম্যুনিসিপাল কমিশনার, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিক, ব্যবস্থাপক সভার সভাসদ, সকলেই শৃঙ্খল পরিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছেন। তবে আমরা এমন ক্ষুদ্রাশয় হইয়াছি যে, সেই শৃঙ্খল স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত বলিয়া গর্ব করিতে আমাদের লজ্জা বোধ হয় না !"

উক্ত প্রবন্ধে কংগ্রেসী নীতি ও কর্মপ্রণালীর অসারতা অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করে অরবিন্দ লিখলেন, "দাসত্ব শৃঙ্খল অটুট রাখিয়া তাহাতে লৌহের ভাগ কমান এবং সোনারূপার ভাগ বাড়ান, ইহাই মহাসমিতির আদর্শ। কয়েকজন শান্তি ও সুখপ্রিয় মধ্যবিত্ত লোক লইয়া যদি আমাদের রাজনীতিক জীবন গড়িলেই হইত, তাহা হইলে তজ্জন্য ইহাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে এ ক্ষুদ্র ও নগন্য আদর্শ অতিক্রম করা

উচিত।" প্রবন্ধের উপসংহারে অরবিন্দ জাতির উদ্দেশে তাঁর বাণী রাখলেন—"সোনার শিকল কাট।"

'যুগান্তরে'র কর্মীরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাতীয় স্বাধীনতাই জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ভারতের যে কোন ভবিষ্যৎ নেই এ নিয়ে তাঁদের মনে কোন দ্বিধা বা সংশয় ছিল না। তাঁরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন স্বরাজের মধ্য দিয়েই জাতীয় আত্মবিকাশের পথ হবে অবারিত। তাই তাঁরা রাষ্ট্রশক্তি দখলের জন্যই ভারতবাসীকে আহ্বান দিলেন। ১৯০৭ সনের ১৫ই জানুয়ারী 'যুগান্তরে'র প্রবন্ধাবলী সঙ্কলন প্রসঙ্গে অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, "অনেকে আজকাল মনে করেন যে, ভারতবর্ষে শিল্পবাণিজ্যের পশ্চাতে সমষ্টিশক্তি স্বদেশী রাজসরকারের আকারে বর্তমান না থাকিলেও, বয়কট বা বহিষ্করণনীতির সাহায্যে আমরা ঐ সমষ্টিশক্তির স্থান পূরণ করাইয়া লইব। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, বয়কটকে প্রকৃত কার্যকরী করিতে গেলেই যে বিদেশীয় রাজশক্তি আমাদের দেশে সমষ্টিশক্তির স্থান অধিকার করিয়া বিরাজিত, তাহার সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য এবং এই সংঘর্ষে বিজয়লাভ করা আর স্বাধীনতা লাভ করা বা স্বদেশীয় সমষ্টিশক্তির প্রতিষ্ঠা করা একই কথা" *(২১)।

'যুগান্তর' পত্রিকা শুধু পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ ও ভাবধারা প্রচার করেই ক্ষান্ত থাকে নি, জনগণকে স্বাধীনতা যুদ্ধের উপযোগী ও লক্ষ্যাভিমুখীন সংগঠন প্রস্তুতিতেও আহ্বান জানিয়েছিল। যাঁরা মনে করেন যে, 'যুগান্তরে'র যুবকেরা শুধু ইংরেজের বা তার চরের উপর গুটিকয়েক বোমা নিক্ষেপ করেই দেশোদ্ধারের বা স্বরাজ-সাধনের স্বপ্ন দেখতেন, তাঁরা বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের যথার্থ পরিচয় মোটেই পান নি। স্বাধীনতার জন্য অদম্য স্পৃহা জনমানসে জাগ্রত না হলে জাতীয় স্বাধীনতা থাকবে নাগালের বাইরে-এ মহাসত্য উপলব্ধি করেই 'যুগান্তর' পত্রিকা সকলের আগে চাইল জনগণের মনে স্বাধীনতার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা সৃষ্টি করতে। 'যুগান্তরে'র প্রতিটি সংখ্যা এই মহৎ কার্যে নিযুক্ত হয়েছিল। বিপিন পাল-অরবিন্দ পরিচালিত ইংরেজী 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকারও লক্ষ্য ছিল একই—'ভারত ভারতবাসীদের জন্য' ('India for Indians')। কিন্তু কর্ম-কৌশল নিয়ে 'বন্দে মাতরমে'র

সঙ্গে 'যুগান্তরে'র প্রভেদ ছিল দুস্তর। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, বয়কট বা 'প্যাসিভ্ রেজিস্ট্যান্স্' ছিল 'বন্দে মাতরমে'র ঘোষিত নীতি; 'যুগান্তর' পত্রিকা বিশ্বাস করতো যে শুধু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতা আবির্ভূত হবে না। 'যুগান্তর' পত্রিকা স্বাধীনতার আন্দোলনকে সফল করে তুলবার উদ্দেশ্যে অনিবার্য উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লববাদের পন্থা। 'বন্দে মাতরমে'র অরবিন্দ বয়কট দর্শনের উদ্গাতা, passive resister; 'যুগান্তরে'র অরবিন্দ বিপ্লবের তর্কশাস্ত্রী, revolutionary।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য হিংসাশ্রয়ী কোন কার্যই 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর বিপ্লবীদের কাছে অননুমোদিত ছিল না। ১৯০৭ সনের ৯ই জুন হিংসাশ্রয় কাজ কর্মকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন জানিয়ে 'যুগান্তর' লিখলো যে, যদি ব্যক্তিবিশেষের আত্মরক্ষার জন্য পাশবিক শক্তির ব্যবহার আইনানুমোদিত হয়, তবে একটা জাতির পক্ষেই বা তা কেন অসিদ্ধ হবে? চোর-ডাকাতের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য যদি নরহত্যা পাপ বলে বিবেচিত না হয়, তবে একটা জাতির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দুচারজনকে হত্যা করা পাপ বলা হবে কেন * (২২)? এই প্রসঙ্গে 'যুগান্তরে' প্রকাশিত "বিপ্লব তত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ তিনটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রবন্ধ তিনটির ভাব-গাম্ভীর্য ও যুক্তি-বিন্যাস আজকের দিনেও বাঙালী যুবকদের উদ্দীপিত করবে। 'যুগান্তরে'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখকদের মধ্যে উক্ত প্রবন্ধত্রয় হয় বিপিন পালের রচনা অথবা অরবিন্দ ঘোষের রচনা। কিন্তু বিপিন পাল সশস্ত্র বিপ্লববাদকে অনুমোদন করতে পারেন নি। এ নিয়ে 'বন্দে মাতরমে'র সম্পাদকমণ্ডলীর কয়েক জনের সঙ্গে বিপিন পালের তীব্র মতান্তর ঘটে ও ১৯০৬ সনের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তিনি 'বন্দে-মাতরম্' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তাই যতদূর মনে হয়, "বিপ্লব তত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধমালা স্বয়ং অরবিন্দের রচনা। এরকম সুচিন্তিত প্রবন্ধ 'যুগান্তরে' খুব বেশী বের হয় নি।

|| ৯ ||

'যুগান্তরে'র বিপ্লব তত্ত্ব

'বিপ্লব তত্ত্বে'র প্রথম প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয় হলো 'লোকমত গঠন।' বিপ্লবের অনুকূলে জনমত গঠিত না হলে বিপ্লব সাধনা কখনও সফল হয় না। প্রবন্ধের প্রারম্ভে লেখক লিখলেন, "যে দেশে রাজশক্তি পশুবলকে সহায় করিয়া প্রজাকে উৎপীড়ন করে, সে দেশে নৈতিক বলের সাহায্যে বিপ্লব বা রাজ-পরিবর্তন আনয়ন করা অসম্ভব। সেখানে প্রজাকেও পশুবলকে আশ্রয় করিতে হয়। বিপ্লবের দুইটী স্তর আছে—লোকমত গঠন এবং পশুবলের সংগ্রহ। এই দুইটীই বিপ্লব কার্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।" লোকমত গঠন কিভাবে সুসম্পন্ন হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর হিসাবে লেখক সংবাদ-পত্র, সঙ্গীত, সাহিত্য এবং যাত্রা-কথকথা-থিয়েটারের ভূমিকার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। পঞ্চম উপায় হিসাবে গুপ্ত সমিতির গুরুত্বও স্বীকৃত হলো। 'যুগান্তর' লিখলো, "এই উপায়টি সাধারণের জন্য তত নহে যত স্বদলের লোকের জন্য। অত্যাচারী রাজশক্তি সকল সময়ে খাঁটি সত্যটুকু প্রচার করিতে দেয় না। সঙ্গীন ও বন্দুকের গুঁতাতে সত্যকে চাপা দিতে হয়। প্রকাশ্য স্থানে স্বাধীনতার কথা প্রচার করিতে বা লিখিতে হইলে একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লিখিতে হয়। এই জন্যই এমন একটা গুপ্ত স্থান দরকার যেখানে সত্য আপনার সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জলন্ত তেজ বিকাশ করিতে পারে। সেখানে অত্যাচারীর দৃষ্টির সাধ্যও নাই যে প্রবেশ করে। রুষের বিপ্লবকারীগণ গভীর নিশিতে গুপ্ত স্থানে বসিয়া স্বকর্তব্য সাধনের বিষয় আলোচনা করিতেন এবং করেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহার 'আনন্দমঠে' ঠিক এই প্রকার ব্যাপারেরই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গভীর নিশিতে, নিবিড় অরণ্যেই সন্ন্যাসীদল স্বাধীনতার অস্ত্র সংগ্রহ করিত।"

"বিপ্লব তত্ত্ব" সিরিজের দ্বিতীয় প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল 'অর্থ সংগ্রহ'। ঐ প্রবন্ধে দেখানো হলো যে, "লোকমত গঠন করিবার সময় এক উপায়ে অর্থোপার্জন করিতে হয়—অস্ত্রসংগ্রহ করিবার জন্য আর এক উপায় অবলম্বিত হয়, এবং রাজশক্তির সহিত বাস্তবিক সংঘর্ষের

সময় যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য আরও শক্ত পন্থা অনুসৃত হইয়া থাকে।

"প্রথমতঃ দেখা যাউক লোকমত গঠনের সময় কিরূপ উপায় অনুসৃত হয়। বিপ্লবের উদ্দেশ্যে লোকমত গঠন করিতে যাইলে রাজশক্তি নিশ্চয়ই প্রাণপণে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। সুতরাং প্রথমে নিঃশব্দে কার্য করিতে হয়। প্রথমতঃ ভিক্ষা বা স্ব ইচ্ছায় দত্ত অর্থের দ্বারাই প্রচারকার্য চালাইতে হয়।...কিন্তু যদি কার্য এতদূর অগ্রসর হইয়া যায় যে, অধিক অর্থ সংগ্রহ না করিলে আর চলে না, তখন আর স্বেচ্ছাদত্ত সামান্য অর্থের উপর নির্ভর করা অসম্ভব হয়। তখন শক্তি প্রয়োগের দ্বারা সমাজের নিকট হইতেই অর্থ লইতে হয়। এইরূপ বলপ্রয়োগের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ প্রথমতঃ অন্যায় বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় এরূপ পন্থা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ...সত্য বটে, সমাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লইলে তাহা অন্যায়। কিন্তু দেহ পীড়িত হইলে ঔষধ তাহার মুখে কটু লাগিতেই পারে ; চিকিৎসক ঔষধের কটুতা কি মিষ্টতা বিচার করেন না ; যাহা প্রয়োজন হইবে, তাহা বলপ্রয়োগের দ্বারাও প্রয়োগ করিতে তিনি পরামর্শ দেন। বিপ্লবকারীরাও পীড়িত সমাজের চিকিৎসক স্বরূপ। সমাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে কার্য করিতে হইবে, যেহেতু সমাজকে মৃত্যু মুখ হইতে বাঁচানই তাহাদের উদ্দেশ্য।...সুতরাং উচ্চতর মঙ্গলের জন্য এই ক্ষুদ্র মঙ্গলটিকে ভঙ্গ করায় কোনও পাপ নাই, বরং পুণ্য আছে। সুতরাং বৈপ্লবিকেরা যদি সমাজের কৃপণ বা বিলাসী ধনীদিগের নিকট বলপ্রয়োগের দ্বারা অর্থসংগ্রহ করে, তাহাদের সে কার্য সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

"দ্বিতীয়তঃ অস্ত্র সংগ্রহের সময় আসিলে অনেক বৈপ্লবিকেরা প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির অর্থ লুণ্ঠন দ্বারাও অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া থাকে। এ কার্যটীও সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। কারণ রাজকোষ প্রজাদত্ত অর্থের দ্বারাই পূর্ণ হইয়া থাকে ; যে মুহূর্ত হইতে রাজশক্তি প্রজার মঙ্গলকে পদদলিত করিতে আরম্ভ করে, সে মুহূর্ত হইতেই প্রজার অর্থেও তাহার দাবী ন্যায়তঃ অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন সে যাহা লয় তাহা কেবল বলপ্রয়োগের দ্বারাই লইয়া থাকে। অতএব বৈপ্লবিকেরা যখন ভবিষ্যৎ রাজশক্তির সৈন্যরূপে দণ্ডায়মান হয়,

তখন বর্তমান রাজশক্তির বলপ্রয়োগের দ্বারা লব্ধ অর্থে তাহাদের সম্পূর্ণ দাবী আছে।...

"অবশেষে বিপ্লবকার্য যখন প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হয়, তখন প্রকাশ্যভাবে প্রজার নিকট কর লইতে হয়।"

"বিপ্লব তত্ত্ব" প্রবন্ধাবলীর তৃতীয় প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল 'অস্ত্র সংগ্রহ' প্রসঙ্গে। বিপ্লব কার্যের প্রয়োজনানুসারে অস্ত্র সংগ্রহ বৈপ্লবিকদের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির পশুবলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে বৈপ্লবিকদেরও অস্ত্রবলের প্রয়োজন। "বিপ্লব তত্ত্বের" প্রবন্ধকার লিখলেন, "সকল দেশেই অস্ত্রসংগ্রহ ব্যাপারে তিনটী প্রধান পন্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রথম উপায়—কোনও গোপন স্থানে নিঃশব্দে অস্ত্র প্রস্তুত করা। অস্ত্রপ্রস্তুত কার্যটি এমন কিছু অদ্ভুতব্যাপার নহে যে তাহা পরাধীন জাতির বুদ্ধির অসাধ্য হইবে। এক দেশের মনুষ্যের যাহা সাধ্য, অপর দেশের মনুষ্যের দ্বারাও যে তাহা সম্ভব, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। যাহা হউক পরাধীন জাতি যখন এরূপ আকাঙ্ক্ষা লইয়া দণ্ডায়মান হয়, তখন সে অত্যাচারী রাজশক্তির দৃষ্টির অন্তরালে বিদেশে অস্ত্র প্রস্তুতকরণ বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য লোক পাঠাইতে থাকে। এই সকল লোক ফিরিয়া আসিয়া উৎসাহী যুবকদলকে লইয়া কামান বন্দুক ইত্যাদি নির্মাণ করে।

"দ্বিতীয় উপায়—বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্রের আমদানী। যাঁহারা ইয়োরোপের বন্দুকের কারখানাগুলির খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে নানা দেশের বিদ্রোহীদিগকে বন্দুকাদি সরবরাহ করিয়াই এই সকল বন্দুকওয়ালা জীবিত আছেন।...

"তৃতীয় উপায়—স্বদেশীয় সৈন্যের সাহায্য। সকল দেশে বিপ্লবকারীদের সহিত একমতাবলম্বী লোক রাজশক্তির সৈন্যদলেও অনেক থাকে। দেশের লোক যখন স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করে, তখন তাহাদেরও হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। তাহারাও তখন জন্মভূমির প্রতি তাহাদের কর্তব্য উপলব্ধি করিতে থাকে।...ফরাসী বিপ্লবে ঠিক এইরূপ ভাবই দেখা যায়। রুশ সম্রাটের সৈন্যদলেও এইরূপ দেশভক্ত লোকের সংখ্যা কম নহে। ইংলণ্ডেও যখন প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে প্রজাবর্গ যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন রাজার নিজের

সৈন্যের অনেকেই ক্রমওয়েলের দল পুষ্ট করিয়াছিল। সৈন্যদিগকে এইরূপ বুঝান যায় বলিয়াই ভারতের বর্তমান ইংরাজ রাজ চতুর বাঙ্গালীকে সৈন্য দলে প্রবেশ করিতে দেয় না।

"এই তিনটী প্রধান উপায় ব্যতীত অস্ত্র সংগ্রহের জন্য অন্য অনেক উপায় আছে। অবস্থা বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। বৈদেশিক রাজশক্তির সহায়তা লাভ করিয়া তাহা দ্বারা গোপনে অস্ত্র সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে" *(২৩)।

'যুগান্তরে'র প্রবন্ধাবলী এমন বলিষ্ঠ ভাষায় জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিল যে অল্পদিনের মধ্যেই জনমানসে ও সরকারী মহলে ঐ পত্রিকা এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ যৌবনের দল সেদিন সত্য সত্যই স্বদেশে 'যুগান্তর' সাধনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। দেশের মঙ্গল ও স্বাধীনতার জন্য কে কার থেকে বেশী দুঃখ ও নির্যাতন সহ্য করবে এই ছিল তাঁদের পণ।

॥ ১০ ॥
'যুগান্তরে'র বিরুদ্ধে সরকারী দলন নীতি

ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদ ঘোষণা করে 'যুগান্তর' পত্রিকা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ভারতীয় জনগণকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুত হতে আহ্বান দেয়। ১৯০৭ সনের মধ্যভাগ থেকে বাংলা দেশে সংবাদপত্র দলনের সরকারী অভিযান সুরু হয়। প্রথম সরকারী কোপ পড়লো 'যুগান্তর' পত্রিকার উপর। ৭ই জুন তারিখে বাংলা সরকার 'যুগান্তরে'র সম্পাদককে সতর্ক করে পত্র লেখে যে, ভবিষ্যতে হিংসা-উদ্দীপক প্রবন্ধ পত্রিকায় বের হলে এর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করা হবে * (২৪)। সরকারী চণ্ডনীতির এই হুমকি 'যুগান্তর' সাধকদের তাঁদের কর্তব্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে নি। ১৯০৭ সনের ১৬ই জুন 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'নাই ভয়' ও 'লাঠ্যোষধি' নামে দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে একটা প্রকাণ্ড ভাঁওতা বলে বর্ণনা করা হয়, বলা হয় এটা চোরাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত একটা চকচকে সৌধ বিশেষ। সামান্য আঘাত দিলেই তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, তবুও যে

তা এখনও হয় নি তার কারণ আমাদের ক্লৈব্য ও ভীরুতা। দ্বিতীয় প্রবন্ধে ঘোষণা করা হয় যে, ইংরেজ শাসকেরা আবেদন-নিবেদনের ভাষা বুঝেন না, তাঁরা কেবল বুঝেন লাঠির ভাষা যার প্রয়োগ না হলে নির্বোধদের চৈতন্যোদয় ঘটে না। পাঞ্জাবের সরকার-বিরোধী হিংসাত্মক কর্মনীতিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ঐ প্রবন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করা হলো যে, "কাবুলী দাওয়াই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ দাওয়াই" * (২৫)।

এর পরবর্তী ঘটনা ৩রা জুলাই, ১৯০৭-এ পুলিশ 'যুগান্তর' কার্যালয়ে গিয়ে খানাতল্লাস চালায়। ৫ই জুলাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ('যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক) তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়েছে জানতে পেরে নিজেই 'যুগান্তর' পত্রিকা অফিসে এসে স্বেচ্ছায় পুলিশের কাছে ধরা দেন। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের মামলা খাড়া করা হলো। ১৯০৭ সনের ১৬ই জুন 'যুগান্তরে'র পূর্বোল্লিখিত দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য প্রথম 'যুগান্তর' মামলা রুজু হয়েছিল। ভূপেন্দ্রনাথ আদালতের সামনে এক স্মরণীয় বিবৃতি রাখলেন। সেই বিবৃতিতে আত্মপক্ষ রক্ষার কোনো চেষ্টা না করে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তেজোদৃপ্ত ভঙ্গীতে বললেন, "আমি সরল বিশ্বাসে আমার দেশের প্রতি কর্তব্য বিবেচনা করে যা শ্রেয় বুঝেছি, তাই করেছি। যে কথা অস্বীকার করার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই, তা প্রমাণ করবার জন্য আমি মামলারুজুকারীদের অনর্থক শক্তিক্ষয় ও অর্থক্ষয় ঘটাতে চাই না। আমি আর কোনো বক্তব্য রাখতে বা এই বিচারে আর কোনো অংশ নিতে ইচ্ছুক নই"* (২৬)। রাজদ্রোহের অভিযোগে ভূপেন্দ্রনাথ অভিযুক্ত হলেন। ২৪শে জুলাই, ১৯০৭ সনে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডি. এইচ. কিংসফোর্ড 'যুগান্তর' মামলায় রায় প্রদান করলেন*(২৭)। ভূপেন্দ্রনাথের জন্য এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড নির্দিষ্ট হলো। ভূপেন্দ্রনাথ সহাস্যবদনে কারাবরণ করলেন। দেশ-মাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে তিনিই হলেন প্রথম শহীদ। আত্মত্যাগের সাধনায় স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্য ভাই বলে বাঙালী সমাজ ও ভারতবাসী ভূপেন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় পেলো। ২৫শে জুলাই 'বন্দে মাতরম্' পত্রে স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষ ভূপেন্দ্রনাথের কারাবরণ উপলক্ষে "One More For The Altar" নামক এক ছোট্ট সম্পাদকীয়* প্রবন্ধ বের করেন * (২৮)। ভূপেন্দ্রনাথের ললাটে অরবিন্দ

ঐ প্রবন্ধে গৌরবের রাজতিলক পরিয়ে দিলেন। পরদিন ২৬শে জুলাই ভূপেন্দ্রনাথের তেজোদৃপ্ত ও বলিষ্ঠ আচরণের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে তিনি আরও একটি বড় সম্পাদকীয় প্রকাশ করলেন*(২৯)। অমৃতবাজার পত্রিকা বা আরও দু-একখানি মডারেটপন্থী পত্রিকা বাদ দিলে বাংলার জাতীয়তাবাদী সকল পত্রিকাই ভূপেন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করলো।

অত্যাচারী শাসকের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে হাসিমুখে কারাবরণ করে ভূপেন্দ্রনাথ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে যে নব অধ্যায় সৃষ্টি করলেন, জাতীয় ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয়। ইংরেজ সরকার ভেবেছিল ভূপেন্দ্রনাথকে কারাগারে নিক্ষেপ করলে 'যুগান্তরে'র মনোবল একেবারে ভেঙে যাবে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকা 'স্টেটসম্যান' তো আরও অনেকদিন পূর্বেই উল্লাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছিল যে পুলিশী প্রকোপে 'যুগান্তরে'র মৃত্যু সুনিশ্চিত * (৩০)। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথকে কারারুদ্ধ করেও ইংরেজ সরকার 'যুগান্তরে'র মনোবল এতটুকু ভাঙতে পারে নি, বরং অত্যাচারীর নিষ্পেষণ 'যুগান্তর' সাধকদের মনে নতুন প্রাণশক্তি ও আত্মগরিমা সঞ্চার করেছিল। নতুন সঙ্কল্প নিয়ে নতুন তেজে 'যুগান্তর' পত্রিকা আবার বের হতে লাগলো। শীঘ্রই 'যুগান্তর' পত্রের উপর দ্বিতীয়বার সরকারী কোপ পতিত হলো। 'যুগান্তরে'র কর্মাধ্যক্ষ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য 'মিথ্যা ভয়' ও 'সিডিসন ও বিদেশী রাজা' (৩০শে জুলাই, ১৯০৭) এবং 'মিথ্যার পূজা' (৫ই অগাষ্ট, ১৯০৭) শীর্ষক প্রবন্ধত্রয় প্রকাশের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হলেন * (৩১)। 'মিথ্যা ভয়' প্রবন্ধে লেখা হলো, "কাণাকে কাণা বলিলে কাণার আর রাগের সীমা থাকে না ; যাহার যেখানে ব্যথা সেখানে হাত পড়িলে সে একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে ; জগতের সম্মুখ হইতে আপনার ক্ষতস্থান লুকাইয়া রাখিতে সকলেই সচেষ্ট। ভারতে ইংরাজ সরকারেরও সেই দুর্দশা। ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি যে এদেশে কত ক্ষীণ তাহা ইংরাজ প্রাণে প্রাণে বেশ বুঝে ; আর বুঝে বলিয়াই সে প্রকাণ্ড আড়ম্বরের মধ্যে আপনার দুর্বলতা লুকাইয়া রাখিতে চায় ; গোটাকতক ফৌজ, তোপ, লাল পাগড়ীর ভড়ং দেখাইয়া দেশের লোককে স্তম্ভিত করিতে চেষ্টা করে।···ইংরাজ জানে যে লোকের এই অজ্ঞানই ভারতে তাহার রাজত্বের ভিত্তি। তাই

সে নানা কৌশলে এই অজ্ঞানতা বজায় রাখিতে চায়, লোকে যেদিন সন্দেহ করিবে যে এ তাসের ঘর, সমগ্র ভারতবাসীর এক ফুৎকারও সহ্য করিতে সমর্থ নয়, সেদিন ইংরাজ রাজত্বের অবসানের সূত্রপাত"। এই প্রবন্ধের রচয়িতা খুব সম্ভবত ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"মিথ্যার পূজা" প্রবন্ধটি অরবিন্দ ঘোষের রচনা। উক্ত প্রবন্ধে অরবিন্দ লিখলেন, "ভূপেন্দ্রনাথকে জেলে দিয়া ফিরিঙ্গী সরকার ভাবিয়াছিল এইবার তাহারা যুগান্তরের উত্থানশক্তি একেবারে রহিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যুগান্তর আবার বাহির হইল।···

"যুগান্তরের আবার সম্পাদক কে? যুগান্তর ত জাতীয় ভাবসমষ্টি মাত্র। লোকের প্রাণের ভিতর দিয়া যে ভাবস্রোত ছুটিয়াছে তাহার এক একটা কণামাত্র যুগান্তরে আসিয়া ধাক্কা লাগে। সম্পাদক ত তাহা অভিব্যক্তির যন্ত্রমাত্র। যন্ত্রকে ধরিলে যন্ত্রী ত ধরা পড়ে না; যন্ত্র যে অশরীরী। ঐ যে পালে পালে উন্মাদ বালকের দল 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া অজানা লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে, ঐ যাহারা নৃমুণ্ডমালিনীর খর্পর তলে আত্মবলিদান দিয়া অমরত্ব লাভের জন্য উৎসুক--তাহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে; তাহারাই যুগান্তরের সম্পাদক।"

১৯০৭ সনের ২রা সেপ্টেম্বর বিচারপতি মিঃ কিংসফোর্ড 'যুগান্তরে'র দ্বিতীয় মামলার রায় প্রদানকালে উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "প্রবন্ধগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় রাজদ্রোহমূলক এবং ব্রিটিশ ভারতে আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেন্টের প্রতি ঘৃণা, শত্রুতা ও বিদ্বেষের মনোভাব জাগ্রত করাই এগুলির উদ্দেশ্য।...এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করে এরূপ সিদ্ধান্তে না এসে পারা যায় না যে, অজ্ঞ ও বিপথে পরিচালিত জনগণকে গভর্ণমেন্ট ও তার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কর্মে ও বিদ্রোহে উস্কানি দেবার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই এ পত্রিকা পরিচালিত হয়; এবং এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে এই পত্রিকা আইনের আশ্রয়ে টিঁকে থাকতে পারে" * (৩১)। ম্যাজিস্ট্রেট আরও বলেন, "বর্তমান মামলার প্রবন্ধগুলি পূর্ব-মামলার প্রবন্ধগুলি অপেক্ষা আরও বেশী উত্তেজনামূলক।" বিচারপতির রায় অনুসারে অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মুক্তি লাভ করেন, কিন্তু বসন্তকুমার ভট্টাচার্যের দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়।

সরকারী নিষ্পেষণের চাপের সামনে 'যুগান্তর' দ্বিতীয় মামলার পরও নির্ভীকভাবে দেশের প্রতি স্বীয় কর্তব্য পালন করে চলে। ১৯০৭ সনের অক্টোবর মাসের শেষাশেষি 'যুগান্তর' পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয়। ২৮ শে অক্টোবর 'যুগান্তরে'র কর্মাধ্যক্ষ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জনসাধারণকে জানান, "প্রায় দেড় বছর ধরে আমরা এই পত্রিকা প্রকাশ করেছি এবং বহু অসুবিধা ও ত্যাগ স্বীকার করে আমাদের বাণী প্রচার করেছি। বর্তমানে ইহা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কাগজ। আমাদের বন্ধু ও সহকর্মীদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা এখনও এই পত্রিকা পরিচালনে ইচ্ছুক। বর্তমানে আমরা তাঁদেরই হাতে এই কাগজের দায়িত্ব অর্পণ করিলাম। তাঁদের সকল প্রকার সফলতা আমরা প্রার্থনা করি। এখন থেকে আমাদের পরিচালনা ও সম্পর্ক শেষ হলো" * ৩২)। মনে হয় 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে তার আদি লেখক ও পরিচালক গোষ্ঠীর এই আনুষ্ঠানিক সম্পর্কচ্ছেদের মূলে ছিল নতুন হস্তে পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁদের হিংসাশ্রয়ী বৈপ্লবিক কার্যে আত্মনিয়োগ করা।

হস্তান্তরের পরেও 'যুগান্তরে'র অগ্নিগর্ভ প্রচার কার্য পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ ছিল * (৩৩)। ভারত সরকারের সি. আই. ডি. বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর সি. জে. স্টিভেনসন-মুর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারীকে এক গোপন রিপোর্টে জানালেন (১লা মে, ১৯০৮) যে নতুন মুদ্রাকর ও প্রকাশক বৈকুণ্ঠ চন্দ্র আচার্যের তত্ত্বাবধানেও "the paper continued to appear as usual and to publish articles no less objectionable than before"*(৩৪)। ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯০৭ সনে 'হিন্দুবীর্য পঞ্চনদে' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে 'যুগান্তরে'র বিরুদ্ধে তৃতীয়বার রাজদ্রোহের মামলা উপস্থাপিত হলো*(৩৫)। মুদ্রাকর ও প্রকাশক বৈকুণ্ঠচন্দ্র আচার্য গ্রেপ্তার হলেন। ১৯০৮ সনের ১৬ই জানুয়ারী বিচারক কিংসফোর্ড তাঁর রায়ে বৈকুণ্ঠচন্দ্রের এক হাজার টাকা জরিমানা ও দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। রায় প্রদানকালে বিচারক বললেন ঐ প্রবন্ধটির লক্ষ্য হলো শিখ সৈন্যগণকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে উত্তেজিত করা। তিনি আরও মন্তব্য করলেন, দেশের সুশাসন ও সুশৃঙ্খলার স্বার্থে পত্রিকাখানিকে অনেক দিন পূর্বেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল ("in the interests of

the good government and good order the paper ought long ago to have been suppressed.") ।

বৈকুণ্ঠ চন্দ্র আচার্যের কারাগমনের পর ফণীন্দ্রনাথ মিত্র 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং একই ধাচের বিদ্রোহাত্মক রচনাবলী 'যুগান্তরে' বের হতে থাকে। ৪ঠা এপ্রিল, ১৯০৮ সনে 'যুগান্তর' পত্রে 'ইংলিশম্যানের অত্যাচার' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে ফণীন্দ্রনাথ মিত্র ১০ই এপ্রিল অভিযুক্ত হলেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী বিচারে তাঁর এক বছর এগার মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকার জরিমানা ধার্য হলো * (৩৬)। কিন্তু অত্যাচার ও নিপীড়ন সত্ত্বেও 'যুগান্তরে'র প্রকাশ বন্ধ হলো না।

এই প্রসঙ্গে ভারত সরকারকে ক্রিমিন্যাল ইনটেলিজেন্স-এর ডিরেক্টার স্টিভেনসন-মুর ১৯০৮ সনের ১লা মে তাঁর গোপনীয় রিপোর্টে যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তা তৎকালীন বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে 'যুগান্তরে'র সম্পর্কের উপর গণনীয় আলোকপাত করেছে। তাঁরও মূল বক্তব্য ছিল গুপ্ত সমিতি আর 'যুগান্তর' আলাদা সংস্থা নয়, বিপ্লবী দলের দুইটি শাখা মাত্র। তাঁর নিজের ভাষায়, "In the fuller light thrown on the internal affairs of this newspaper by the disclosures in connection with the anarchist conspiracy it appears that the *Jugantar* was backed by the same people who supported the revolutionaries, that it was merely one of the means adopted by them to spread sedition openly, and that the '*Jugantar* Fund' was in fact one of the branches of the revolutionary fund...Further the confessions made by the anarchist conspirators discribe their close connection with this newspaper, and in more than one case a visit to the *Jugantar* office was the first step towards an introduction to the inner circles of the society." উক্ত রিপোর্টে স্টিভেনসন-মুর ভারত সরকারকে জানালেন যে, 'যুগান্তরে'র আর্থিক সঙ্গতি অনেকখানি স্বেচ্ছাদত্ত চাঁদার উপর নির্ভরশীল হলেও সম্প্রতি এর চাহিদা বর্ধিত হওয়ায় ফলে 'যুগান্তর' একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে

"It appears that for some time the paper had to be supported by outside subscriptions, and boys were sent out with collection books for this purpose, but recently owing to its largely increased circulation, it had become a paying concern" * (৩৭)। কিন্তু ১৯০৮ সনের মে মাসে 'যুগান্তরে'র আর্থিক সঙ্গতি স্বচ্ছল ছিল বলে আমাদের মনে হয় না। ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯০৮ সনে যুগান্তরে প্রকাশিত "যুগান্তরের আত্মকথা" শীর্ষক এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, 'যুগান্তর' বার বার পুলিশী হামলার ফলে ক্রমশই ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। ১১ই এপ্রিল, ১৯০৮ সনে পুলিস 'যুগান্তর' অফিসে হানা দেয় ও সুমতি প্রেস (তখন এই প্রেসে 'যুগান্তর' মুদ্রিত হতো) থেকে "যুগান্তরের ফর্মাসহ প্রায় ৪।৫ মন 'টাইপ' ও 'ব্লক' প্রভৃতি লইয়া গিয়াছে। গ্রাহক ও এজেন্টের খাতা, মফঃস্বলের জন্য সমস্ত ছাপান কাগজ এবং অনেকগুলি ডাক টিকিটও লইয়া গিয়াছে। মফঃস্বলে পাঠাইবার জন্য যে কাগজ প্যাক করা হইয়াছিল, তাহাও লইয়া গিয়াছে। পুলিশেরা সকলেই সঙ্গে রিভলভার লইয়া আসিয়াছিল"*(৩৮)।

এইপ্রকার পুনঃ পুনঃ আক্রমণে 'যুগান্তরে'র আর্থিক সঙ্গতি ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে পড়ে। মজঃফরপুর হত্যাকাণ্ডের দুই দিন পরে (২রা মে, ১৯০৮) কলিকাতায় অরবিন্দসহ বিপ্লবীদলের বহু ব্যক্তি ধৃত হলেন। ৯ই মে, ১৯০৮ সনের 'যুগান্তরে' "সাধের মরণ", "মূল সত্য কি", "ষড়যন্ত্র বা স্বাধীনতার ইচ্ছা" শীর্ষক প্রবন্ধাবলী প্রকাশের দরুণ এই পত্রিকার উপর আবার সরকারের কুপিত দৃষ্টি পতিত হলো এবং 'যুগান্তরে'র বিরুদ্ধে পঞ্চমবার মামলা সুরু করা হয় * (৩৯)। ১৯০৭-এর জুলাই থেকে ১৯০৮-এর অগাস্ট পর্যন্ত সর্বসাকুল্যে ছয়বার 'যুগান্তর'কে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ষষ্ঠবারের 'যুগান্তর' মামলার উপলক্ষ ছিল ৩০মে, ১৯০৮ সনের 'যুগান্তরে'র সংখ্যায় 'বাঙ্গালীর বোমা', 'কংসের কৃষ্ণভয়', 'রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম' প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং 'অকাল বোধন' শীর্ষক কবিতার প্রকাশনা। 'যুগান্তরে'র মুদ্রক বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মামলায় অভিযুক্ত হলেন * (৪০)।

'যুগান্তরে'র উগ্র ও বিরামহীন বিপ্লবাত্মক প্রচারকার্য ইংরেজ সরকারের মনে যে নিদারুণ বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সরকারী রিপোর্টে দেখতে পাই যে দেশীয় সকল পত্রিকার মধ্যে 'যুগান্তর'কেই ইংরেজ সরকার সবচেয়ে সন্দেহ ও ভীতির চোখে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। পুনঃ পুনঃ সরকারী আক্রমণ সত্ত্বেও 'যুগান্তরে'র প্রাণশক্তি ধ্বংস হলো না লক্ষ্য করে ইংরেজ সরকারকে শেষ পর্যন্ত দমনমূলক নতুন আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে হলো। ১৯০৮ সনের জুন মাসে সংবাদপত্র বিষয়ক এক নতুন বিল বড়লাটের আইন পরিষদে উত্থাপন কালে স্যার হারভে অ্যাডামসন (Sir Harvey Adamson) ঐ বিলের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেন যে, এ পর্যন্ত 'যুগান্তর' পত্রিকা সরকার কর্তৃক পাঁচবার রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে অভিযুক্ত হলেও ঐ পত্রিকার মূল নীতির কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নি। ১৯০৭ সনে 'সেণ্ট এণ্ড্রুজ্ ভোজসভায়' বক্তৃতা-কালে অ্যাডামসন জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির সম্পাদকদের দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অপরিণতবুদ্ধি বলে যেভাবে ভৎর্সনা করেছিলেন, বড়লাটের আইন পরিষদে প্রদত্ত ভাষণেও সে ঝাঁঝ ফুটে উঠলো। অ্যাডামসন বললেন, "In spite of five prosecutions Yugantar still exists and is as violent as ever. The type of sedition has been incitement to subversion of British rule by deeds of violence, has been to court prosecution to create pseudo-martyrs...and it may be presumed that a further inducement was to increase the circulation of the newspaper by pandering to the tastes of the depraved ..I have up to this point confined myself to the Jugantar because it has already obtained so great notoriety that nothing that I can say can make it more notorious. But writings of a similar type abound in other newspapers not only in Calcutta but throughout India. I will not give any of these disreputable papers an advertisement by mentioning their names"* (৪১)। ৮ই জুন, ১৯০৮ সনে ভারত সরকারের নতুন সংবাদপত্র বিষয়ক আইন "Newspapers (Incitement to Offences) Act" পাশ হয়ে গেলো। এই নতুন আইনের কঠোর প্রয়োগের ফলে 'যুগান্তর' পত্রিকা ও সংশ্লিষ্ট ছাপাখানা অচিরেই ভেঙে পড়লো। *খুব সম্ভবত ১৯০৮-এর ৬ই জুলাইয়ের পর 'যুগান্তরে'র আর

কোনো সংখ্যা বের হয় নি। কিন্তু 'যুগান্তর' পত্রিকা বন্ধ হলেও 'যুগান্তরে'র স্বরাজ-সাধনা ব্যর্থ হবার নয়। বাংলার যৌবনশক্তিকে এই পত্রিকা যেভাবে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে গেলো তা তুলনাহীন। মৃত্যুভয়হীন যৌবনের দল তখন দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে আত্মাহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'যুগান্তরে'র সাধনা যে বলিষ্ঠ ঐতিহ্য রেখে গেল তা জাতীয় ইতিহাসে অবিনশ্বর। ১৯১৮ সনের রাউলাট কমিটির রিপোর্টেও 'যুগান্তরে'র বৈপ্লবিক প্রচারকার্যের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

॥ ১১ ॥

বাংলার বিপ্লববাদে মাণিকতলা দলের ভূমিকা

বাংলার বৈপ্লবিক ইতিহাসে মাণিকতলা বাগান বাড়ীর ঐতিহ্যও বড় কম নয়। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ অন্য তিন ভাইয়ের (বিনয় ভূষণ ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ ও অরবিন্দ ঘোষের) সঙ্গে এই বাড়ীর যৌথ মালিক ছিলেন * (৪২)। মাণিকতলার এই বাগান বাড়ীর ঠিকানা ছিল ৩২নং মুরারীপুকুর রোড। এইখানে বারীন ঘোষ ১৯০৭ সনের মাঝামাঝি এক গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। ১৯০৮ সনের ৩রা মে তিনি সি আই. ডি. পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট-এর নিকট যে জবানবন্দী দেন তাতে তিনি বলেন যে গুপ্ত সমিতি স্থাপনের ইঙ্গিত 'যুগান্তর' পত্রেও বিভিন্ন প্রবন্ধাবলীতে প্রদত্ত হয়েছিল এবং এই প্রসঙ্গে "মণ্ডলী গঠন" শীর্ষক প্রবন্ধটির বিশেষ উল্লেখ করেন * (৪৩)। মাণিকতলার গুপ্ত সমিতি ঐ চিন্তাধারার বাস্তব প্রতিমূর্তি। এই গুপ্ত সমিতিতে, বারীন ঘোষের মতে, ষোল জন ব্যক্তি সদস্যভুক্ত হয়েছিলেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল দত্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, প্রফুল্লচন্দ্র চাকী প্রভৃতি। বারীন ঘোষ বলেছেন যে, তাঁর প্রথম দুই ভাই এই গুপ্ত সমিতির বিষয়ে কিছু জানতেন না, কিন্তু অরবিন্দ ঘোষকে মাঝে মাঝে ঐ বাগানবাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হতো।

মাণিকতলার গুপ্ত সমিতিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে বাংলার বৈপ্লবিক ইতিহাস রচিত হতে থাকে। এই সমিতিতে নৈতিক ও ধর্মশিক্ষার সঙ্গে

সঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লববাদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। চরিত্রগঠনের উপর জোর দেওয়া হতো খুব বেশী। সমিতির সাহিত্যে খুব উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছিল "বর্তমান রণনীতি", "মুক্তি কোন্ পথে" ও "Bomb Manual" নামক গ্রন্থগুলি। "বর্তমান রণনীতি" ছিল বারীন ঘোষের রচনা। এর বিষয়বস্তু প্রথমে 'যুগান্তর' পত্রে "যুদ্ধই সৃষ্টির নিয়ম" শীর্ষক প্রবন্ধাকারে বের হয় এবং পরে বর্ধিত আকারে "বর্তমান রণনীতি" পুস্তকের আকার ধারণ করে। শুধু তাত্ত্বিক আলোচনাতেই সমিতির কর্মধারা সীমাবদ্ধ ছিল না। গুপ্ত সমিতি বোমা, বিস্ফোরক পদার্থ, বন্দুক, রিভলভার, ডিনামাইট, নানা জাতীয় অ্যাসিড ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংগ্রহে তৎপর হয়ে উঠেছিল। সমিতিভুক্ত সদস্যদের মধ্যে উল্লাসকর দত্ত ও হেমচন্দ্র দাস বোমা প্রস্তুতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৯০৭ সনে হেম দাস ফ্রান্স থেকে শিক্ষা সমাপ্তে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি তাঁর নবলব্ধ জ্ঞান (বিশেষত বোমা তৈরীর ফর্মুলা) এই সমিতির সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন মাণিকতলা গোষ্ঠীর প্রধান বোমা-নির্মেতা। ১৯০৭ সনের শেষভাগ থেকেই মাণিকতলা গুপ্ত সমিতির সভ্যরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নানা রকম গোপন ষড়যন্ত্রে ও হিংসাশ্রয়ী কর্মে নিযুক্ত হন। বাংলার ছোটলাট অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারের বিশেষ রেলগাড়ীকে চন্দননগরের নিকট পর পর দুবার এবং খড়গপুরের সন্নিকটে নারায়ণগড়ে আর একবার ডিনামাইটের সাহায্যে উড়িয়ে দেবার যে চেষ্টা করা হয় (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০৭) তার পশ্চাতে ছিল বারীন ঘোষ পরিচালিত গুপ্ত সমিতির উদ্যোগ ও আয়োজন। এই তিনটি উপলক্ষে উল্লাসকর দত্তের তৈরী বোমা ও মাইন ব্যবহৃত হয়েছিল। তৎপর ১৯০৮ সনের এপ্রিল মাসে ফরাসী চন্দননগরের মেয়রের উদ্দেশে এবং মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের গাড়ীর (ভুলক্রমে অন্য গাড়ীর) উদ্দেশে যে দুটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয় তা তৈরী হয়েছিল হেম দাসের হাতে। মজঃফরপুরের ঘটনায় বোমাটি ভুলক্রমে অন্য একটি গাড়ীতে নিক্ষিপ্ত হলো যে গাড়ীতে আরোহিণী ছিলেন দুজন নিরপরাধ ইংরেজ মহিলা। দুর্ভাগ্যবশত বোমার আঘাতে তাঁদের দুজনেরই মৃত্যু ঘটেছিল, কিন্তু বোমা নিক্ষেপের আসল লক্ষ্যবস্তু মিঃ কিংসফোর্ড অক্ষত থেকে গেলেন। কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য ইতিপূর্বে (জানুয়ারী,

১৯০৮) একটি পুস্তক-বোমা পার্সেল করে তাঁর ঠিকানায় বারীন ঘোষের দল প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু কিংসফোর্ড তখন কলিকাতার বাইরে থাকায় পার্সেলটি আর খোলা হয় নি এবং পরে ভুলক্রমে ঐ বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। আলিপুর বোমার মামলা চলাকালীন অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তির মধ্যে ঐ পুস্তক-বোমার হদিশ্ পাওয়া যায়। তৎপর অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে পুস্তক -বোমাটি তখন পর্যন্ত কিংসফোর্ডের বাড়ীতে সে অবস্থাতেই পার্সেলের আকারে পড়ে রয়েছে। বরাতের জোরে কিংসফোর্ড সে যাত্রাও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেলেন। ভারত সরকারের বিস্ফোরক দ্রব্যের প্রধান কর্মকর্তা মুস্প্র্যাট উইলিয়ামস ঐ উল্লিখিত বোমা পরীক্ষা করে "a most destructive bomb had it exploded" বলে বর্ণনা করলেন *(৪৪)।

মজঃফরপুর বোমা বিস্ফোরণে দুইটি ইংরেজ মহিলার (মিসেস ও মিস কেনেডির) অপমৃত্যু ঘটলে সমগ্র দেশে নিদারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বোস ছিলেন ঐ বিস্ফোরকের নায়ক। পুলিশের দ্বারা ধৃত হবার পূর্বেই প্রফুল্ল চাকী নিজের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে আত্মাহুতি দিলেন * (৪৫)। ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন। ১৯০৮-এর ১১ই অগাস্ট তিনিও ফাঁসির মঞ্চে আত্মাহুতি দিলেন * (৪৬)।

মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ড ইংরেজ সরকারকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুললো। পুলিশের বুঝতে মোটেই দেরী হলো না যে এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনার সঙ্গে বাংলার বৈপ্লবিকদলের নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান। গোপন সূত্র থেকে কিছু খবর পেয়ে পুলিশ দুই দিন পরে (২রা মে, ১৯০৮) মাণিকতলার বাগান বাড়ীর উপর ঝাপিয়ে পড়ে। মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছানোমাত্র পুলিশ কমিশনার মিঃ এফ. এল. হ্যালিডের বাড়ীতে এক গোপন মন্ত্রণাসভায় স্থির হলো, অবিলম্বে সকল বিপ্লব-কেন্দ্রগুলিতে আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে হবে। এতদনুসারে ২রা মে, ১৯০৮ তারিখে আটটি স্বতন্ত্র পুলিস পার্টি আটটি কেন্দ্রে হানা দেয়। এই কেন্দ্রগুলি ছিল যথাক্রমে ৩২, মুরারিপুকুর রোড, মাণিকতলা ; অরবিন্দ ঘোষের প্রাক্তন আবাসস্থল ২৩, স্কটস্ লেন ; 'নবশক্তি' পত্রিকা অফিস ৪৮, গ্রে স্ট্রীট ; ১৩৪, হ্যারিসন

রোড ; ১৫, গোপীমোহন দত্ত লেন ; ৩৮।৪ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট ; এবং ৪নং ও ৩২।২ নং হ্যারিসন রোড।

মাণিকতলা বাগান বাড়ী থেকে ধৃত হলেন (১) বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, (২) শিশির কুমার ঘোষ, (৩) বিভূতি ভূষণ সরকার, (৪) নলিনীকান্ত গুপ্ত, (৫) বিজয় কুমার নাগ, (৬) উল্লাসকর দত্ত, (৭) ইন্দুভূষণ রায়, (৮) পরেশ চন্দ্র মৌলিক, (৯) শচীন্দ্র কুমার সেন, (১০) কুঞ্জলাল সাহা, (১১) পূর্ণচন্দ্র সেন, (১২) নরেন্দ্রনাথ বক্সী, (১৩) হেমেন্দ্র কুমার ঘোষ এবং (১৪) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩৪, হ্যারিসন রোড থেকে ধৃত হলেন (১৫, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৬) ধরণীনাথ গুপ্ত, (১৭) অশোক চন্দ্র নন্দী, (১৮) বিজয় রত্ন সেনগুপ্ত এবং (১৯) মতিলাল বসু।

৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীট, যেখানে 'নবশক্তি' পত্রিকা অফিস ছিল, সেখান থেকে ধৃত হলেন স্বয়ং (২০) অরবিন্দ ঘোষ, (২১) অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ও (২২) শৈলেন্দ্রনাথ বসু। এছাড়া, (২৩) হেমচন্দ্র দাসকে ধরা হলো ৩৮।৪, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট থেকে, এবং (২৪) কানাইলাল দত্ত ও (২৫) নিরাপদ রায়কে ধরা হলো উত্তর কলিকাতার ১৫, গোপী মোহন দত্ত লেন থেকে। নরেন্দ্র নাথ গোঁসাই, ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল প্রমুখ আরও নয় জন ধরা পড়লেন মে মাসের মধ্যেই।

এই সকল ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। মাত্র ২৯শে এপ্রিল, ১৯০৮ সনে বুধবার তিনি স্কটলেনের বাড়ী ছেড়ে ৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে (নীচতলায়) এসেছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের ধৃত হওয়ার কাহিনী তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকা (৪ঠা মে, ১৯০৮) নিম্নরূপ-ভাবে বর্ণনা করেছে : "Early in the morning on Saturday, at about 4-30 A.M., a strong body of the police, in uniform and in plain clothes, began to knock at the front door. There was delay of about 20 minutes in opening the door. As soon as it was unbarred tho police rushed in, in a body, the officers, revolver in hand, and the others with lathis, and even with guns, it is said. Mr. Ghose was arrested and handcuffed in bed at abouf 5 A.M. It

was followed by an intensive search of the house continuing for about three hours. Sailendra Nath Bose, Manager, and Abinash Chandra Bhattacharya, Assistant Manager, were also arrested, their hands being fastened with ropes.''

"শনিবার ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ উর্দি ও সাধারণ পোষাক পরিহিত এক শক্তিশালী পুলিশবাহিনী সম্মুখ দরজায় ঘা মারতে থাকে। দরজা খুলতে প্রায় ২০ মিনিট দেরী হয়। দরজার অর্গল খোলামাত্র পুলিশ সদলবলে ছুটে ভিতরে প্রবেশ করে। অফিসারদের হাতে ছিল রিভলবার এবং অন্যদের হতে ছিল লাঠি, এমন কি, বন্দুক। মিঃ ঘোষ ভোর পাঁচটা নাগাদ বিছানাতেই ধৃত হলেন ও তাঁর হাতে হ্যাণ্ড কাফ্ পরানো হলো। এর পরে প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপী বাড়ীতে পুঙ্খানপুঙ্খ তল্লাসকার্য চললো। ম্যানেজার শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্যও ধৃত হলেন এবং তাঁদের হাতও দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কৃষ্ণকুমার মিত্র ও ভুপেন্দ্র নাথ বসুর সনির্বন্ধ অনুরোধে অরবিন্দ ও দুই সঙ্গীর হ্যাণ্ডকাফ্ খুলে দেওয়া হয়, কিন্তু জামিনে কাউকেই খালাস দেওয়া হলো না।

সর্বসমেত ছত্রিশ জনের বিরুদ্ধে আলিপুর কোর্টে বোমার মামলা রুজু করা হলো। তাঁদের সকলের বিরুদ্ধেই মূল অভিযোগ ছিল রাজদ্রোহের। মাণিকতলা বৈপ্লবিক গোষ্ঠীর নায়ক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর স্মরণীয় জবানবন্দীতে পুলিশকে জানালেন (৩রা মে, ১৯০৮) যে, তিনিই ছিলেন মাণিকতলা গুপ্ত সমিতির সংগঠয়িতা এবং সারা ভারতের সামনে তাঁদের অবিচলিত দাবী ছিল একটি সফল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান। তিনি বললেন, "We were, though unwilling, compelled to take up the task and work it out to its bitter end. We had taken a vow to serve the nation at the cost of all that we consider dear including life and so like obedient slaves we carried out the behest of the nation." গুপ্ত সমিতি সংগঠনের সকল দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করে বল্লেন যে এরকম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের দ্বারা আমাদের মাতৃভূমির অভিষ্ট পুনরুজ্জীবন সংঘটিত হবে না জানি, তবে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড

হচ্ছে জনগণকে মৃত্যুবরণের আদর্শে এবং দেশের স্বার্থে যে কোনো কর্মে উদ্বুদ্ধ করার উপায়স্বরূপ ("I do not believe that such political murder will bring about our desired regeneration of our mother-land. It is a means to educate the people up for facing death and doing anything for their country's sake.")

আলিপুর বোমার মামলায় কারারুদ্ধ হবার পর প্রেসিডেন্সী জেলে থাকাকালীন বারীন ঘোষের দলের শ্রীরামপুরের নরেন গোঁসাই পৈতৃক প্রাণ রক্ষার তাগিদে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তিনি পুলিশের প্রলোভনের ফাঁদে পা দিলেন—তিনি রাজসাক্ষী হলেন। এই জঘন্য অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে শীঘ্রই করতে হলো অপঘাত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে নরেন গোঁসাইকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করলেন * (৪৮) এবং এরই পরিণতিতে তাঁরা দুজনেই আবার ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ দিলেন। কানাইলাল দত্ত যে সাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করলেন তা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে দুর্লভ ঘটনা *(৪৯)। এক বৎসরাধিক কাল ধরে আলিপুর বোমার মামলা গড়িয়ে চললো। ১৯০৮-এর ১৯শে অক্টোবর ঐ বোমার মামলায় অভিযুক্তদের বিচার আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা ও সেশনস্ জজ মি. সি. পি. বিচক্রফটের কোর্টে সুরু হলো। সরকার পক্ষের প্রধান ব্যারিষ্টার ছিলেন মিঃ নর্টন আর আসামী পক্ষের প্রধান কৌসলী থাকলেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস। ১২৬ দিন শুনানীর পর এই মামলার অবসান ঘটলো ১৪ই এপ্রিল, ১৯০৯। আলিপুর সেশনস্ কোর্টে বিচার চলাকালীন জাতীয় আন্দোলনে নিজের ভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে অরবিন্দ এক অত্যুজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ বিবৃতি রাখলেন। তিনি বিবৃতিতে বললেন, "If it is suggested that I preached the ideal of freedom to my country which is against the law, I plead guilty to the charge. But do not impute to me crimes that I am not guilty of; deeds against which my whole nature revolts, and which having regard to my mental capacity are somthing which could never have been perpetrated by me. If it is an offence to preach the ideal of

freedom, I admit having done— I have never disputed it. It is for that, that I have given up all the prospects of my life. It is for that, I came to Calcutta to live for it and labour for it. It has been the one thought of my waking hours. the dream of my sleep. If that is my offence, there is no necessity to bring witness into the box to depose to different things in connection with that. Here am I and admit it." এর মর্মার্থ হলো, যদি একথা বলা হয় যে আমি আমার দেশের সামনে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করে আইন-বিরুদ্ধে কাজ করেছি, তবে আমি অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু যে সকল অপরাধে আমি অপরাধী নই এবং যে সকল কাজকর্মের বিরুদ্ধে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং আমার মানসিক শক্তির দিকে খেয়াল রাখলে যেগুলি কখনই আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হতে পারে না, সেগুলি আমার উপর আরোপ করবেন না। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা যদি অপরাধ হয়, আমি স্বীকার করছি আমি তা করেছি—আমি কখনও তা অস্বীকার করি না। এই আদর্শের জন্যই আমি আমার জীবনের সুযোগ সমূহ বিসর্জ্জন দিয়েছি। এটাই আমার জাগরণের একমাত্র চিন্তা, আমার নিদ্রার স্বপ্ন। এটাই যদি আমার অপরাধ হয়, তবে আদালতে এই মামলা প্রসঙ্গে নানারকম বক্তব্য রাখার জন্য সাক্ষীদের হাজির করার কোনো প্রয়োজন নেই। এখানেই আমি হাজির রয়েছি এবং আমি অভিযোগ স্বীকার করছি।"

ব্যারিস্টার সি. আর. দাস যে অনন্য দক্ষতার সঙ্গে অরবিন্দের পক্ষ নিয়ে মামলা পরিচালনা করলেন তা ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে অম্লান হয়ে রয়েছে। বিচারক বিচক্রফটকে উদ্দেশ করে সি. আর. দাস আবেগভরা কণ্ঠে অভিযুক্ত অরবিন্দ সম্বন্ধে ঘোষণা করলেন, "যখন সমস্ত তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটবে, যখন উত্তেজনা ও আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং যখন তিনি আর এই মাটির পৃথিবীতে বেঁচে থাকবেন না, তারও বহু পরে মানুষ বলবে তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তাবাদের ঋষি এবং মানবতার পূজারী। তাঁর দেহাবসানের বহু পরে শুধু ভারতবর্ষেই নয়,

সুদূর সাগর পারের নানান দেশেও তাঁর বাণী ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হবে।" * (৫০)

১৯০৯-এর ৬ই মে বিচারক বিচ্‌ক্রফট আলিপুর বোমার মামলায় তাঁর ঐতিহাসিক রায় প্রদান করলেন। বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলো এবং হেম দাস, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল, অবিনাশ ভট্টাচার্য, ইন্দুভূষণ রায়, শৈলেন্দ্র নাথ বোস, বিভূতিভূষণ সরকার প্রভৃতির শাস্তির ব্যবস্থা হলো যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের * (৫১)। যাঁদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ প্রমাণিত হলো না এবং যাঁরা সসম্মানে আলিপুর জেল থেকে বেরিয়ে আসলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন নলিনীকান্ত গুপ্ত, শচীন্দ্র কুমার সেন, কুঞ্জলাল সাহা, নরেন্দ্রনাথ বক্সী, পূর্ণচন্দ্র সেন, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি। কিন্তু যে ব্যক্তির শাস্তি ও মৃত্যুদণ্ড ইংরেজ সরকার কামনা করেছিল সব থেকে বেশী, যাঁর অগ্নিভরা কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করবার জন্য সরকার পক্ষ কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করেন নি, সেই অরবিন্দ ঘোষের—যিনি বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের ছিলেন প্রধানতম নায়ক ও মন্ত্রণাগুরু তাঁর—বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলো না * (৫২)। তিনি আলিপুর জেলে এক বছর আবদ্ধ থাকবার পর বিজয়ীর বেশে নতুন গরিমা নিয়ে দেশবাসীর সামনে আবির্ভূত হলেন।

৬ই মে, ১৯০৯ সনে বেলা এগারটার সময় বিচ্‌ক্রফট তাঁর বিচারের রায় ঘোষণা করলেন। বিচারের রায় ছিল বৃহদাকার। অরবিন্দ খালাস পেলেন দেখে পুলিশ ও সরকার কেউই এই রায়ে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। বাংলার স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের ডেপুটি ইনস্‌পেক্টার জেনারেল এফ. সি. ড্যালি (F. C. Dally) তখন দার্জিলিং-এ অবস্থানরত বাংলা সরকারের চীফ্‌ সেক্রেটারী এফ. ডবলিউ. ডিউককে (F. W. Duke) বিচ্‌ক্রফটের রায় প্রকাশের অব্যবহিত পরেই যে গোপনীয় রিপোর্ট কলিকাতা থেকে পাঠালেন তাতে তিনি মন্তব্য করলেন—অরবিন্দ ঘোষ ও নিখিলেশ্বর রায় মৌলিকের খালাস পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তৎপর ড্যালি লিখলেন, বিচারের রায় নীরবতার সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা গ্রহণ করলেন। অরবিন্দ তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে নির্বিকার ও উদাসীন হয়ে থাকলেন। এই প্রথম হেম দাসকে দেখে মনে হলো যেন উনি ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছেন, আর কিছুর

জন্য নয়, তাঁর ফাঁসি হলো না বলে। ("The sentences were received in silence—that is, silence compared to the turmoil that there has usually been in the Dock. Arabindo—as usual, looked stoically indifferent, and seemed well pleased with himself when he was allowed to walk out and leave the Court. Hem Das for the first time looked seriously depressed. I think he was disappointed at not being sentenced to death."* (৫৩)।

আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলে থাকাকালীন অরবিন্দের মানসে এল বিপুল পরিবর্তন। রাজনৈতিক কোলাহল থেকে তিনি তখন অনেক দূরে। তিনি শান্তি এবং ঝঞ্ঝা উভয়ের মধ্যেই অবলোকন করলেন বাসুদেবের শক্তির প্রকাশ। জেল থেকে তিনি নতুন আত্মদর্শন সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। দেশের চারিদিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলেন গত এক বছরে কত না পরিবর্তন ঘটে গেছে। তিনি দেখতে পেলেন স্বাধীনতার গতিবেগকে স্তব্ধ করবার জন্য ইংরেজ সরকার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে। সভাসমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে, জাতীয় শক্তির কেন্দ্রগুলি একে একে আক্রান্ত ও বিচূর্ণ, জনপ্রিয় নেতারা কারারুদ্ধ বা বহিষ্কৃত এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কণ্টকিত ও বিঘ্নিত। ১৯০৮-এর ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকারের এক দমনমূলক আইনের জোরে (Criminal Law Amendment Act) কলিকাতার ও ঢাকার উভয় অনুশীলন সমিতিকেই বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যে বাখরগঞ্জের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি', ফরিদপুরের 'ব্রতী সমিতি', ময়মনসিংহের 'সুহৃদ সমিতি' ও 'সাধনা সমাজ' সরকারী আদেশ নিষিদ্ধ হলো। অরবিন্দ জেলে যাবার পূর্বে—১৯০৮ সনে—বাংলার আকাশে বাতাসে শুনতে পেয়েছিলেন 'বন্দে মাতরমে'র জয়ধ্বনি ; কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে এসে—১৯০৯ সনে—তিনি লক্ষ্য করলেন সেই মাতৃমন্ত্র ক্ষীণ ও স্তিমিত হয়ে আসছে। এইভাবে বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রথম পর্ব পরিসমাপ্ত হলো। পুরানো বিপ্লবীদের অনেকেই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন, কিন্তু বাংলার বিপ্লব-সাধনা অমর হয়ে থাকলো। ১৯০৮ সনের পরে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকেই বৈপ্লবিক সমিতির কর্মীরা গুপ্তভাবে তাঁদের সংগ্রাম-সাধনা অব্যাহত গতিতে

চালিয়ে যান এবং ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুকূলে বৃহত্তর মানসিক ও রাজনৈতিক পটভূমি রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। "যুগান্তর" তখন মৃত, কিন্তু বৈপ্লবিক "যুগান্তরে"র অন্তরাত্মা থেকে যে আলোকশিখা বিচ্ছুরিত হলো তা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে গেলো সারা ভারতবর্ষে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্রের মামলার অগ্নিগর্ভ থেকে অরবিন্দ বেরিয়ে আসেন ৬ই মে, ১৯০৯। জেলে যাবার পূর্বে তিনি ছিলেন একটি দলের নেতা মাত্র; কারাগার থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন জাতীয় নেতার গৌরবদীপ্ত মূর্তি নিয়ে। প্রত্যক্ষদর্শী বিনয় সরকার "বৈঠকে" বলেছেন যে, আলিপুর বোমার মামলার সময় থেকেই অরবিন্দ দাঁড়িয়ে গেলেন স্বদেশী আন্দোলনের প্রধানতম নেতা হিসাবে, তাঁর নামডাক এত বেশী বেড়ে গেল যার পাশে বঙ্গবিপ্লবের জনক মায় বিপিন পালও যেন তলিয়ে গেলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অরবিন্দের কারামুক্তি উপলক্ষে জনতার মধ্যে বিশেষ কোনো হৈ চৈ বা উত্তেজনার প্রকাশ দেখা গেল না। অরবিন্দও নির্বাক, দেশবাসীও নির্বাক। সরকারী দলননীতির ব্যাপকতা ও তীব্রতার প্রভাব স্পষ্টই পড়েছিল জনতার মনে। প্রায় এক সপ্তাহকাল অরবিন্দ তাঁর কণ্ঠকে নীরব করে রাখলেন। এই নীরবতার পর তিনি প্রথম বাণী দিলেন ১৪ই মে, ১৯০৯। ৬নং কলেজ স্কোয়ার—যেখানে "সঞ্জীবনী" সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র থাকতেন—সেখান থেকে ১৪ই মে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে এক ধন্যবাদজ্ঞাপক চিঠি লিখলেন। ঐ সময়ের কাছাকাছি "বেঙ্গলী" পত্রিকায় তাঁর লেখা দু-একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধও বের হলো। বাংলা "সঞ্জীবনী"তে মোলাকাতের আকারে বের হলো তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার কাহিনী ও জেলের অভিজ্ঞতা। "সঞ্জীবনী"তে প্রকাশিত ঐ বিবরণ অনুবাদের মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষে প্রচার করা হলো। পরে ঐ বিষয়ের উপরে অরবিন্দের নিজের একটি লেখা কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত "সুপ্রভাত" মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল* (৫৪)।

আলিপুর জেল থেকে বের হবার পর জনসাধারণের সামনে তাঁর প্রথম ভাষণ প্রদত্ত হলো উত্তরপাড়ায়। "ধর্মরক্ষিণী সভার" উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় অরবিন্দ এক ঐতিহাসিক বক্তৃতা করলেন (৩০শে মে, ১৯০৯)।

ঐ 'উত্তরপাড়া ভাষণে' অরবিন্দ বিপিন পালকে "one of the mightiest prophets of Nationalism" বলে বিশেষিত করেছিলেন। বক্সার জেলে থাকাকালীন বিপিন পাল যেমন "নারায়ণ" দর্শনলাভ করেছিলেন, তেমন অরবিন্দও আলিপুর জেলে থাকাকালীন "বাসুদেব" দর্শন করলেন—সে কাহিনীও অনবদ্য ভঙ্গীতে বিবৃত করা হলো ঐ বক্তৃতায়। অরবিন্দের দ্বিতীয় বক্তৃতা হলো কলকাতার বিডন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এক স্বদেশী সভায় (১৩ই জুন, ১৯০৯)। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন। ঐ সভায় অরবিন্দ দেশবাসীকে বললেন আরও কঠোরতর দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করবার জন্য আমাদের সকলকে প্রস্তুত হতে হবে, যে দুঃখ কষ্ট আমরা এ পর্যন্ত ভোগ করেছি অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের তুলনায় তা কিছুই নয়। ("This was nothing compared with the price other nations had paid for their liberty.")

অরবিন্দ তৃতীয় বক্তৃতা করলেন বরিশালের 'ঝালকাটি সম্মেলনে' (১৯শে জুন, ১৯০৯)।

॥ ১২ ॥

'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় অরবিন্দের খোলা চিঠি

অরবিন্দ জেল থেকে বেরিয়ে এসে নিজের ভাবাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে "কর্মযোগিন্" নামে একখানি সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকা সম্পাদনা সুরু করলেন। ১৪নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে এর কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রথম সংখ্যা বের হলো ১৯শে জুন, ১৯০৯। ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি এই পত্রিকার প্রধান আলোচ্য বিষয়হলেও রাজনীতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণও এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বের হতো। ১৯০৯-এর জুলাই মাসে গুজব রটলো যে ইংরেজ শাসকেরা শীঘ্রই অরবিন্দকে ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কার করে দেবেন। ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দকে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু অরবিন্দ সেই পরামর্শমত পালিয়ে না গিয়ে "কর্মযোগিনে" প্রকাশ করলেন দেশবাসীর উদ্দেশে একখানি খোলা চিঠি ("An Open Letter to My Countrymen")। অরবিন্দ লিখবার আগে ভাবলেন, যে-কোনো মুহূর্তে তাঁর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে—হয়তো এটাই হবে তাঁর শেষ

রাজনৈতিক ঘোষণা। খোলা চিঠিখানি "কর্মযোগিন্" পত্রিকায় বের হলো ৩১শে জুলাই, ১৯০৯। অরবিন্দ লিখলেন, "In case of my deportation it may help to guide some who would be uncertain of their course of action, and, if I do not return from it, it may stand as my last political will and testament to my countrymen." ঐ চিঠিতে জাতীয়তাবাদী দলের উদ্দেশে তিনি বললেন যে, বর্তমানের অন্ধকার আবার কেটে যাবে, নতুন নেতার আবির্ভাব ঘটবে এবং নৈতিক বলের ও আইনানুমোদিত পথের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে বেশী করে। গুপ্ত হত্যাকে তিনি সমর্থন করলেন না, তবে গুপ্ত হত্যাসমূহ সম্বন্ধে একথাও সেই সঙ্গে লিখলেন, "They are the rank and noxious fruit of a rank and noxious policy and until the authors of that policy turn from their errors, no human power can prevent the poison tree from bearing according to its kind." * (৫৫)।

ঐ খোলা চিঠিতে অরবিন্দ লিখলেন যে বিদেশী কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের আদর্শ। প্রত্যেক জাতির নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী বাঁচবার অধিকার রয়েছে এবং বিদেশীরা আমাদের উপর কেবলই প্রভুত্ব করে চলবে এটা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। অরবিন্দ আত্মশক্তি ও নিরস্ত্র প্রতিরোধের বা বয়কটের আইনানুমোদিত কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য ঐ খোলা চিঠিতে দেশবাসীকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন।

ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দা পুলিশ কর্তৃপক্ষ অরবিন্দের এই প্রবন্ধটিকে স্পষ্টত রাজদ্রোহমূলক বলে বিবেচনা করেছিলেন। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী এইচ. এ. স্টুয়ার্ট ১৩ই অগাস্ট, ১৯০৯ সনে এক গোপন রিপোর্টে বড়লাটকে জানালেন, "It will be seen that the whole policy is anti-British and that the goal is 'absolute autonomy, free from foreign control"* (৫৬)। তিনি আরও লিখলেন, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারানুসারে অরবিন্দের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা যায় কিনা সে নিয়ে বাংলা সরকারকে আইন বিশারদদের অভিমত নেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী এর উত্তরে জানালেন যে উক্ত রচনাটির রাজদ্রোহাত্মকতা নিয়ে বাংলা

সরকারকে দুটি বিষয় বিবেচনা করে দেখতে হবে : প্রথমত, ঐ রচনার ভিত্তিতে অরবিন্দের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে মামলা সফল হবে কিনা, আর দ্বিতীয়ত, ঐ মামলা দায়ের করার কোনো উপযোগিতা আছে কিনা ("to consider the expediency of prosecuting Arabindo Ghose")। বড়লাটের একান্ত সচিব আরও লিখলেন যে, তিনি নিজে চান না যে ভারত সরকার এখনই এরকম একটা মামলায় জড়িয়ে পড়ুক। তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত হলো ঐ রচনার ভিত্তিতে অরবিন্দের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করলে সরকার পক্ষের জয়লাভের সম্ভাবনা বিশেষ কিছু নেই, এবং সরকারী মামলা আবার ব্যর্থ হলে এদেশে ও বিলাতে অত্যন্ত খারাপ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এতে অরবিন্দের ভাবধারাকেই আরও বেশী গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং জনমানসের উপর অরবিন্দের যে প্রভাব ম্রিয়মাণ হচ্ছে তাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং লোকেরা অরবিন্দকে শহীদ রূপে অবলোকন করবে ("Personally, after carefully reading the article I doubt if there is any chance of a conviction, and an unsuccessful prosecution of Arabindo would have a very bad political effect both here and at home. It would give a wide circulation to the views expressed, it would give those views much greater importance than is likely to be attached to them in their present form ; while an acquittal would revive Arabindo's claims to be considered a martyr and would restore an influence which is, I think, on the wane.")।

ঠিক একই ধরণের অভিমত বড়লাটের উদ্দেশে ব্যক্ত করলেন এস. পি. সিংহ ও কিচনার (২৩-৮-১৯০৯)। শেষ পর্যন্ত বড়লাট ২৭শে অগাস্ট সকল দিক বিবেচনা করে স্থির করলেন যে ভারত সরকারের উক্ত রচনা প্রসঙ্গে আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয় ; অরবিন্দের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনতে হলে এ লেখার ভিত্তিতে না এনে আরও কম সতর্কভাবে লেখা অন্য কোনো রচনার ভিত্তিতেই করা চলতে পারে ("If Arabindo is to be prosecuted at all I would base the prosecution on less guarded pronounce-

ments than the 'open letter' (৫৭)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে যে, ১৯১০ সনে অরবিন্দ ঘোষের ফরাসী চন্দননগর হয়ে পণ্ডিচেরীতে পলায়নের অল্পদিন পরেই অরবিন্দ প্রতিষ্ঠিত "কর্মযোগিন্" পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়*(৫৭ক)। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অরবিন্দ ও তাঁর মেজো ভাই কবি মনোমোহন ঘোষও ছিলেন। অরবিন্দ তখন ফরাসী পণ্ডিচেরীতে—ব্রিটিশ আইন ও আদালতের নাগালের বাইরে। নিম্ন আদালতের বিচারে মনোমোহন ঘোষের ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হলো, কিন্তু হাইকোর্ট ঐ আদেশ নাকচ করে দেন।

॥ ১৩ ॥

অরবিন্দের পলায়ন কাহিনী

"কর্মযোগিন্" পত্রিকায় অরবিন্দের "খোলা চিঠি" প্রকাশের ঠিক পরেই তিনি কলিকাতা ছেড়ে চন্দননগরে পলায়ন করেন বলে আজকাল যে সকল কথা বাজারে শুনা যায় তা অনেকটা আজগুবি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন। ভগিনী নিবেদিতার ফরাসী জীবনচরিতকার ম্যাডাম লিজেল রেমঁ ও তাঁর অনুসরণকারী নিবেদিতা গবেষক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী উভয়েই অরবিন্দের পলায়ন প্রসঙ্গে নিজ নিজ গ্রন্থে যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা একেবারেই ভুল ও বিভ্রান্তিকর। তাঁরা উভয়েই বলেছেন যে, বাগবাজারে রামকৃষ্ণ মঠের যোগিন মা অরবিন্দের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়েছে এ খবর প্রথম পান তাঁর আত্মীয় শশিভূষণ দে-র (তিনি আই. বি. অফিসে চাকুরী করতেন) নিকট ; তৎপর যোগিন মা সংবাদটা দেন স্বামী সারদানন্দকে, সারদানন্দ খবরটা দিলেন গণেন মহারাজকে, গণেন মহারাজ দিলেন অরবিন্দকে। অরবিন্দ সংবাদটি পাবার পর কালবিলম্ব না করে দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর পূর্বোল্লিখিত খোলা চিঠিখানি লিখে ফেললেন, সে রাত্রিতেই ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে "কর্মযোগিন্" পত্রিকার দায়িত্ব নিতে বললেন এবং তৎপর নৌকাযোগে চন্দননগরের অভিমুখে রওনা হলেন। এ বিবরণ যে আদৌ ঠিক নয় তা অরবিন্দের ইংরেজী আত্মজীবনচরিত পড়লেই বুঝা যায়। অরবিন্দ লিখেছেন যে, আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্রের মামলা থেকে তিনি খালাস পাবার পরও ইংরেজ সরকার তাঁর

কাজকর্ম ও গতিবিধির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছিল এবং সরকার সবসময়ই চাইছিল তাঁকে আবার কোনো অজুহাতে আটক করে রাখতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিবেদিতা একবার অরবিন্দকে বলেছিলেন যে তাঁকে ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে এবং তাঁর উচিত 'আত্ম-গোপন করে থাকা বা ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে যাওয়া', কিন্তু অরবিন্দ নিবেদিতার পরামর্শ গ্রহণ না করে স্থির করলেন যে দেশবাসীর উদ্দেশে "কর্মযোগিনে" একখানি খোলা চিঠি লিখে তিনি ইংরেজ সরকারের আসন্ন আক্রমণের পরিকল্পনার মোকাবিলা করবেন। অরবিন্দ খোলা চিঠি লিখলেন, এবং পরে নিবেদিতার কাছ থেকে জানতে পারেন তাঁকে বহিষ্কারের পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে * (৫৮)।

অরবিন্দের 'খোলা চিঠি' বের হয় ১৯০৯-এর ৩১শে জুলাই। তা'হলে অরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার বহিষ্কার বা deportation প্রসঙ্গে কথাবার্তা নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৩১শে জুলাই, ১৯০৯-এর পূর্বে। অথচ "কর্মযোগিনে" খোলা চিঠি বের হবার পরও অরবিন্দ প্রায় ৬।৭ মাস ধরে অবাধে কলকাতায় ঘোরাঘুরি করেছেন। তিনি কলিকাতা ছেড়ে চন্দননগরের উদ্দেশে ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১০ সনে রওনা হন, সেখানে পৌঁছান পরদিন ১৫ই ফেব্রুয়ারী * (৫৯)। অতএব বুঝা গেল যে, ১৯১০ সনে অরবিন্দের চন্দননগরে পলায়নের সঙ্গে নিবেদিতার পূর্বোক্ত পরামর্শের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

এ-কথাও আবার বলা হয়েছে যে হাই কোর্টে সি আই. ডি. বিভাগের শামসুল আলমের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হতে পারেন এ খবর নাকি নিবেদিতা অরবিন্দকে পৌঁছে দেন, দুজনের মধ্যে ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হয় এবং তারই পরিণতি হলো অরবিন্দের চন্দননগরে পলায়ন। অরবিন্দ এ বিবরণকেও আষাঢ়ে গল্প বলে উপেক্ষা করেছেন এবং লিখেছেন, "Sister Nivedita knew nothing of these new happenings till after I reached Chandernagore. I did not go to her house or see her"* (৬০)। অরবিন্দ পলায়নের পূর্বে নিবেদিতার উদ্দেশে একখানি চিঠি কেবল লিখে রেখে গিয়েছিলেন ("কর্মযোগিনে"র ভার নেবার জন্য) এবং সে চিঠি নিবেদিতাকে

প্রেরণ করা হয়েছিল অরবিন্দের পলায়নের পূর্বে নয়—চন্দননগরে পলায়নের পরদিন অর্থাৎ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১০।

অরবিন্দের চন্দননগরে পলায়নের আসল ঘটনাটি এইরূপ। ১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারী মাস। তিনি "কর্মযোগিন্" পত্রিকা অফিসে বসে যখন কাজকর্ম করছিলেন, হঠাৎ সে সময় উক্ত পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রামচন্দ্র মজুমদার ঘরে ঢুকে অরবিন্দকে খবর দেন যে একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন, "কর্মযোগিন্" পত্রিকা অফিস পরের দিন খানাতল্লাসী করা হবে এবং সম্পাদকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার ভিত্তিতে অরবিন্দকে বন্দী করা হবে। পত্রিকা অফিসে অরবিন্দকে ঘিরে নিজেদের মধ্যে জোর আলোচনা সুরু হলো—হঠাৎ অরবিন্দ যেন উপর থেকে তিন শব্দের এক দৈবাদেশ পেলেন—"চন্দননগরে চলে যাও" ("go to Chandernagore")। রামচন্দ্র তখন অরবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে রওনা হলেন, একখানি নৌকা ভাড়া করা হলো, বীরেন ঘোষ ও মণি (সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী) নৌকাতে তাঁর সঙ্গী থাকলেন। চন্দননগরে যখন নৌকা গিয়ে রাণীর ঘাটে পোঁছল তখনও রাতের অন্ধকার কাটেনি। অরবিন্দকে চন্দননগরে পৌঁছিয়ে দিয়ে অরবিন্দের সঙ্গীদ্বয় সকাল বেলায় আবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন * ৬১)।

অরবিন্দ চন্দননগরে মতিলাল রায়ের তত্ত্বাবধানে প্রায় দেড়মাস কাল পলাতকের জীবন যাপন করবার পর (১৫ই ফেব্রুয়ারী—৩১শে মার্চ, ১৯১০) তিনি ১৯১০ সনের ১লা এপ্রিল কলিকাতা থেকে ডুপ্লে জাহাজে করে ভারতস্থ ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরীর অভিমুখে রওনা হন। পুলিশের চোখে কিভাবে ধুলা দিয়ে অরবিন্দ ব্রিটিশ ভারত থকে ফরাসী পণ্ডিচেরীতে পলায়ন করলেন সে কাহিনী গল্পের থেকেও রোমাঞ্চকর * (৬২)। এই তাঁর প্রিয় বাংলা দেশ থেকে শেষ বিদায়। ১৯১০ সন থেকে আমৃত্যু ১৯৫০ সন পর্যন্ত অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতেই জীবন যাপন করেছেন।

পণ্ডিচেরীতে অবস্থানকালে অরবিন্দের জীবনের মোড় অন্য খাতে বইতে সুরু করলেও তিনি ভোলেন নি তাঁর প্রিয় বাংলা দেশকে ও ভারতবর্ষকে। স্বাধীন ভারতের মোহিনী মূর্তি তাঁর কল্পনায় ও ধ্যানে থাকলো আগের মতই প্রোজ্জ্বল। ১৯১০ সনে পণ্ডিচেরীতে পলায়নের সঙ্গে সঙ্গেই অরবিন্দের

রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটলো বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ধারণা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘূর্ণীস্রোত থেকে দূরে অন্তরীক্ষে অরবিন্দের সরে যাওয়ার অর্থ এ নয় যে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সকল সম্পর্কচ্ছেদ। বিপ্লবের দর্শনেও গতির সঙ্গে স্থিতির, এমনকি সাময়িক পশ্চাদপসরণেরও স্থান আছে। দেশপ্রেম করতে গিয়ে নির্বোধের আচরণ বিপ্লবের গতিকে ব্যাহত করে মাত্র।

১৯০৭ সনে অরবিন্দকে জব্দ করবার জন্য শাসকগোষ্ঠী "বন্দে-মাতরম্" পত্রিকার বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু করেছিল তা আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও একেবারে ভেঙে পড়লে এবং অরবিন্দ নিরপরাধ বলে আদালতের শাস্তি থেকে খালাস পেলে এখানকার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি উষ্মা ও ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই দলের মুখপত্র "স্টেটস্ম্যান" পত্রিকা প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে "বন্দে-মাতরমে"র সম্পাদকের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ আনে যে পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে অরবিন্দ তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত লেখালেখির নৈতিক দায়িত্ব এড়িয়ে চলেছেন। ঐ পত্রিকা অরবিন্দের উদ্দেশে শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে মন্তব্য করে যে বিলাতের কোনো পত্রিকার সম্পাদক এভাবে কখনও "বন্দে-মাতরম্" সম্পাদকের মতো নিজ নিজ পত্রিকায় লেখা প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করেন না। পাল্টা জবাবে অরবিন্দ "বন্দে মাতরমের" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "স্টেটস্ম্যান"কে জানালেন যে জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের কৃতকর্মের দায়িত্ব নিতে জানেন এবং সে সৎসাহসও তাঁদের আছে। আত্মরক্ষা যদি দেশের স্বার্থে ও বৃহৎ উদ্দেশ্যের স্বার্থে প্রয়োজন হয়, তখন অন্য সকল ভাবনাই তাঁদের কাছে তুচ্ছ বলে বিবেচিত হবে ; কিন্তু যদি এমন অবস্থা আসে যখন আগুনে ঝাঁপ দিলেই দেশের জাতীয় স্বার্থ পরিপুষ্ট হবে, তখন সে পথই তাঁদেরকে বরণ করতে হবে। জাতীয়তাবাদীদের সকল দায়িত্ব স্বদেশবাসীর নিকট, বিদেশীয়দের নিকট নয়। অরবিন্দের নিজের ভাষা হলো নিম্নরূপ : "If he will serve his country best by leaping into the fire, that is his duty ; if self-defence is more to the interests of the country and the cause, no other consideration ought to weigh with him···Bhupendranath and Basanta deliberately exposed themselves to the worst effects of

bureaucratic wrath in order to give an example to the country of heroic self-sacrifice and a living demonstration of the spirit of Swarajism ; but they did it in the full confidence that the *Yugantar* would continue undaunted and unchanged in the course it conceived to be its duty to the nation. Had they exposed themselves with the knowledge that their disappearance would have meant the death of the paper, their action would have been heroic but foolish, an outburst of patriotic sentiment but not an act of patriotic wisdom. To allow the voice of Nationalism to be silenced would be to play into the hands of the adversary to whom we owe no duty."*(৬৩)।

১৯১০ সনে অরবিন্দ দেশের চারিদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন যে সরকারী চণ্ডনীতির চাপের সামনে ব্যক্তি স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ থেকে রাজনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অথচ অনর্থক জেলে পচে দেশের স্বার্থও মোটেই এগুবে না। তাই তিনি পলাতকের জীবন যাপনের পথই বেছে নিলেন এমন এক জায়গায় যেখানে ইংরেজ সরকারের শাস্তির খড়্গ আর তাঁর মাথার উপরে ঝুলবে না। অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে পলায়নের পর কি নিদারুণ আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়েছিলেন তা ভাবলে অশ্রুসিক্ত হতে হয়, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিপর্যয় ও অন্ধকারের মধ্যেও সামনের দিকে ঠেলে দেবার জন্য তখনও তাঁর সাধনা ছিল বিরামবিহীন। রাজনৈতিক অরবিন্দের মৃত্যু ঘটলো ১৯১০ সনে-এ মত বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস কখনই সত্য বলে স্বীকার করতে পারে না। স্বদেশী যুগে রাজনৈতিক ঘূর্ণীস্রোতে অরবিন্দ যখন নিবিড়ভাবে জড়িত সে সময়ও তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল ও অন্তরঙ্গেরা অরবিন্দকে যোগী বলে জানতেন। বিষ্ণুভাস্কর লেলের কাছে তিনি যোগাভ্যাস শিক্ষা করেছিলেন স্বদেশী যুগেই। স্কট লেনের বাড়ীতে—যেখানে অবিনাশ ভট্টাচার্যকে নিয়ে অরবিন্দ দীর্ঘকাল বসবাস করতেন সেখানে—লেলে মহারাজ অরবিন্দকে যোগ শিক্ষা দেবার জন্য বহুবার এসেছিলেন। ইংরেজ সাংবাদিক অরবিন্দ সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"one of the most silent men I have known" *(৬৩ক)। বিনয় সরকার

তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জোরে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, রাজনীতিক ক্ষেত্রার অরবিন্দই ১৯১০-এর পরে যোগী অরবিন্দে বিবর্তিত হলেন এ ধারণা ঠিক নয়। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য হলো বোমার দার্শনিক অরবিন্দ আর যোগী অরবিন্দ একই সঙ্গে পাশাপাশি বহুদিন বিরাজ করেছে। ১৯১০-এর পরবর্তী যুগে অরবিন্দ যোগ সাধনার দিকে বেশী ঢলে পড়েন সত্য, কিন্তু অন্তত ১৯২০ সন পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যে নিবিড় আত্মিক সম্বন্ধ ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পণ্ডিচেরী থেকে অরবিন্দ চন্দননগরের মতিলাল রায়কে যে অজস্র চিঠিপত্র লিখেছিলেন* (৬৪), তা থেকেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে ১৯১০-এর পরেও অনেকদিন ধরে পূর্ব ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের অরবিন্দই ছিলেন মূল প্রেরণাস্থল ও পরামর্শদাতা। ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দা পুলিশের দৃষ্টিতেও তৎকালে এ সত্য বার বার ধরা পড়েছিল। ১৯১১ সনের ডিসেম্বর মাসে এবং ১৯১৩ সনের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মতিলাল রায় বিশেষ উদ্দেশ্যে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও শলা-পরামর্শ করেন। মতিলাল রায় সে সময় ছিলেন চন্দননগরের রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্ণধার এবং চন্দননগরই ছিল তৎকালে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। এই কেন্দ্রবিন্দু থেকেই মতিলাল রায় ও তাঁর নৈষ্ঠিক সহকর্মীরা উত্তর ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। ১৯১৩ সনের ডিসেম্বর মাসে মতিলাল রায় গুপ্তভাবে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে "resided for twenty days, closetted with his leader Aurobindo Ghosh"—সে ঘটনাও যে তৎকালে পুলিশের নজর এড়ায় নি তার প্রমাণ মিলবে ১৯১৪ সনে রাজা বাজার কেস্ সম্বন্ধে ডেনহামের লেখা তৃতীয় রিপোর্টে * (৬৫)। আবার ১৯১৭ সনে চার্লস্ টেগার্ট সরকারকে চন্দননগরের পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে গোপনীয় রিপোর্ট পেশ করেন, সেখানেও তিনি লিখলেন, "...the Chandernagore Settlement, in its present state, an Alsatia for revolutionary fugitives, is an active centre of plots directed towards the subversion of British rule in India." মতিলাল রায়ের মাধ্যমে অরবিন্দ যে তখনও ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছিলেন সেকথাও টেগার্টের

রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আর ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনে মতিলাল রায়ের ভূমিকা সম্বন্ধে টেগার্ট লিখলেন, "This man is an important revolutionary leader, who generally controls and advises both the Eastern and Western Bengal Sections and also keeps in touch with the sister organisations in other parts of India, particularly the United Provinces and the Punjab. He has been responsible for sheltering some of the most dangerous members of the Dacca Samiti in Chandernagore." *(৬৬)

ভারত সরকারের ক্রিমিন্যাল ইনটেলিজেন্সের ডিরেক্টর সি. আর. ক্লিভ্ল্যাণ্ড (C. R. Cleveland) সিমলা থেকে ৭ই জুলাই, ১৯১৭ সনে বাংলার গোয়েন্দা পুলিশের ডি. আই. জি-কে এক পত্রে চন্দননগরে পাওয়া একখানি গুরুত্বপূর্ণ চিঠির বিষয়ে সকল তথ্য ও টিপ্পনীসহ পত্রখানির ইংরেজী অনুবাদ প্রেরণ করেন। ১লা ডিসেম্বর, ১৯১৬ সনে চন্দননগরে ক্ষেত্রচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে খানাতল্লাসের ফলে ফুলস্কেপ সাইজের ৩২ পৃষ্ঠা-ব্যাপী সুদীর্ঘ একখানি বাংলা পত্র পুলিশের হস্তগত হয়। তৎকালীন বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ও কর্মপ্রচেষ্টার একখানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে চিঠিখানি গোয়েন্দা পুলিশ কর্তৃক বিবেচিত হয়েছিল। গোয়েন্দা পুলিশের বিচারে ঐ পত্রের অজ্ঞাতনামা লেখক ছিলেন অরবিন্দ-শিষ্য জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ আর ঐ চিঠিখানি লেখা হয়েছিল চন্দননগরের মতিলাল রায়কে। ঐ গোপনীয় পত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম সাঙ্কেতিকভাবে লেখা হয়েছিল। ঐ পত্রের মধ্যে বহুবার "কর্তা" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল। গোয়েন্দা বিভাগের বিচারে বৈপ্লবিক দলের "কর্তা" বলতে বুঝায় অরবিন্দ ঘোষকে যিনি হলেন "founder of the violence section of the Bengal revolutionary party." চন্দননগরের বর্ষীয়ান বৈপ্লবিক শ্রীমনীন্দ্র নাথ নায়েক আমাদের বহুবার বলেছেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বাঙালী বৈপ্লবিকেরা পণ্ডিচেরীতে অবস্থানরত অরবিন্দের দিকে তাকিয়ে থাকতেন তাঁর নির্দেশ ও পরামর্শ পাবার প্রতীক্ষায়।

* (১) বিনয় সরকারের "The Sociology of Races, Cultures and Human Progress" (১৯২২), "Creative India" (১৯৩৭) ও "Introduction to Hindu Positivism" ১৯৩৭) গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য।

* (২) রমেশ চন্দ্র মজুমদারের "The History of the Freedom Movement in India" গ্রন্থের তিন খণ্ড (১৯৬২-১৯৬৩) ও বর্তমান লেখকদের "The Alleged Uniqueness of India's Freedom Movement" প্রবন্ধটি (*Modern Review*, Aug., 1962) দ্রষ্টব্য।
* (৩) হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের "কংগ্রেস" (১৯২৮) ও বর্তমান লেখকদের "The Growth of Indian Nationalism" (১৯৫৭, পৃ: ১০৫-১১১) দ্রষ্টব্য।
* (৪) বর্তমান লেখকদের "Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj" (১৯৫৮, পৃ: ১১-২১) ও "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ" (১৯৬১, পৃ: ৯২-৯৮) দ্রষ্টব্য।
* (৫) পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আই. বি. রেকর্ড্‌স্—L. N. 47
* (৬) অরবিন্দের "New Lamps for Old" শীর্ষক দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধগুলি বর্তমান লেখকদের "Sri Aurobindo's Political Thought" (১৯৫৮) পুস্তকে সঙ্কলিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।
* (৭) উক্ত পুস্তক, পৃ: ৭১
* (৮) ,, ,, পৃ: ৮০
* (৯) ,, ,, পৃ: ১২০
* (১০) পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আই. বি. রেকর্ড্‌স্—L. N. 54A
* (১০ক) ভগিনী নিবেদিতা বাংলার বিপ্লববাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কতটা সংযুক্ত ছিলেন সে প্রসঙ্গে পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট নিবেদিতা বিষয়ক প্রবন্ধটি পঠিতব্য।
* (১১) ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুস্তকের (৩য় সংস্করণ, ১৯৪৯) পরিশিষ্টে প্রদত্ত অবিনাশ ভট্টাচার্যের বিবৃতি।
* (১১ক) ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "বিপ্লবী প্রমথনাথ" প্রবন্ধ (সাপ্তাহিক "বিপ্লবী বাঙ্গালী", ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৬০) দ্রষ্টব্য।
* (১২) পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আই. বি. রেকর্ড্‌স্—F. N. 022-17
* (১৩) "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (২য় সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ১৯৪৪, পৃ: ২৯৬)।
* (১৩ক) পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আই. বি. রেকর্ড্‌স্—F. N. IV/209 of 1908 এবং "History of the Dacca Anusilan Samiti" গ্রন্থে জে. ই. আর্মস্ট্রং-এর ভূমিকা (২৫-৪-১৯১৭) দ্রষ্টব্য।
* (১৪) বর্তমান লেখকদের "স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ" (১৯৬১) গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায় ও Home (Political A), June, 1908, Progs. Nos. 126-129 ফাইলে সংযুক্ত স্টিভেনসন-মুরের গোপন রিপোর্ট (১-৫-১৯০৮) দ্রষ্টব্য।

*(১৫ "স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ", পৃঃ ১৫৫-১৫৮ দ্রষ্টব্য।

*(১৬) বর্তমান লেখকদের "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ" (১৯৬১) পুস্তকে সন্নিবিষ্ট ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "ভূমিকা"

*(১৭) "স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ" (১৯৬১) পুস্তকের পৃঃ ১৫৯

*(১৮) ব্রিটিশ শাসকেরা "ভবানী মন্দির" পুস্তিকাখানিকে তৎকালে কি চোখে দেখেছিল, তার এক নিখুঁত বিবরণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে রক্ষিত F. N. IV/959 ফাইলটিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কলিকাতা স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডেনহামের রিপোর্টটি এ বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান। ডেনহাম তাঁর গোপনীয় রিপোর্টে মন্তব্য করলেন, "The pamphlet Bhawani Mandir is but a clear forerunner of the far stronger meat which was served up in the *Jugantar*".

*(১৯) গ্রন্থকারদের "Sri Aurobindo and the New Thought in Indian Politics" (১৯৬৪) গ্রন্থের পৃঃ xxiv-xxvi দ্রষ্টব্য।

*(২০) বর্তমান পুস্তকের পৃঃ ৫৫-৬০ দ্রষ্টব্য। 'যুগান্তর'-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এক লিখিত বিবৃতিতে লেখকদের জানিয়েছিলেন যে উক্ত প্রবন্ধটি অরবিন্দের রচনা।

*(২১) বর্তমান পুস্তকের পৃঃ ৫৩ দ্রষ্টব্য।

*(২২) " " পৃঃ ১৪৭-১৫০, ১৬০-১৬৬,

*(২৩) " " পৃঃ ১৬৬

*(২৪) হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের "কংগ্রেস" (৩য় সংস্করণ, ১৯২৮), পৃঃ ২০৫

*(২৫) "স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ", পৃঃ ১৭০

*(২৬) "স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ", পৃঃ ১৬৬-১৬৮

*(২৭) "Bengalee," ২৫শে জুলাই, ১৯০৭

*(২৮) বর্তমান লেখকদের "Sri Aurobindo and the New Thought in Indian Politics" গ্রন্থে (পৃঃ ১২০-১২১) উক্ত প্রবন্ধটি সন্নিবিষ্ট আছে।

*(২৯) ২৬শে জুলাই, ১৯০৭ সনে "বন্দে মাতরম্" পত্রে প্রকাশিত "Srijut Bhupendranath" শীর্ষক প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি অরবিন্দের রচনা। হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ একথা আমাদের বলেছেন।

*(৩০) পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আই. বি. রেকর্ড্স্—F. N. 477 of 1907

*(৩১) Home (Political A), June, 1908, Progs. Nos. 126-129 এবং Confidential Report on Native Newspapers in Bengal (Nos. 31 and 32 of 1907) দ্রষ্টব্য।

*(৩১) "Bengalee" (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯০৭) ও "Bande Mataram"

(৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯০৭) পত্রিকায় কিংসফোর্ডের রায় দ্রষ্টব্য।

* (৩২) "Bande Mataram", Weekly Edition, ৩রা নভেম্বর, ১৯০৭

* (৩৩) "Englishman", ২৪শে নভেম্বর, ১৯০৭

* (৩৪) Home (Pol. A), June, 1908, Progs. Nos. 126-129

* (৩৫) Home (Pol. A), Feb, 1908, Progs. Nos. 18-21 এবং ১৮ই জানুয়ারী, ১৯০৮ সনের "Bande Mataram" পত্র "যুগান্তরে"র তৃতীয় মামলা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

* (৩৬) Home (Pol. A.), June, 1908, Progs. Nos. 126-129

* (৩৭) ঐ

* (৩৮) "যুগান্তর", ৫ই বৈশাখ, ১৩১৫ বা ১৮ই এপ্রিল, ১৯০৮

* (৩৯) Home (Pol. A), July 1908, Nos. 114-118

* (৪০) Home (Pol. A), Aug., 1908, Nos. 99-104

* (৪১) "Bande Mataram", Weekly Edition, ১৪ই জুন, ১৯০৮

* (৪২) পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আই. বি. রেকর্ডস্—F. N. 242 of 1908—বারীন ঘোষের বিবৃতি (৩-৫-১৯০৮) দ্রষ্টব্য।

* (৪৩) বর্তমান পুস্তকের পৃ: ৯৪-৯৯ দ্রষ্টব্য।

* (৪৪) উমা মুখোপাধ্যায়ের "Two Great Indian Revolutionaries" (1966) পুস্তকের পৃ: ২১-২৩ দ্রষ্টব্য।

* (৪৫) "Bande Mataram", May 7, 1908

* (৪৬) উমা মুখোপাধ্যায়ের "The Martyrdom of Khudiram Bose" (*People's Path*, Jullundhar, June, 1968) প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

* (৪৭) পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আই. বি. রেকর্ডস্—F. N. 242 of 1908

* (৪৮) আলিপুর জেলের ভিতরে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইয়ের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় ৩১শে অগাস্ট, ১৯০৮। এই হত্যাকাণ্ডের নায়কদ্বয়—কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্র নাথ বসু—কিভাবে জেলের অভ্যন্তরে রিভলভার হস্তগত করলেন এবং কোন্ কৌশলে এই হত্যাকাণ্ড সফল করে তুললেন তার বিস্তৃত বিবরণের জন্য উমা মুখোপাধ্যায়ের "The Heroism of Kanai Dutt and Satyen Bose" ("*People's Path*, Jullundhar, Aug, 1968) নিবন্ধটি পঠিতব্য।

* (৪৯) ১৯০৯ সনে অরবিন্দ ঘোষ তাঁর উত্তরপাড়া ভাষণে বলেছিলেন, "I found myself among these youngmen and in many of them I discovered a mighty courage, a power of self-effacement in comparison with which I was simply nothing."

* (৫০) গ্রন্থকারদের "Sri Aurobindo's Political Thought" (1958, p. 17)

(৫১) আলিপুর কোর্টে বিচক্রফটের প্রদত্ত রায় কলিকাতা হাই কোর্টের আদেশানুসারে (২৩-১১-১৯০৯) অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছিল। বারীন ঘোষের ও উল্লাস কর দত্তের ফাঁসি হয় নি।

* (৫২) পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আই. বি. রেকর্ডস্—F N. 327 of 1909

* (৫৩) উক্ত রেকর্ডস দ্রষ্টব্য।

* (৫৪) Home (Political A), Oct. 1909, Progs. Nos. 230-248

* (৫৫) *Karmayogin*, Vol. I., No. 6, dated 31st July, 1909

* (৫৬) Home (Political D), Sept. 1909, Progs. No. 28

* (৫৭) *Ibid.*

* (৫৭ক) ২৫।১২।১৯০৯ সনে "কর্মযোগিনে" প্রকাশিত অরবিন্দের "To My Countrymen" প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

* (৫৮) "Sri Aurobindo on Himself and on the Mother" (1 53, pp. 117-118)

* (৫৯) উমা মুখোপাধ্যায় তাঁর "How Sri Aurobindo Absconded to Pondicherry" (*People's Path*, Jullundhar, Sept., 1968) প্রবন্ধে অরবিন্দের চন্দননগরে পৌঁছানোর তারিখ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১০ বলে স্থির করেছেন। কিন্তু নবপ্রকাশিত "Light to Superlight" গ্রন্থে (May, 1972, p. 2) ঐ ঘটনার তারিখ হিসাবে ১৯১০-এর ২১শে ফেব্রুয়ারীর উল্লেখ রয়েছে।

* (৬০) "Sri Aurobindo on Himself and on the Mother", pp. 117-118

* (৬১) *Ibid*, p. 95

* (৬২) উমা মুখোপাধ্যায়েরা "Two Great Indian Revolutionaries" গ্রন্থ (1966, pp. 40-41) দ্রষ্টব্য।

* (৬৩) "The Chowringhee Pecksniff and Ourselves" (*Bande Mataram*, Weekly Edn., Sept. 29, 1907) প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। উক্ত প্রবন্ধ শ্রীঅরবিন্দের রচনা।

* (৬৩ক) Henry Nevinson's "The New Spirit in India" (London, 1908, p. 226) দ্রষ্টব্য।

* (৬৪) শ্রীঅরুণ চন্দ্র দত্ত সম্পাদিত "Light to Superlight" গ্রন্থখানি (মে, ১৯৭২) এই প্রসঙ্গে অবশ্য পঠিতব্য। চন্দননগরের প্রখ্যাত মতিলাল রায়কে লেখা শ্রীঅরবিন্দের ২৬ খানি পত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে কেবল একখানি পত্র—Letter No. 17, dated 29th August, 1914—ইতিপূর্বে উমা মুখোপাধ্যায়ের "Two Great Indian Revolutionaries" গ্রন্থের

পরিশিষ্টে (১৯৬৬, পৃঃ ২৩৩-২৩৭) সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবর্তক সংঘের সৌজন্যে উমা মুখোপাধ্যায় ঐ অত্যন্ত মূল্যবান পত্রখানি নিজ গ্রন্থে প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন।

* (৬৫) পশ্চিম বঙ্গ :সরকারের আই. বি. রেকর্ডস্—Mr. Denham's Third and Final Report on the Rajabazar Case, dated March 26, 1914।

* (৬৬) পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আই. বি. রেকর্ডস্—Mr. C. A. Tegart's Note on the Situation in Chandernagore, dt. the 10th March, 1917

'মুক্তি কোন্ পথে'-র ভূমিকা

'যুগান্তরে'র সূচনায় বলা হইয়াছে যে, ঐ সাপ্তাহিক পত্রের সাহায্যে দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন চিন্তাস্রোতগুলিকে পুঞ্জীকৃত করিয়া একটি সুসংযত সংকল্পপ্রবাহের আকারে এক চরম লক্ষ্যরূপ সাগরসঙ্গমের দিকে পরিচালিত করা 'যুগান্তর'-পরিচালকগণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বর্তমান ক্ষুদ্র পুস্তকে আমরা এমন কতকগুলি প্রবন্ধ 'যুগান্তর' হইতে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া সন্নিবেশিত করিতেছি, যাহাতে পাঠকগণ দেশের চিন্তা ও সাধনার কেন্দ্রস্থানীয় ঐ চরম লক্ষ্যের সম্যক পরিচয় লাভ করিতে পারেন। ভূমিকায় আমরা ঐ লক্ষ্য সম্বন্ধেই একটু আলোচনা করিব।

দেশের চিন্তা ও সাধনা বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল হইল কেন? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘর্ষে, প্রাচীন ও নূতনের সংযোগক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় এই বিশৃঙ্খলা অপরিহার্য, বিশেষতঃ আমাদের দেশে জাপানের মত সমগ্র সমাজ-শক্তি এক স্বদেশীয় রাজছত্রের নিম্নে কেন্দ্রীভূত ছিল না। বন্যার জল যদি নিয়মবদ্ধরূপে উপযুক্ত মোহানা দিয়া সরোবরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়, তবে তড়াগস্থ উদ্ভিজ্জ ও জীব বিপন্ন বা বিপর্যস্ত হয় না। জাপান-রাজশক্তি সুধীবৃন্দপরিবৃত হইয়া স্বহস্তে পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষণীয় আদর্শ ও সাধনাগুলিকে জাপানসমাজে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। নূতনকে প্রকৃতভাবে শিখিতে হইলে শিক্ষার্থীর পক্ষে যে অনুদ্বেগ ও সুস্থচিত্ততার প্রয়োজন শক্তিমনা জাপানের তাহাও ছিল, অতিতীব্র জীবনসংগ্রামেলিপ্ত, হীনতা-দীনতা-লাঞ্ছিত ভারতবাসীর তাহাও নাই। জাপানে উন্নতির সোপান ও ভারতে উন্নতির সোপান একরকম নহে। যে দিন প্রচণ্ড তোপনিনাদে জাপান-উপকূলে পাশ্চাত্যের ভীষণ মুখব্যাদান প্রকটিত হইল, সেদিন হইতে জাপানের উন্নতির ভিত্তি প্রোথিত হইল; সেদিন জাপান প্রথম আত্মশক্তির অনুসন্ধান করিল, সেই ঘনবিপচ্ছায়ায় বসিয়া জাপান আত্মরক্ষার জন্য কোমর বাঁধিল। জাপানের উন্নতির প্রথম সোপান—

আত্মশক্তির উদ্বোধন, মনোনিবেশ, ও এককেন্দ্রীকরণ (The Restoration); এইরূপে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পর অর্থাৎ যখন স্বগৃহ নিরাপদ হইল, যখন উপার্জিতের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাকা ব্যবস্থা হইল, তখন নেতৃগণপরিবেষ্টিত সম্রাটের উপর উন্নতি-তীর্থযাত্রায় "সেথো" বা সর্দার যাত্রীর ভার অর্পণ করা হইল। এইরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া নিরুদ্বেগে, নিঃশঙ্কচিত্তে, এবং উপযুক্ত উপায়ে জাপানসমাজ ভূত ও ভবিষ্যতের সংযোগ-সূত্র ধরিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুশীলনে নিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়াই জাপানের চিন্তা ও সাধনার স্রোত সুসংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উন্নতির দিকে ধাবিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যসভ্যতার নিকট আত্মবিক্রয় করিবার পর পাশ্চাত্যসভ্যতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিল; যেদিন পাশ্চাত্য সভ্যতা চকিতে ভারতবাসীর সম্মুখে আত্মগৌরব বিস্তার করিল, সেদিন ভারতবাসী আত্মবিস্মৃতিতে নিমগ্ন। যে অতীতের সাধনসূত্র হারাইয়াছে, বর্তমানে যাহার আত্মবিশ্বাস নাই, ভবিষ্যৎ যাহার নিকট ঘনতমসাচ্ছন্ন, নূতন সভ্যতাকাননে প্রবেশ করিয়া সে কি কখনও প্রকৃতভাবে উন্নতির জন্য উপযুক্ত পাথেয় আহরণ করিতে পারে? যে মোহাবিষ্ট ও লক্ষ্যহীন, নূতন নূতন আদর্শের অনুশীলন করিবার অবসর পাইলেও সে প্রকৃতভাবে উন্নতির উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারে না। বিগত যুগে ইংরেজাগমনের পর ভারতবাসীর ঠিক এই দশা ঘটিয়াছিল, তাই আজ পর্যন্ত তাহার চিন্তা ও সাধনার মধ্যে এত বিশৃঙ্খলা ও লক্ষ্যহীনতা। যে জনসমাজ আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইয়া আপনার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংযোগ-সূত্র সুস্থচিত্তে ও নিঃশঙ্কহৃদয়ে অবলম্বন করিয়া জগতের সাধনক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে পারে না, মনুষ্য সমাজের বিবর্তন ও ক্রমবিকাশে প্রকটিত নূতন নূতন তত্ত্ব ও আদর্শের সম্যক অনুশীলন ও শিক্ষা সে জনসমাজের পক্ষে অসম্ভব।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে চিন্তা ও সাধনার মধ্যে অনিবার্যরূপে বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িয়াছে। যতদিন এই বিশৃঙ্খলাই প্রবল থাকিবে ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই;—ততদিন সাহিত্যিকের সজোর লেখনীচালনায়, অথবা রাজনীতিকের উদ্দীপনা ও বাগ্মিতায়, অথবা সমাজ-সংস্কারকের তীব্র ভ্রূকুটী ও প্রতিবাদে, অথবা ধর্মসংস্কারকের

গভীর ব্যাখ্যা ও ব্যাকুল অনুযোগে কোন প্রকার স্থায়ী সুফল প্রকাশ পাইবে না। আমাদের দেশের প্রাচীন দর্শনে ব্যষ্টি ও সমষ্টির একটা প্রভেদের উল্লেখ আছে। এই বাক্যদ্বয় যদি বর্তমান প্রসঙ্গে একটু অসঙ্কোচে ব্যবহার করা যায় তবে অনেক কথা বলিবার সুবিধা হয়। জগতের ইতিহাস ও আধুনিক সমাজতত্ত্বের সম্যক আলোচনা করিলে দুইটী বিষয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। ১ম :—ব্যষ্টি (সমাজের ব্যক্তিগত এক একটী অংশ বা individual unit) ও সমষ্টির (সমগ্র সমষ্টি বা collective whole) মঙ্গল বা উন্নতি পরস্পরসাপেক্ষ অর্থাৎ একের মঙ্গলে অপরের মঙ্গল, একের অনিষ্টে অপরের অনিষ্ট। ২য় :—সমষ্টির প্রতিষ্ঠা বা স্থিতির মূলভিত্তি স্বাতন্ত্র্য ; পরতন্ত্রাধীন সমষ্টির বাস্তব সত্তা নাই, উহা কল্পনা মাত্র,—যেমন হৃদ্‌যন্ত্রহীন জীবের সত্তা থাকে না, সেইরূপ। জীবমাত্রেরই যেমন রক্তসঞ্চালনের জন্য একটী কেন্দ্রস্থিত যন্ত্র আছে, তেমনি প্রকৃত অর্থাৎ জীবিত সমষ্টিমাত্রেরই সর্বাঙ্গে শক্তিসঞ্চালন ও শক্তিসংগ্রহের জন্য একটী স্বাধীন যন্ত্র স্বীয় অঙ্গীভূত থাকে ; এই কেন্দ্রস্থিত যন্ত্রকেই রাজশক্তি বা রাজসরকার বলে। এই স্বতন্ত্র শক্তিকেন্দ্র ব্যতীত এক মুহূর্তও সমষ্টি জীবিত থাকিতে পারে না।

উল্লিখিত দুইটী তত্ত্ব যদি সর্বদা স্মরণ থাকে তবে চিন্তা ও সাধনার বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমরা প্রকৃত পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব এবং লক্ষ্যহীন হইয়া আদর্শ হইতে আদর্শান্তরে কেবলই আমাদিগকে বিভ্রান্ত হইতে হইবে না। এদেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষের পূর্বে আমরা একটা দেশব্যাপী সমষ্টির অঙ্গীভূত হইয়া ব্যক্তিগত জীবন নির্বাহ করিতাম না ; সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে যে উন্নতিমূলক আদান প্রদান হয়, তাহার প্রভাবও দেশে বিদ্যমান ছিল না। ব্যষ্টির চরিত্র গঠনের পক্ষে পারিবারিক বা কুলগত বা স্বধর্মগত একটা প্রভাব বিদ্যমান থাকিত বটে, কিন্তু সে সর্বদা সাক্ষাৎভাবে সমষ্টির ক্রোড়ে থাকিয়া লালিত পালিত হইত না। সেক্ষপিয়রসৃষ্ট ব্রুটাসপত্নী যে ভাবে পিতা ও ভর্তার গৌরব করিয়াছিল (thus fathered, and thus husbanded), বর্তমান ইংরাজ তেমনই স্বচরিত্রের প্রসঙ্গে আপন নেশনের গৌরব করিতে পারে ; কিন্তু ভারতবাসী কখনও ঠিক ঐ গৌরবের আস্বাদ পায় নাই। আর সে আস্বাদন পায় নাই বলিয়াই সমষ্টির ক্রোড়েপালিত ব্যষ্টিচরিত্রোচিত গুণাবলীও পায় নাই। ইংরাজের মত ভারতবাসী

দশে মিলিয়া কাজ করিতে পারে না, ইংরাজের মত ভারতবাসীর স্বার্থানুধাবনে সমষ্টির হিসাব নাই, ইংরাজের মত ভারতবাসী স্ফীতবক্ষে অজ্ঞাত দেশে যাইয়া আত্মোন্নতি করিতে পারে না, ইংরাজের মত ভারতবাসী বৃহৎ আকারে ব্যবসায় বা কারখানা করিতে পারে না—ইত্যাদি ইত্যাদি যে সকল অভাব অহর্নিশি ভারতবাসীর চরিত্রে প্রকাশ পাইতেছে, সে সকল কি কেবল আত্মগ্লানি দ্বারাই অপনীত হইবে? এই সমস্ত অভাব কি স্বাভাবিক নহে? দেশে একটা সমষ্টিগত জীবনের প্রতিষ্ঠা না হইলে কখনও কি এই সমস্ত অভাব দূর হইবে? ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া এই সকল অভাব আমাদের দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল; তাই সর্বত্রই আমরা এ পর্যন্ত আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রতিবাদ শুনিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই পথ নির্ণয়ের সময় আসিয়াছে, এবার বুঝিয়া দেখিতে হইবে যে, ইউরোপ বা ইংলণ্ডে ব্যষ্টির মধ্যে যে সকল সদ্‌গুণ পরিলক্ষিত হইতেছে, সে সকল শিক্ষা করিবার উপায় কি। সদ্‌গুণাবলীর বর্ণনাতেই কেবল সদ্‌গুণের শিক্ষা হয় না, সদ্‌গুণকে চরিত্রগত করিতে হইলে সেই সদ্‌গুণবিকাশক উপযুক্ত কর্ম বা সাধনা চাই; উপযুক্ত কর্ম বলিলেই একটা বিশেষ কর্মক্ষেত্র (environment) বুঝায়। যে দেশে সমষ্টিগত জীবন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সে দেশে ঐরূপ বিশিষ্ট কর্মক্ষেত্র না থাকাতে ইউরোপীয় ব্যষ্টির সদ্‌গুণাবলী বিকশিত করিবার উপায় নাই। অতএব উল্লিখিত প্রথম তত্ত্বটির সাহায্যে ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, ইউরোপের নিকট মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধীয় বিশেষ কতকগুলি সদ্‌গুণের আদর্শ কল্পনাদ্বারা লাভ করিয়াও দেশে সমষ্টিগত জীবনের অভাবে আমরা সেই সকল সদ্‌গুণ ব্যষ্টির মধ্যে বিকশিত করিতে সমর্থ হইব না। **ব্যক্তিগত চরিত্রের স্থায়ী উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে সর্বাগ্রে সমষ্টির প্রতিষ্ঠাবিষয়ে আমাদিগকে উদ্যোগী ও সচেষ্ট হইতে হইবে।**

দ্বিতীয়তঃ দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতিও বর্তমান যুগে উন্নতিশীল সমষ্টির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ইউরোপে আজকাল সর্বত্রই আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির পশ্চাতে সমষ্টির শক্তি বিদ্যমান; এই সমষ্টিশক্তির প্রভাবে ইউরোপের বাণিজ্য দেশ হইতে দেশান্তরে উল্লাসে বিজয়কেতন উড্ডীন করিয়াছে! আজ যে দেশ জগতের বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে,

তাহাকেই ইউরোপের সহিত প্রতিযোগিতারূপ একমাত্র তোরণপথ অবলম্বন করিতে হইবেই। এবং ইহা সুনিশ্চিত যে, যে-দেশের আর্থিক বা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় উদ্যমের পশ্চাতে সমষ্টিশক্তির পূর্ণ প্রভাব বিরাজ করিতেছে না, সে দেশের পক্ষে ইউরোপের সহিত প্রতিযোগিতা একটী বিড়ম্বনা মাত্র। অনেকে আজকাল মনে করেন যে, ভারতবর্ষে শিল্পবাণিজ্যের পশ্চাতে সমষ্টিশক্তি স্বদেশী রাজসরকারের আকারে বর্তমান না থাকিলেও, বয়কট বা বহিষ্করণনীতির সাহায্যে আমরা ঐ সমষ্টিশক্তির স্থান পূরণ করাইয়া লইব। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, বয়কটকে প্রকৃত কার্যকরী করিতে গেলেই যে বিদেশীয় রাজশক্তি আমাদের দেশে সমষ্টিশক্তির স্থান অধিকার করিয়া বিরাজিত, তাহার সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য এবং এই সংঘর্ষে বিজয়লাভ করা আর স্বাধীনতা লাভ করা বা স্বদেশীয় সমষ্টিশক্তির প্রতিষ্ঠা করা একই কথা।

স্বদেশোন্নতির যে অঙ্গের কথাই চিন্তা করা যাউক না কেন, আজকাল উন্নতি বলিতেই সমষ্টিগত উন্নতির কথাই বুঝাইবে। যে দেশে প্রকৃতই একটা সমষ্টিগত জীবনের (Collective life or national life) এখনও প্রতিষ্ঠা হয় নাই, আদর্শমাত্র প্রকটিত হইয়াছে, সে দেশে সমষ্টিগত উন্নতির জন্য উদ্যোগের পূর্বে প্রকৃত সমষ্টির প্রতিষ্ঠাই কি লক্ষ্যস্থানীয় হওয়া উচিৎ নয়? আমাদের দেশে এই সমষ্টি নাই বলিয়াই সমস্ত সমষ্টিগত অনুষ্ঠান সহজে নিষ্ফল হইয়া যায়। জাপানের এ দুর্দশা হয় নাই। জাপান প্রথমেই সমষ্টি ও সমষ্টির প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠা করিয়া বিবিধ সমষ্টিগত অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। এই শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রকৃত সময় আজ এদেশে আসিয়াছে। **যে সমষ্টির উদ্যমই দেশে সকল প্রকার উন্নতির মূলভিত্তি, সেই সমষ্টির প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কোনপ্রকার উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। এই স্বতন্ত্র স্বাধীন সমষ্টির প্রতিষ্ঠাই দেশে স্থায়ী উন্নতির প্রথম সোপান।**

পরিশেষে আর একটী কথা উল্লেখযোগ্য। দেশের চিন্তা ও সাধনা কোন্ লক্ষ্যাভিমুখে কেন্দ্রীভূত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও অনেকে মনে করেন যে, আমরা এখনও ঐ লক্ষ্য সাধনের উপযুক্ত অধিকারী হই নাই। তাঁহারা বলেন যে, দেশে 'সমষ্টি' বা স্বাধীনতার

প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্বে ব্যষ্টির চরিত্রে কতকগুলি গুণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, অতএব অন্য কোন লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে ঐ সকল গুণের অনুশীলন করিতে হইবে। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, দেশে স্বতন্ত্র 'সমষ্টি'র প্রতিষ্ঠা করিবার উপযোগিতা আমাদের নাই, তথাপি ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, সেই উপযোগিতা **উপযুক্ত কর্ম বা লক্ষ্যাভিমুখীন অনুষ্ঠান** ব্যতীত কখনও আমরা লাভ করিতে পারি না। 'দেশে লোক কই' শীর্ষক প্রবন্ধে এই উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। যাঁহাদের ধ্যান স্বাধীনতা, যাঁহারা সেই স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য সর্বদাই উদ্যোগী হইয়া দেশের মধ্যে সমসঙ্কল্পাধীন লোক সমূহকে একসূত্রে বাঁধিতেছেন, যাঁহারা সেই ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্র রচনা করিবার জন্য সর্বত্র নানা প্রকারে শক্তিসঞ্চয় ও শক্তিসংগ্রহ করিতেছেন, যাঁহারা ঐ উচ্চ আদর্শের তাড়নায় আলস্য ও স্বার্থ বিসর্জন দিতে শিখিতেছেন, তাঁহারাই ঐ লক্ষ্য সাধনের জন্য উপযোগিতা লাভ করিতেছেন। স্বাধীনতার জন্য উপযোগিতা লাভ করিতে হইলে পরাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া পরাধীনতামূলক কোন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, সেই উপযোগিতা লাভ করা দূরে থাকুক আরও বীর্যহীন ও স্বার্থজড়িত হইয়া পড়িতে হইবে। উল্লিখিত প্রবন্ধে ('দেশে লোক কই') এ বিষয়ে আরও বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 'মুক্তি কোন্ পথে' এই ক্ষুদ্র পুস্তক পড়িয়া যদি বঙ্গীয় পাঠকদিগের মনে স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ় সঙ্কল্প জাগ্রত হয়, তাহা হইলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব। ইতি—

১লা মাঘ
সন ১৩১৩ সাল। } শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য

আমাদের রাজনীতিক আদর্শ*

নিরীহো নাশ্নুতে মহৎ।

যে দেশেই হউক, বা যে জাতিরই হউক, জাতীয় অভ্যুত্থানের উদ্যোগ যখন আরম্ভ হয়, তখন তজ্জন্য একটী বৃহৎ ও উদার রাজনীতিক আদর্শ চাই। মহাত্মা রুসোর সাম্যনীতি প্রচার না হইলে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের আবেগময়ী উচ্চাকজ্ক্ষা অর্ধমৃত ফ্রান্সকে জাগাইয়া সমস্ত ইয়োরোপখণ্ডকে প্লাবিত করিতে পারিত না। মনুষ্যমাত্রের স্বভাবজাত স্বত্ব প্রাপ্তির জন্য আমেরিকা লালায়িত না হইলে মার্কিণ যুক্তরাজ্য কখনও সৃষ্ট হইত না। ঋষিতুল্য ম্যাজিনি উচ্চ আশা ও উদার আদর্শ নব্য ইতালীর হৃদয়ে সঞ্চারিত না করিলে সেই পতিত জাতি কখনও চিরদাসত্বের বন্ধন কাটিতে পারিত না। অনুচ্চ ও সঙ্কীর্ণ আদর্শ, ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য, তুচ্ছ সাবধানতা ও ভীরুতা এবং অদূরদর্শী ও সাহসপরাঙ্মুখ নেতাদল,—এ সকল হেয় উপাদান কখনও জাতীয় শক্তি গড়িবার উপযুক্ত সামগ্রী হইতে পারে না। এরূপ ক্ষুদ্র উপাদান লইয়া কোনও জাতি কোনও কালে মহত্ত্বের উচ্চ সোপানে উঠে নাই। নিরীহো নাশ্নুতে মহৎ,—যাহার আশা ক্ষুদ্র, সে কখনও মহত্ত্ব ভোগ করে না,—মহাভারতের এই উক্তি রাজনীতিবিদের সর্বদা স্মরণ করা উচিৎ।

ছেলেমানুষী ও গোলামির অভ্যাস

আমরা শতাব্দীকাল ক্রমাগত পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষণে পড়িয়া জাতীয় উন্নতি ও রাজনীতিক স্বত্ব প্রাপ্তির চর্চা করিতেছি। কার্যে কিন্তু উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইয়াছে। রাজনীতিক স্বত্বপ্রাপ্তি দূরের কথা, আমাদের রাজনীতিক জীবন, বাণিজ্য, বিদ্যা, চিন্তাশক্তি ও ধর্মভাব সবই শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অন্নের জন্য, পরিধেয় বস্ত্রের জন্য, শিক্ষার জন্য, রাজনীতিক স্বত্বের জন্য এবং বুদ্ধিবিকাশ ও চিন্তাপ্রণালীর জন্য

---

* ২৫শে চৈত্র, ১৩১২ সাল—'যুগান্তর'

আমরা পরমুখাপেক্ষী। ইংরাজ আমাদিগকে কয়েকটী খেলনা দিয়াছে বলিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। যে জাতির মন ও শরীর উভয়ই পরাধীন, সে জাতির পক্ষে রেল, টেলিগ্রাফ্, ইলেক্‌ট্রিসিটি, মুানিসিপালিটী, বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় মহাসমিতি প্রভৃতি বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার, এবং পাশ্চাত্য রাজনৈতিক জীবনের যত সামগ্রী, সবই খেলনা মাত্র। লর্ড রিপণ বা মিঃ মরলী আমাদিগকে যতই স্বত্ব দিন না কেন তাহাতে আমাদের জাতীয় জীবনের অপকার ভিন্ন উপকার হইবে না। সেগুলিও খেলনা বই আর কিছুই নহে; **যাহা স্বপ্রয়াসলব্ধ তাহাই স্বত্ব; পরের দান স্বত্ব নহে।** অতএব এই স্বত্বগুলি প্রকৃত স্বত্ব নহে, তাহাদের উপর আমাদের কোন স্থায়ী অধিকার নাই; আজ রিপণ দিল, কাল কার্জন কাড়িয়া লইবে। আর আমরা 'হায়! আমাদের খেলনা গেল, কি ঘোর অন্যায়!' বলিয়া সহস্র সভাসমিতিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিব। ছেলেমানুষী আমাদের বর্তমান রাজনীতিক জীবনের একটী মুখ্য লক্ষণ। আর একটী লক্ষণ দাসত্বের অভ্যাস। আমরা উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলেও গোলাম. সিভিলিয়ান জজ, মুানিসিপাল কমিশনার, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিক, ব্যবস্থাপক সভার সভাসদ, সকলেই শৃঙ্খল পরিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছেন। তবে আমরা এমন ক্ষুদ্রাশয় হইয়াছে যে, সেই শৃঙ্খল স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত বলিয়া গর্ব করিতে আমাদের লজ্জা বোধ হয় না! গোলামী প্রগাঢ় কুয়াসার মত আমাদের সমস্ত জীবন ছাইয়া ফেলিয়াছে। সুখের কথা এই যে, এতদিন আমরা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, এখন চক্ষু খুলিয়া আমাদের হীনাবস্থা বুঝিতে পারিতেছি। এই সর্বব্যাপী পরাধীনতা আর সহ্য হয় না, যে উপায়েই হউক শিক্ষায়, বাণিজ্যে ও রাজনীতিক জীবনে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে, এই ভাব ক্রমে দেশময় সঞ্চারিত হইতেছে। ইহাই ভবিষ্যতের আশা। ইহাতে বুঝিলাম আমরা জাগিয়াছি, আর সেই ঘুম-পাড়ান গান শুনিব না, আর কোন প্রতিবন্ধক বা কাহারও নিষেধ মানিব না, আমরা উঠিবই উঠিব।

জাতীয় মহাসমিতির ক্ষুদ্রাশয়তা

শতাব্দীকালের চেষ্টার এমন পরিণাম হইল কেন? জাপান ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবৃন্দের সমকক্ষ মহৎ জাতি হইতে পারিল,

আমরা কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেলাম, এই বৈষম্যের কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল আমাদের **রাজনীতিক আদর্শের ক্ষুদ্রতা ও হীনতা**। যে জাতীয় মহাসমিতি আমাদের রাজনীতিক জীবনের চরম উৎকর্ষ বলিয়া গৃহীত, সে মহাসমিতির উদ্দেশ্য তলাইয়া বুঝিতে যাইলেও এই ক্ষুদ্রতারই পরিচয় পাই।

গোলামের জ্যাঠামি

জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য কি? অনেকে জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্যের নাম দিয়া এই কথা প্রচার করিতেছেন, "ইংরাজ রাজপুরুষগণ দেশকে উত্তমরূপে শাসন করিতেছেন। তবে তাঁহারা বিদেশী বলিয়া ভারতবাসীর মনের ভাব বুঝিতে অক্ষম, সেইজন্য শাসনের অল্পসল্প দোষ আছে। আমরা প্রতি বৎসর ভারতবাসীর আবেদন তাঁহাদের নিকট জানাইয়া শাসন কার্যে সহায়তা করিব, তাহা হইলেই বৃটিশ শাসন নির্দোষ হইবে।" রাজপুরুষগণ কিন্তু আমাদের এই অযাচিত সাহায্য দান গ্রহণ করেন না, বরং গোলামের ধৃষ্ঠতা ও অপকবুদ্ধির জ্যাঠামি বলিয়া অবমাননা করেন; কংগ্রেস প্রতি বৎসরে অনাহূতভাবে রাজপুরুষদিগের নিকট সাহায্য করিতে উপস্থিত হয়, এবং পরিশেষে অপমানের বোঝা মাথায় লইয়া ফিরিয়া আসে। তাহাতেও আমাদের ধৈর্য ভঙ্গ হয় না। আমরা বলি সম্প্রতি অনাহূত হইয়া যাই, হয়ত রাজপুরুষগণ একদিন দয়া করিয়া আমাদের সহায়তা স্বীকার করিবেন। যাহারা এইরূপ ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য লইয়া রাজনীতিক কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করে, তাহারা কি কখনও এই বীরভোগ্যা বসুন্ধরার একটী সুমহৎ জাতি হইতে পারে?

চিরস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা

কেহ কেহ আবার বলেন জাতীয় মহাসমিতি His Majesty's permanent opposition; যেমন বৃটিশ পার্লামেন্টে রক্ষণশীল দলের শাসন সময়ে উদারনীতিকদল তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে থাকে, আমরাও এ দেশে বৃটিশ রাজপুরুষগণের সেইরূপ স্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী। এইরূপ চিরস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতাই আমাদের আদর্শ। ইংরাজ গুরুদিগের নিকট যে কয়েকটী বুলি শিখিয়াছি, সেই সকলের মধ্যে ইহাও একটী বুলিমাত্র; যেমন constitution নাই,

তথাপি constitutional আন্দোলন করিতে যাই, তেমনই পার্লামেণ্ট নাই, তথাপি পার্লামেণ্টের নিরর্থক অনুকরণকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করি। স্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অর্থ নিষ্ফল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বর্তমান রাজপুরুষগণকে বহিষ্কৃত করিয়া স্বয়ং শাসন করা এবং বর্তমান নীতির বদলে স্বকল্পিত নীতি প্রচলিত করা, ইহাই পার্লামেণ্টের প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অবলম্বন করিতে জাতীয় মহাসমিতির শক্তিও নাই, সাধ্যও নাই; যে কার্যে সফলতার আশা নাই, নিতান্ত উন্মত্ত না হইলে কেহ সজ্ঞান অবস্থায় সেই কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব এই আদর্শ নিতান্ত অসার ও অসঙ্গত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় স্বার্থ

আমাদের নেতাগণ এইরূপ অতিক্ষুদ্র ও অসার উদ্দেশ্য লইয়া যদি সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলে জাতীয় মহাসমিতি একদিনও টিকিত না। কিন্তু মহাসমিতিতে অন্য ধরণের লোকও আছেন, তাঁহারা ইহার অপেক্ষা কিছু উচ্চেও উঠিতে পারেন। ইঁহাদের আদর্শ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় স্বার্থ লইয়া গঠিত, যেমন সমকালীন পরীক্ষা, ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত সভাসদের প্রবেশ, হোম চার্জ কমাইবার জন্য অধিকাংশ উচ্চ বেতনের চাকুরী ভারতবাসীকে দান ইত্যাদি। আমরা বলি মহাসমিতির সকল দাবীই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া কখনও কি এমন বিরাট রাজনীতিক আদর্শ গঠিত হইতে পারে, যাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষকে মাতাইতে পারিবে? এইগুলি লইয়া কখনও কি এক মহৎ জাতীয় ভাব দেশময় সঞ্চারিত হইবে?

কৃষ্ণবর্ণ দাস ও বাগ্মিতায় বাহবা

ভারতবাসী সিভিলিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে দেশের লাভ কি? দেশের ত্রিশ কোটী লোক ত গোলামই রহিয়া গেল। যাহারা সিভিলিয়ান হইবে, তাহারা স্বজাতির প্রভু হইলেও বিদেশীর গোলাম, রাজপুরুষদিগের আদেশ পাইলেই স্বজাতির অনিষ্ট করিতে বাধ্য। ভারতবাসীকে দাসত্বে ডুবাইয়া রাখিবার পুণ্যকার্যে গবর্ণমেণ্টের কয়েকটী কৃষ্ণবর্ণ দাস জুটিবে বই ত নয়। কিংবা যদি ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের নির্বাচিত সভাসদ প্রবেশ করে, তাহাতেই বা কি সুফল হইল? বাগ্মিতা ও রাজনীতিক

দক্ষতা দেখান এবং রাজপুরুষগণের ও লোকসাধারণের বাহবা পাওয়ার পক্ষে ব্যক্তিবিশেষের তাহাতে যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু দেশের একবিন্দুও উপকার হয় না ; হইবেই বা কেন ? এই সকল দাসত্বের কারখানায় আমরা বড় বড় মিস্ত্রি হইলে কারখানার প্রভুরা তাহাদের ব্যবসায় ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, এই অদ্ভুদ যুক্তি রাজনীতিক অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক !

দরিদ্রতার প্রতিকার

এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের উপর লক্ষ্য রাখার ফল এই হয় যে, ভুল পথ অনুসরণ করিতে যাইয়া দেশের প্রকৃত কার্য বন্ধ হইয়া যায়। ভারতের ভীষণ দারিদ্র্যের কথা ধর। হোম চার্জ যদি কমান হয়, তাহা হইলে দারিদ্র্যের কতকটা লাঘব হইবে, একথা স্বীকার করি। কিন্তু দারিদ্র্যের অল্পমাত্রায় লাঘব করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র্য মোচনই উদ্দেশ্য। সেই দারিদ্র্য মোচনের দুইটী উপায় আছে, কৃষি সম্বন্ধে সমস্ত ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিবদ্ধ করা এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে সংরক্ষিত বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করা। এ অবস্থায় অনন্যচিন্ত্য হইয়া সেই দুইটী দাবীই সর্বাগ্রে রাজপুরুষদিগের নিকট আদায় করিবার চেষ্টা কংগ্রেসের প্রথম কর্তব্য ছিল। রাজপুরুষগণ কিন্তু কখনও সে দাবী শুনিবেন না। সুতরাং উপায়ন্তর স্বাবলম্বন। দেশময় বৃটিশ বাণিজ্যের বয়কট প্রচার কর, ভারতের কোটী কোটী কৃষিজীবীকে নিজেদের দুরবস্থার কারণ ও মুক্তির উপায় বুঝাইয়া দাও। দেখি রাজপুরুষগণ কত দিন একটী মহৎ জাতির দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন। কিন্তু জাতীয় মহাসমিতি বয়কটের নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠে, এমন কি স্বদেশী সম্বন্ধেও কোন প্রস্তাব করিতে চাহে না, পাছে ইংরাজের কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগে।

উচ্চ আদর্শের মত্ততা

দাসত্বশৃঙ্খল অটুট রাখিয়া তাহাতে লৌহের ভাগ কমান এবং সোনা রূপার ভাগ বাড়ান, ইহাই মহাসমিতির আদর্শ। কয়েকজন শান্তি ও সুখপ্রিয় মধ্যবিত্ত লোক লইয়া যদি আমাদের রাজনীতিক জীবন গড়িলেই

হইত, তাহা হইলে তজ্জন্য ইহাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে এ ক্ষুদ্র ও নগণ্য আদর্শ অতিক্রম করা উচিত। এরূপ আদর্শের জন্য কে কবে স্বদেশানুরাগে মাতিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রকৃত স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, কিংবা সর্বপ্রকার বিভীষিকা ও প্রলোভনকে তুচ্ছ করিয়া কর্তব্যপথে মহাবেগে অগ্রসর হইয়াছে? পক্ষান্তরে দেখ, যখন তোমরা একবার জননীর চিত্তপ্রমোদিনী মূর্তি দেখাইলে, তখন সে মুখ সন্দর্শনে, সে নামে আমরা সকলে মাতিয়া গেলাম, সহর্ষে স্বার্থত্যাগ করিয়া জাতীয় কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম, সহাস্যমুখে দলে দলে জেলে যাইতে লাগিলাম। ইহাতেও নেতাদের জ্ঞান হইবে না কি? ইহাতেও তাঁহারা বুঝিবেন না কি কোন্ দিকে ভারতের নবজীবনের বালসূর্য গগনমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিয়া উদয় হইতেছে?

সোনার শিকল কাট

স্বর্ণনির্মিত শৃঙ্খলের মোহ কাটিতে হইবে। ইংরাজের অনুকরণ ও ইংরাজের নেতৃত্ব বর্জন করিয়া আমাদের জাতীয় স্বভাব ও দেশের অবস্থা বুঝিয়া অভীষ্টসিদ্ধির উপযুক্ত উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে। আর নবোত্থিত ভারতবর্ষকে মহৎ আদর্শ দেখাইয়া নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। এই পথই মুক্তির পথ, অন্যথা বন্ধনই সার।

উন্নতি ও স্বাধীনতা*

আমাদের দেশে একদল লোক আছেন, যাঁহারা বলেন যে দেশ সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথে অনেক দূর অগ্রসর না হইলে স্বাধীন হইবার উপযোগিতা লাভ করে না। ইহাদের মতে সর্বাঙ্গীন উন্নতির পশ্চাতে স্বাধীনতা আপনি আসিয়া পড়ে। বৃক্ষরোপণ ও উহাতে জলসেচনাদি বিবিধ যত্ন করিবার

* ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩—'যুগান্তর'

পর বৃক্ষজাত ফল পরিপক্ক হইয়া যেমন আপনি সহজেই পড়িয়া যায়, তেমনি চক্ষু বুজিয়া দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি করিয়া গেলেই সুপক্ক ফলটির মত একদিন স্বাধীনতা তোমার করতলগত হইবে।

যে দেশ দাসত্বপঙ্কে নিমগ্ন, এইরূপ ভ্রমাত্মক ধারণার প্রচলন সেই দুর্ভাগ্য দেশেই সম্ভব, অন্যত্র নহে। ভারত আজ হতবুদ্ধি ; শাপগ্রস্ত হইলে যেমন বুদ্ধিনাশ হয়, সেইরূপ মতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল বলিয়াই ত্রিশকোটীর জন্মভূমি ভারতবর্ষ সকল প্রকার উন্নতির একমাত্র ভিত্তি অমূল্য স্বাধীনতার গৌরব ভুলিয়া শত্রুসমক্ষে বিচ্ছিন্ন ও উদসীনভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। আজও ভারতবাসী স্বাধীনতার মূল্য বুঝে নাই। আজও পরাধীনতাকে আশু উন্নতির উপায় বলিয়া আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে ! জাপান যে দিন পরাধীনতার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সর্বপ্রকারে শক্তিসঞ্চয় করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল, সেদিন ভারতবাসীর ন্যায় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাহার যোগায় নাই !! বিদেশে শিক্ষার্থীপ্রেরণ ও জাপানে শিল্পবিজ্ঞান প্রচারকেই জাপানের উন্নতির একমাত্র মূল কারণ রূপে যাঁহারা নির্দেশ করিতেছেন, জগতের সমক্ষে সেই ক্রীতদাস ভারতবাসিগণ কি উচ্চ বিচারশক্তিরই পরিচয় দিতেছেন !!

কোন অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের স্বপ্ন বলিয়া স্বাধীনতাকে যাঁহারা হৃদয়ে স্থান দেন নাই, যাঁহারা শক্তির পরিচয়কে আসুরিক বল প্রকাশ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাঁহারা মনোনিবেশপূর্বক একবার জাপানের ইতিহাস পাঠ করুন। কি নিগূঢ় রহস্যদ্বার উদ্ঘাটিত হইল বলিয়া জাপান নবযুগালোকে প্লাবিত হইয়া গেল ? কি সূক্ষ্ম রন্ধ্র অবলম্বন করিয়া স্বর্গীয় উদ্দীপনা জাপানীর হৃদয় স্পর্শ করিয়া তাহাকে দেশহিতকর্মে উন্মত্ত করিয়া তুলিল ? ভাবিয়া দেখ এই উদ্দীপনার উৎস কি ;—এক কথায় ইহা **স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য অদম্য ব্যাকুলতা**। বিস্তৃত সাগরবেষ্টিত জাপানে বসিয়াই জাপানী যে দিন পাশ্চাত্য শক্তির পরিচয় পাইল, যে দিন মুহূর্তের মধ্যে সেই শক্তির সর্বগ্রাসী মুখব্যাদান জাপানীর সম্মুখে প্রকাশিত হইল, সেই দিন হইতে সমগ্র জাপান পরাধীনতার বিকট ছায়ার সম্মুখে সচকিত ও সতর্কভাবে অবস্থান করিতে লাগিল, সেইদিন হইতে কিরূপে অমূল্য স্বাধীনতা রক্ষা করিবে ইহাই জাপানীর একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া

দাঁড়াইল। এই তীব্র ব্যাকুলতার বশবর্তী হইয়া জাপানী আত্মশক্তিকে উদ্বোধিত ও কেন্দ্রীভূত করিতে লাগিল, এবং সেই কার্যে সকল বাধাবিপত্তি উল্লঘন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এই তীব্র ব্যাকুলতা বিবিধ পরিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্য দিয়া জাপানীকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে।

স্বাধীনতা হারাইবার ভয়ে আকুল হইয়াছিল বলিয়াই জাপান উন্নতি-সোপানে উঠিতে পারিয়াছে, এবং স্বাধীনতা হারাইয়াও ভারতবাসী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছে বলিয়াই ক্রমশঃ পশুত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। যে অসভ্য বর্বর জাতি স্বাধীনতা গৌরবে স্ফীত, জগতে তাহারও উন্নতি অনিবার্য, কিন্তু যে সুসভ্য সুশিক্ষিত জাতি পরাধীনতায় নিষ্পেষিত, তাহার উন্নতির আশা সর্বদাই সুদূরপরাহত। যে পরাধীন সে অবনত—অবনতিই তাহার ধর্ম; উন্নতির কথা বলিবার তাহার কোনও অধিকার আপাততঃ নাই। যে স্বাধীন সে সহজেই উন্নত, উন্নতি তাহারই ধর্ম।

দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে হইলে সমবেত শক্তির পরিচালনা করা আবশ্যক। এইরূপ শক্তি পরিচালনার দুইটী ভিত্তিস্তম্ভ আছে—১ম, একটী শক্তিকেন্দ্র,—দেশের বিচ্ছিন্ন শক্তিসমূহ যাহার আয়ত্তাধীন এবং যাহা দ্বারা নিয়মিত ও সম্বদ্ধ হইয়া উদ্দেশ্যাভিমুখে প্রেরিত হইতেছে; ২য়, দেশের সাধনক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিভবকারিণী দ্বিতীয় মহাশক্তির অভাব। প্রথম ভিত্তিস্তম্ভটি পাশ্চাত্য দেশে স্টেট্ (the State) বলিয়া পরিচিত, ইহাকে রাজ-শক্তি বলা যাইতে পারে। ইহারই সাক্ষাৎ আনুকূল্য ও কর্তৃত্বাধীনে পাশ্চাত্য দেশসমূহে সর্ববিষয়ে উন্নতি সাধিত হইতেছে; এই সকল দেশের মত ব্যবস্থাটী না হইলে এই সকল দেশের মত উন্নতিলাভ অসম্ভব। আমাদের দেশে আমাদের উন্নতি সাধনের জন্য এইরূপ কোন একটা ব্যবস্থা নাই, বরঞ্চ আমাদের দেশে বিলাতের অর্থোন্নতির জন্য বিপুল ব্যবস্থা আছে। এ দেশের উন্নতিবিধায়িনী শক্তিসমূহ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হইয়া লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যান্তরে বিভ্রান্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে, অথবা বিদেশীর দ্বারা নিয়মিত ও আয়ত্তীকৃত হইয়া দাসত্বে নিয়োজিত হইতেছে। উপযুক্ত শক্তিকেন্দ্রের অভাবে কোন উন্নতির আদর্শকেই আমরা সাধারণের কর্মক্ষেত্রে বা জীবন সংগ্রামের মধ্যে আকৃষ্ট করিয়া আনিতে পারিতেছি না। কোন আদর্শই প্রকৃতভাবে কল্পনা ও বিচারের সীমা অতিক্রম করিতে পারিতেছে

না। জানেন ও ভাবেনও অনেকেই, করে বা করায় কে? আবার যাহারা একটা কিছু করিতে গেল, তাহারাই একটা বিশেষ দল বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল, এবং যে সকল বিরোধ অন্য দেশে শক্তিকেন্দ্রের সামঞ্জস্যের আলোকে সহজেই মিটিয়া যায়, সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ তুমুল গৃহবিবাদে পরিণত হইয়া গেল। শক্তিকেন্দ্রের অভাবে যে দেশের চিন্তা ও সাধনা এইরূপ বিশৃঙ্খল, সে দেশ উন্নতি পথে কতদূর আর অগ্রসর হইবে?

দ্বিতীয়তঃ আমাদের সাধনক্ষেত্রে এমন এক শক্তি সর্বত্র বিরাজ করিতেছে যে, উহা বৈরীভাব ধারণ করিলে উহার সর্বগ্রাসী প্রভাবের সম্মুখে আমাদের কোনও উন্নতি চেষ্টা টিকিতে পারে না; এবং এই বৈদেশিক শক্তি যখন বিরোধী স্বার্থের দ্বারাই সর্বদা প্রযুক্ত হইতেছে, তখন ইহার আনুকূল্য বা ঔদাসীন্যের উপর নির্ভর করা আমাদের পক্ষে মূর্খতা। দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে হইলেই যখন সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন এবং সমবেত চেষ্টা ও শক্তির সম্যক পরিচালনার জন্য যে দুইটী অবলম্বন আবশ্যক তাহাই যখন আমাদের নাই, তখন আমাদের বর্তমান পরাধীন অবস্থায় সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। প্রথমতঃ দেশে সমবেত চেষ্টার ভিত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিতে হইবে। দেশের সমগ্র শক্তিকে প্রথমতঃ একটী জাতীয় শক্তিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত করিতে হইবে, এবং সাধনক্ষেত্রে যাহাতে বিঘ্নস্থানীয় দ্বিতীয় শক্তির অস্তিত্ব না থাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; এইরূপে যেদিন ভারতবাসী জগতের সমক্ষে উন্মুক্তভাবে মনুষ্যপদ-বাচ্য হইয়া দণ্ডায়মান হইবে, সেই দিন হইতে স্বদেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতিরূপ মনুষ্যসাধ্য মহৎ-সাধনায় নিমগ্ন হইয়া জগতে এক অতুল কীর্তি স্থাপন করিবে। জগতে অপরাপর দেশে মানুষ যাহা করে ও করিতেছে, আমরা গোলাম হইয়াই তাহা করিতে ছুটিতেছি; অবশ্য আমাদিগকেও ঐ সব মহৎ কার্য করিতে হইবে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও এই পরাধীন অবস্থায় নহে। হে ভারতবাসি, আর জোর করিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিও না; কর্তব্যপথ দুর্গম হইলেও উহাতেই অগ্রসর হইতে হইবে; কল্পিত পথ সুগম হইলেও তোমার শক্তিক্ষয় করিয়া তোমাকে আরও দুর্দশাগ্রস্ত করিতেছে, অতএব আজ হইতে দৃঢ়চিত্ত হইয়া ঐ সকল পথকে সর্পবৎ বর্জন কর। জীবতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখ, জীবন বা প্রাণ সর্বত্রই স্বাধীন;

স্বাধীনভাবে বায়ু, আলোক ও মৃত্তিকা হইতে আবশ্যকীয় উপকরণ সকল আহরণ করিয়াই বৃক্ষ সজীব থাকে ; স্বাধীনভাবে দেহরক্ষার উপযোগী খাদ্য-সকল পরিপাক করিয়াই কীটপতঙ্গাদির ক্ষুদ্র শরীর সজীব থাকে। যেখানেই একটী চৈতন্যস্ফুলিঙ্গ লইয়া একটী জীবের ব্যক্তিত্ব লীলা করিতেছে, সেইখানেই দেখিবে স্বাধীনতাই সেই চৈতন্যকণার আশ্রয়ভূমি হইয়া তাহাকে উন্নতির সোপান হইতে সোপানান্তরে লইয়া যাইতেছে। তোমার সাধ্য কি তুমি এই স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়া উন্নতির পথে ধাবিত হইবে। অগ্রে স্বদেশ বা দেশের স্বাধীনতা, দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি তাহার পর— এই সত্য সর্বদা স্মরণ রাখিয়া কর্তব্য পথে অগ্রসর হও। পরাধীন অবস্থায় যতদূর উন্নতি সম্ভব ও পরাধীন দেশে যতদূর প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার হওয়া সম্ভব, ভারতে তাহা হইয়াছে। গোলাম ইহা অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইতে পারে না, কখনও পারে নাই। এখন দেশে উন্নতিমূলক সকল সাধনাই বীর্যহীন হইয়া আসিতেছে ; পরাধীনতাই ইহার একমাত্র কারণ। পরাধীনতা যন্ত্রে মহত্তর মনুষ্যত্ব প্রস্তুত হয় না। যদি মহত্তর মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিতে চাও, দেশে উপযোগী কর্মস্রোত আন। উপযুক্ত কর্মের নিষ্পেষণেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব গঠিত হয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষা, বক্তৃতা, আলোচনা অথবা ভাবের অনুশীলনমাত্রে মনুষ্যত্ব গঠিত হয় না। কর্মক্ষেত্র পূর্বে প্রস্তুত না থাকিলে প্রতিভাশালী ব্যক্তির দর্শনলাভ হয় না। অতএব 'আমাদের দেশে লোক কই' এই দুর্বল অবিশ্বাস দূর করিতে হইবে এবং সকলে মিলিয়া কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে।

"দেশে লোক কই"*

আমাদের দেশে অনেকের একটী ধারণা আছে যে, স্বাধীন দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে যেরূপ শক্তিশালী ও মনীষী ব্যক্তির সর্বদাই প্রাদুর্ভাব হয়, সেইরূপ ব্যক্তি আমাদের দেশে যতদিন না জন্মগ্রহণ করেন, ততদিন আমরা স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য উপযুক্ত হইব না। তাঁহারা বলেন যে, আজই যদি আমরা স্বাধীন হই, তবে স্বাধীন দেশের বিবিধ শাসনযন্ত্র পরিচালন করিবার লোক কোথায় পাইব ?—এমন প্রতিভাশালী ব্যক্তি কি সকল প্রদেশে পাওয়া যাইবে, যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের একতা সংরক্ষণ করিয়া দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে নানা সমস্যার সুচারুরূপে মীমাংসা করিবেন ?—আমাদের মধ্যে যুদ্ধনীতিজ্ঞ ব্যক্তিই বা কোথায় ? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রকৃত স্বাধীনতা বস্তু কি তাহা একটু বিচার করিয়া দেখা উচিত। আমাদের দেশে অনেকেরই একপ্রকার অদ্ভুত স্বাধীনতার জন্য একটা বিষম ব্যাকুলতা দেখা যায় ; তাহাদের পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, পরে আসিয়া স্বাধীনতা-অন্ন তাহাদিগকে পরিবেষণ করিয়া না দিলে যেন তাহাদের কোন মতেই রুচিবে না। প্রকৃত স্বাধীনতা পরপ্রদত্ত হইতে পারে না ; কারণ স্বাধীনতার সহজ অর্থ 'নিজের অধীনতা', কিন্তু পূর্বে 'নিজ' বস্তুটির প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠা না হইয়া গেলে 'স্ব স্ব অধীনতা' কিরূপে আসিবে ? যদি পরেই বাঞ্ছিত বস্তু আনিয়া দিল, তবে আত্মশক্তির কার্য হইল কোথায় ? অতএব স্বাধীনতা বলিলেই বুঝিতে হইবে, আত্মশক্তির উদ্বোধনে ও প্রয়োগে লব্ধ স্বাধীনতা !

যদি স্বাধীনতা পরপ্রদত্ত হয়, তবে ইহা ভাবিবার কথা বটে যে, আমরা সেই স্বাধীনতা সংরক্ষণ করিবার জন্য দেশে উপযুক্ত লোক পাইব কোথায়। আমরা পরাধীনতার যে গভীর পঙ্কে মগ্ন হইয়া আছি, এই পঙ্ক হইতে উদ্ধার

* ১৩ই জ্যৈষ্ঠ—১৩১৩ সাল, 'যুগান্তর'

করিয়া অপর কেহ যদি মনুষ্য সমাজে আমাদিগকে উত্তোলন করিয়া দেয়, তবে আমরা অল্পক্ষণও সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে পারিব না, ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু হে বাঙ্গালি, একবার আত্মশক্তিদ্বারা লব্ধ স্বাধীনতার বিষয় কল্পনা করিয়া দেখ। যে স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে, সে নিশ্চয়ই উহাকে সংরক্ষণও করিতে পারে। যে দেশ আত্মশক্তির দ্বারা লাভ করা হয়, সে দেশের কর্মক্ষেত্রে কখনও লোকাভাব হয় না। বর্তমান অবস্থা ও স্বাধীন অবস্থার মধ্যে যে ঘটনা বৈচিত্র্যময় ব্যবধান, তাহার ধারণা আমাদের নাই, সেইজন্যই মনে করি যে আমরা স্বাধীন হইলে দেশে লোক পাইব কোথায়, এবং একতাই বা হইবে কিরূপে? আয়র্লণ্ড যে আপনাকে আত্মশক্তি দ্বারা শাসিত দেখিতে চায়, জন মরলি বা গ্ল্যাডস্টোন বা লর্ড রবার্টসের মত লোক নিজ দেশে দেখিতে পাইতেছে না বলিয়াই কি সে নিরাশ হইয়া বসিয়া থাকিবে? সে জানে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামই উপযুক্ত মানুষ প্রস্তুত করিবার সুন্দর কারখানা। আর প্রথম অবস্থায় আত্মশাসন যদি সর্বাঙ্গসুন্দর নাই হয়, তবে দোষ কি? সর্বাঙ্গসুন্দর শান্তিপ্রদ পরকীয় শাসনতন্ত্র অপেক্ষা কদর্য আত্মশাসনতন্ত্র সহস্র গুণে লোভনীয় একথা কি বাঙ্গালী আজও স্বীকার করিবে না।

যাহারা দেশে সর্বত্র উপযুক্ত লোকের আবির্ভাব না দেখিলে হৃদয়ে স্বাধীনতার আশা পোষণ করিতে বিমুখ, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, মনুষ্যত্বের চরমোন্নতিই যদি মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য হয় এবং পরাধীন অবস্থাই যদি দেশে সমুন্নত মনুষ্যের আবির্ভাব হইয়া মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে থাকে, তবে স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হইবার ত প্রয়োজনই কখনও হইবে না। পরাধীন জাতির মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের আশা প্রকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় দেবতারও দুষ্পূরণীয়।

যে রোগী ঔষধ খাইতে নিতান্ত নারাজ তাহার আচরণের সহিত আমাদের আচরণ অনেকটা মিলে। যখন সেই রোগীর কাছে তিক্ত ঔষধের শিশিটী আনা হয়, তখনও সে যেন শিশিটীকে দেখেও দেখে না, কিন্তু ঔষধ খাইবার পর যে সমস্ত মুখরোচক দ্রব্যাদি মুখে দিতে হইবে সেইগুলি লইয়া কত সযত্নে নাড়া চাড়া করে, সাজিয়ে রাখে। দেশে প্রকৃত মানুষের বা মনুষ্যত্বের অভাব যে তিক্ত ঔষধ সেবনে দূরীভূত হইবে, তাহার প্রতি

আমাদের লক্ষ্য নাই (—বাপ্‌রে রক্তদান!—) কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্যত্ব-বিকাশের সরঞ্জামগুলিকে কত যত্নের সহিত আমরা গুছাইতে চেষ্টা করিতেছি—আজ বিদেশে শিল্পবিজ্ঞান শিখাইতে দলে দলে ছাত্র প্রেরণ করিতেছি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার আয়োজন করিতেছি, দেশের শিল্পবাণিজ্য স্বহস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছি ইত্যাদি। অবশ্য এই সকল সরঞ্জাম পূর্ব হইতেই গুছাইয়া রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু ঔষধের শিশিটী ভুলিলে চলিবে না, প্রকৃত ঔষধ সেবন না করিলে সমস্ত আয়োজন সরঞ্জাম নিষ্ফল হইয়া যাইবে, ব্যাধির প্রতিকার হইবে না, দেশে উপযুক্ত মনুষ্যের অভাব কিছুতেই পূরণ হইবে না।

স্বদেশের চারিদিকে চাহিয়া দেখ, সর্বত্রই পরাধীনতার যন্ত্র ঘুরিতেছে—চিন্তায়, কার্যে, শিক্ষায়, জীবিকা নির্বাহে, মন্ত্রণায়, উপদেশে, আশায়, নিরাশায়। এই সর্বব্যাপী যন্ত্র হইতে উন্নততর মনুষ্যত্বের প্রত্যাশা করা কি বিড়ম্বনা! এ দেশে এই যন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই সাধারণ ক্ষেত্রে একমাত্র সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বব্যঞ্জক কার্য! এদেশে যদি কোথায়ও মনুষ্যত্ব সংগঠন করিবার উপায় বিদ্যমান থাকে তবে সে এই বিরোধাত্মক সাধনায়। এদেশে যদি উপযুক্ত দেশহিতকারী ব্যক্তির আবির্ভাব হইবার বিধাতৃনির্দিষ্ট কোনও পথ থাকে, তবে সে এই পরাধীনতা যন্ত্রের ধ্বংসচেষ্টাতেই নিহিত আছে। নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

যাহা সত্য তাহার সেবাতেই শক্তি পাওয়া যায়, তাহার অনুশীলনেই মনুষ্যত্ব ফুটে। আমাদের দেশের বর্তমান সাধনক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সত্যের সেবা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে কি? আমাদের সকল সাধনার মূলে একটী বিষম মিথ্যা, একটী উজ্জ্বল ভ্রান্তি বিরাজ করিতেছে। জ্যামিতির সকল প্রতিজ্ঞার মূলে যেমন কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধের ভিত্তি বিদ্যমান, তেমনি আমাদের আধুনিক সকল সাধনার মূলে পরাধীনতাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু যেমন বৈদান্তিকের মতে অহংভ্রান্তি সকল সংস্কার ও জ্ঞানের মূলে থাকিয়া আমাদের বুদ্ধিকেও মায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তেমনি এই বিষময় পরাধীনতাকে স্বতঃসিদ্ধরূপে আমাদের সকল চেষ্টার মূলে রাখিয়া আমাদের সমাজকে ও সকল সাধনাকে আমরা দূষিত করিয়া ফেলিয়াছি, তাই এই সকল সাধনক্ষেত্র হইতে প্রকৃত শক্তি বা মনুষ্যত্বের

বিকাশ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু আজ এই সাধনক্ষেত্র হইতে মিথ্যাকে বহিষ্কৃত করিয়া দাও এবং তাহার আসনে স্বাধীনতালিপ্সাকে উপবিষ্ট করাও, আজ এই বিষতুল্য পরাধীনতা-স্বীকারকে অমান্য করিয়া, বর্জন করিয়া, তীব্র স্বাধীনতালিপ্সার উপর সমাজের সকল শক্তিকে, সকল অনুষ্ঠানকে, সকল সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত কর, দেখিবে সত্যের অপূর্ব মহিমায় মনুষ্যত্ব বিকশিত হইবেই হইবে, সদনুষ্ঠানের আহ্বানে শত শত কর্মবীর জীবন উৎসর্গ করিতে আসিবে। মিথ্যাদ্বারা সাধনপথকে সুগম করিলেই সাধক মিলে না—মিলে ত বেশী দিন টিকে না, কিন্তু সত্যের দ্বারা সে পথ অত্যন্ত দুর্গম হইলেও মানবহৃদয় বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় পুঞ্জীকৃতভাবে অনিবার্যরূপে সেই পথেই আকৃষ্ট হয়, কারণ মানুষের জন্য প্রকৃত মনুষ্যত্বের আস্বাদন এই পথে।

কৃষক যেমন জমিতে লাঙ্গল দিয়া, মাটী পরিষ্কার করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া, বীজ বপন করিয়া এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হয় যে, তাহার যাহা করিবার সে করিয়াছে, বাকিটুকু ভগবানের প্রসাদ; সেইরূপ দেশের সর্বত্র স্বাধীনতালিপ্সা ও আত্মবিশ্বাসকে উদ্দীপিত করিয়া, সর্বজন-চিত্তকে স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদান দিতে উৎসাহিত করিয়া, সর্বত্র সুমহৎ সঙ্কল্পের বীজ বপন করিয়া আমরা এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি যে, আমাদের যাহা কর্তব্য তাহা করিতেছি, এখন উপযুক্ত লোক প্রেরণ করা ভগবানের হাত, তাঁহারই প্রসাদ ও দান। আমাদের যাহা কর্তব্য তাহাতে বিমুখ বা অলস হইয়া যদি কেবলমাত্র উপযুক্ত লোকাভাবের প্রতিযোগশব্দে রসনাপূর্ণ করিয়া দেশে বিচরণ করি, তবে আমরা ভগবানের নিকট অপরাধী, জন্মভূমির নিকট অপরাধী। আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, যে-ক্ষেত্রে প্রকৃত কর্মবীর মনুষ্য সকল উৎপন্ন হইবে সেই ক্ষেত্র মিথ্যা ও ভ্রান্তির আগাছায় আমরা কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছি। আমরা পরাধীনতাকে কেন্দ্র বা মধ্যবিন্দু করিয়া যখনই জাতীয় জীবন-গোলকটী নির্মাণ করিতে যাইব, তখনই আমাদের উন্নতির পথ চিরকালের জন্য অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিব।

আজ বুঝিবার দিন আসিয়াছে। বিধাতার আদেশ যে ভারতবাসী সত্যকে ভুলিয়া, সত্যকে সভয়ে সাধনক্ষেত্র হইতে সরাইয়া রাখিয়া, মিথ্যার

কুহকে মজিয়া আর দিন কাটাইতে পারিবে না। সত্যকে নির্ভয়ে আশ্রয় কর, দেখিবে ভগবচ্ছক্তি সমাজের মধ্যে অবতীর্ণ হইবে, মুহূর্তের মধ্যে লোকাভাব ঘুচিয়া যাইবে, বীরপ্রসবিনী ভারত-জননী জগতের কল্যাণদাত্রী রাজরাজেশ্বরীবেশে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হইবে।

"দেশে একতা কই!"*

আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা কতকগুলি ভুল ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। এই ভুল ধারণাগুলি না ঘুচিলে, দেশে প্রকৃত উদ্যম ও উদ্যোগ কখনই জাগিবে না। গত দুই সপ্তাহে দুইটী ভুল ধারণার বিষয় 'যুগান্তরে' লেখা হইয়াছে; সেই দুইটী প্রবন্ধে দুইটী সত্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, যথা :—

১। পরাধীন অবস্থায় দেশের স্থায়ী উন্নতি অর্থাৎ প্রকৃত উন্নতি সাধিত হওয়া অসম্ভব।

২। যে দেশ পরাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লয়, তাহার প্রত্যেক মহদনুষ্ঠানেই উপযুক্ত লোকের অভাব হয়, সে দেশে পরাধীনতা-ধ্বংস-চেষ্টাই একমাত্র বিশুদ্ধ মনুষ্যত্ব-পরিপোষক সাধনক্ষেত্র। দেশের সর্বত্র এইরূপ একটী সাধনক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে, এবং দৃঢ়তা, আর্জব ও ঐকান্তিকতার সহিত এই সুমহৎ সাধনা সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইলেই উপযুক্ত লোকের অভাব ঘুচিয়া যায়। কর্মক্ষেত্র রচনা করিবার পূর্বে এ অভাব ঘুচে না।

যেমন পূর্ব প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে কর্মক্ষেত্র রচিত হইলেই কর্মীর আবির্ভাব হয়, সেইরূপ এবার সংক্ষেপে বুঝাইতে হইবে যে একতাবস্তু কর্মমূলক, কাজের আগেই সম্পূর্ণ একতার বিকাশ হয় না; এবং প্রকৃত বা সত্য কর্মকে আশ্রয় না করিলে সম্পূর্ণ একতার বিকাশ হয় না।

যে দেশে রাষ্ট্রীয় সাধনাই নিতান্ত বিরল, যে দেশে ইতর-ভদ্র, জ্ঞানী-

* 'যুগান্তর'—২০এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩ সাল।

মূর্খকে একত্রে উদ্যোগী ও নিয়োজিত করিবার জন্য কোনও সাধারণ কর্মক্ষেত্র নাই, সে দেশে একথা বলাই যায় না যে 'দেশে একতা নাই'; এই নিরর্থক ক্ষোভ ও অন্ধের চশমার অভাবজনিত ক্ষোভ একই বস্তু। একতার আশ্রয় সাধনা! যেখানে এক করিবার সাধনা নাই, সেখানে একতার কথাই আসিতে পারে না।

পথে ঘাটে একজন বাঙ্গালীকে বিদেশীর হস্তে লাঞ্ছিত হইতে দেখিলেও আর পাঁচজন বাঙ্গালী সেই বিদেশীকে দণ্ড দিবার জন্য ছুটিয়া আসে না—এই এক প্রকারের একতার অভাব লইয়া অনেক অভিযোগ শোনা যায়। স্বজাতি বা স্বদেশীয়কে বিদেশীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার প্রবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মূলে কয়েকটী ভাব পাওয়া যায়; যথা, স্বজাতিত্ব-বোধ, বিজাতি বা বিদেশী-বিরাগ, অন্যায়ে অসহিষ্ণুতা। এই সকল ভাবের মধ্যে স্বজাতিত্ব-বোধ বাঙ্গালীর হৃদয়ে সর্বদাই উজ্জ্বলভাবে জাগরূক থাকে। ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে কাপুরুষতা স্বজাতিত্ব-বোধের অভাব হইতে উৎপন্ন নহে। উক্ত উদাহরণে স্ব-জাতিত্ব-বোধ ও একতা একই বস্তু, অতএব একতার অভাব হইতে ঐ কাপুরুষতার উদ্ভব নহে। যেদিন বাঙ্গালীর হৃদয়ে পরদেশাপহারক বিদেশীর প্রতি তীব্র বিরাগ ও অন্যায় আচরণ-দৃষ্টে ঋষিতুল্য ক্রোধের উন্মেষ হইবে, সে দিন এই কলঙ্ক নিয়মের মধ্যে ঘুচিয়া যাইবে। একতার জন্য ভাবিতে হইবে না।

কেহ কেহ বলেন যে এক একটী বাঙ্গালী এক একটী মুনি, আর জানাই ত আছে—"নানা মুনির নানা মত"। একতা আর মতানৈক্য দুইটী পৃথক বস্তু। কর্মশীলতার অভাবে মতভেদই একতার অভাব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যাহারা উদ্যমহীন তাহাদের দ্বিতীয় সম্মিলনক্ষেত্র নাই। যাহারা কর্মী, মতভেদ সত্ত্বেও তাহাদের একতা থাকিতে পারে; মূল বিষয়ের বা লক্ষ্যের অনুকূল হইলেই তাহারা কর্মকে আশ্রয় করে, কারণ কর্মকে আশ্রয় না করিয়া শুধু মত লইয়া অবস্থান করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। বাঙ্গালী উদ্যমবিমুখ, শুধু মতপোষণ করিতে করিতে দিনযাপন করা তাহার পক্ষে সম্ভব, তাই সামান্য মতভেদ ও দলাদলিকে প্রশ্রয় দিয়া এক একটী সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। যে দেশে মতামতই সর্বস্ব, সে দেশে মতভেদই একতার অভাব। যে দেশ কর্মশীল, সে দেশের মতভেদ মূললক্ষ্যানুকূল কর্মের প্রভাবে মাথা তুলিতে

পারে না। বঙ্গদেশে মতভেদজনিত একতার অভাব যথেষ্ট আছে। এইরূপ একতার অভাব সাংঘাতিক নহে। বাঙ্গালীর মতামত যতই এক লক্ষ্যের, এক মূল উদ্দেশ্যের দিকে আকৃষ্ট হইবে, ততই একতা আসিবে। একতা বাঙ্গালীর মধ্যে যে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতে পারে তাহা সম্প্রতি বিধাতার ইঙ্গিতে প্রমাণিত হইয়াছে, এবং বাঙ্গালীর মতামত বিধাতাপ্রেরিত ঘটনাবলীর সাহায্যে ক্রমশঃই এক সার্বজনীন সাধনার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, বর্তমানে যে একতার অভাব পরিলক্ষিত হয় তাহা মূলতঃ মতভেদ। যাহা প্রকৃতই সার্বজনীন লক্ষ্য তাহার অভ্যুদয়ে মতভেদ বিলীন হইয়া যাইবে ও প্রকৃত একতার প্রতিষ্ঠা হইবে। এই প্রসঙ্গে একটী বিষয়ের উল্লেখ অনিবার্য। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম বন্যায় বাঙ্গালাদেশে এক আশ্চর্য একতা দেখা দিয়াছে; যখনই দাসত্বকার্য-মুক্তিরূপ এক সার্বজনীন আদর্শের আলোকে স্বদেশী আন্দোলন উদ্ভাসিত হইয়াছে, তখনই এক অগাধ অথচ প্রচ্ছন্ন উৎসাহ-প্লাবনের তরঙ্গে তরঙ্গে একতার উজ্জ্বল ছবি সুব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন ভদ্র, ইতর, বিদ্বান, মূর্খ, সকলেরই হৃদয়ে কি এক নিগূঢ় তত্ত্ব আত্মবিস্মৃতিকর ঝঙ্কারশব্দে আপনি বাজিয়া উঠিয়াছে। ভগবানের এই গভীর ইঙ্গিত কি বৃথা হইবে !!!

আমাদের দেশে একতা নাই বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। আমাদের দেশে একতা বিকাশ হয় নাই একথা বরং বলা যাইতে পারে। একতা পরিস্ফুট হইবারই সুযোগ হইয়াছে কই ? রাজার উপর রাজভক্তের তীক্ষ্ণ অভিমান প্রকাশ করাইবার জন্য দেশের সর্বত্র স্বদেশী আন্দোলনের প্রচার করা হইয়াছে। এই অভিমান লইয়া একটা অর্ধসুপ্ত দেশ কর্মোন্মত্ত হইয়া উঠিতে পারে না। বিদেশী-বর্জনের ভাবগাম্ভীর্য যখন স্বদেশ-হিতের প্রতি ঔদাসীন্যকে এতদূর পরাভূত করিতে পারিয়াছে, তখন আত্মবলিদানের ভাব সেই ঔদাসীন্যকে সম্পূর্ণই পরাজিত করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি ?

ভারতবর্ষের মত পরাধীন, অর্ধনিদ্রিত দেশে একতার বিকাশ করিতে হইলে প্রথমতঃ যে কর্ম সুপ্ত মানুষকে জাগাইয়া এক করে সেই কর্মের মধ্যে ভারতবাসীকে নিক্ষিপ্ত করিতে হইবে। অতএব সুপ্ত মানুষকে জাগ্রত করিতে হইলে কিরূপ কর্মের তাড়না আবশ্যক তাহা বুঝিতে হইবে। ম্যাটসিনি একবার বলিয়াছিলেন:—"When peoples who have slumber-

ed for ages arise in revolution, their latent energies burst forth in volcanic power, if excited and harassed by dangers to all appearance immortal, but sink again into the former lethargy if they find themselves let alone, and apparently secure."

অর্থাৎ যে সকল জাতি কতযুগ নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল, তাহারা যখন কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের উত্তেজনায় উত্থিত হয়, তখন দেখা যায় যে যদি মৃত্যুসঙ্কুল বিপদের দ্বারা তাহারা উপর্যুপরি সন্ত্রস্ত ও নিপীড়িত হয়, তবে তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি সকল আগ্নেয়গিরিনিক্ষিপ্ত জলন্ত প্রস্তরাদির মত বজ্রবেগে ও অদম্য প্রভাবে উৎসারিত হয়, কিন্তু যখনই তাহারা বিপন্মুক্ত ও শত্রুপরিত্যক্ত আপাতনিরাপদ অবস্থায় আপনাদিগকে উপনীত দেখে, তখনই আবার চিরাভ্যস্ত নিদ্রাঘোরে তাহারা নিমজ্জিত হইতে থাকে। মহাপুরুষমুখনিসৃত এই অমূল্যবাণী আমাদের দেশের পক্ষে অক্ষরে অক্ষরে খাটে। পরাধীন দেশে নিদ্রার নেশা কাটাইতে হইলে এমন কর্মের বন্যা সেই দেশে আনিয়া ফেলিতে হয় যে, দেশের লোকের হৃদয়ে সর্বদাই পূর্ণ উদ্বেগ, দৃঢ়সঙ্কল্পমূলক অদম্য উৎসাহ, আশা-নিরাশার সীমাতীত নির্ভীক উদ্যম উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করিবে। যে-কর্মকে অবলম্বন করিলে উদ্যোগের তাড়নায় স্বার্থশিকল আপনি খসিয়া পড়িয়া যায়, যে-কর্মকে আশ্রয় করিলে সর্বদাই তীব্র উদ্বেগের শাসনে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও জাগ্রত হইয়া থাকে, যে-কর্মকে আশ্রয় করিলে মৃত্যুসান্নিধ্য দুর্বল আশা-নিরাশার গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া অপূর্ব নির্ভীকতার আলোকে হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া ফেলে, যে-কর্মকে আশ্রয় করিলে উৎসাহ-নেহাইয়ের উপর স্বার্থ-বিসর্জনরূপ মুদ্গরাঘাত পড়িতে পড়িতে দেশে প্রকৃত মনুষ্যত্ব সর্বত্র সংগঠিত হইতে থাকে, দাসত্ব নিষ্পেষণে মৃত্যুগর্ভে নিমজ্জমান ভারতবর্ষের পক্ষে সেই সুমহৎ কর্ম কি—তাহা বুঝিতে কি কাহারও বাকি আছে? ভগীরথ যেমন ভূতলে গঙ্গাস্রোত আনয়ন করিয়া ষষ্ঠী সহস্র সগরপুত্রের মৃতদেহে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেইরূপ যেদিন দাসত্ব উচ্ছেদকারী কর্মস্রোত ভারতবর্ষে প্লাবিত হইবে, সেইদিন হইতে ভারতবাসীর গভীর-নিদ্রামগ্ন অসাড় দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইবে।

এই কর্মের আদর্শ কেমন সার্বজনীন! দরিদ্রের কুটীরে কুটীরে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, দেখিবে সকলেই জানে যে আমরা পরাধীন, সকলেই অন্তরে অন্তরে জানে যে পরাধীন দেশবাসীদের দুঃখমোচন করিতে হইলে স্বাধীনতা

লাভই একমাত্র উপায়। আমাদের দেশের ইতর লোক সহজেই বলে যে যার দেশ তার ইচ্ছামত আইনবিধি হইবে, আমাদের কথায় সে নিজের মন্দ করিবে কেন, তাতে আবার তারা বিদেশী ফিরিঙ্গি। দেশের ভদ্রলোকেরা যে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রাজনীতিক ভাব পোষণ করিতে শিখিয়াছেন, এবং বক্তৃতাস্থলে আইন বাঁচাইয়া হিসাব করিয়া যেমন অভিমানরাগাদি প্রকাশ করিতে পারেন, ইতর লোকেরা সেরূপ পারেও না, ভাল বুঝেও না। ভয়ের সহিত উচ্চশিক্ষা মিশিয়া যেরূপ লোক প্রস্তুত করিতে পারে, অশিক্ষিত সাহসী লোক তাহাপেক্ষা অনেক ভাল। যে কর্ম ভারতবর্ষকে নবজীবন দান করিবে, যেদিন শিক্ষিত ভারতবাসী সেই কর্মের আদর্শ গ্রহণ করিয়া সর্বত্র শক্তিসংগ্রহ করিতে অগ্রসর হইবে, সেদিন প্রস্তাব মাত্রেই অশিক্ষিত ভারতবাসী নিশ্চয়ই তাহাকে অনুসরণ করিবে। জলপূর্ণ তড়াগ হইতে পয়ঃপ্রণালী কর্তন করিতে গেলে জলরাশি যেমন সহজেই খনিত্রকে অনুসরণ করে, সেইরূপ সহজে স্বভাবসিদ্ধরূপে ভারতের অশিক্ষিত স্বাধীনতা-প্রয়াসী শিক্ষিতের পশ্চাদনুসরণ করিবে। যেখানে স্বার্থ নিঃসন্দেহরূপে, সম্পূর্ণরূপে, সুস্পষ্টভাবে এক, সেখানে একতা অনিবার্য। যাহারা একত্রে দুঃখ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া, একত্রে উচ্চ অথচ সুস্পষ্ট আদর্শের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া একত্রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হয়, তাহাদের একতা অনিবার্য। সাধারণ বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যাহারা একত্রে প্রাণ, সংসার, সর্বস্ব পণ করিয়া ধর্মযুদ্ধে আত্মবিসর্জন করিতে অগ্রসর হয়, তাহাদের একতা অনিবার্য ও চিরস্থায়ী। যাহাদের একতা-মুচলিকা হৃদয়রক্তের দ্বারা মোহরাঙ্কিত হইয়াছে, তাহাদের একতা কল্পান্তস্থায়ী। জীবন যাহাদের এক করিতে পারে নাই, মরণ তাহাদের চিরকালের জন্য এক করিয়া দেয়। যাহারা মৃত্যুর কাছে জীবনবীমা করে, তাহাদের জীবন একসূত্রে গ্রথিত হইয়া যায়।

যাহারা এক হয় নাই বলিয়াই বিপন্ন, তাহারা সেই বিপদকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অপর সহজসাধ্য কর্মের আশ্রয়ে একতা লাভ করিতে পারে না; তাহাদের একতার মূল্য আরো অধিক। দেশের দুঃখে প্রকৃতভাবে দুঃখী, দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত এরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা কুমীরের সহিত জলে বাস করিয়া কেবলই সামান্য সামান্য খোঁচা মারিয়া সেই কুমীরের

সহিত খুচরা ঝগড়া বাধাইয়া দিনযাপন করিতে রাজি নন। আমাদের দেশের আন্দোলনকারীদের সহিত এই সকল ব্যক্তির একতা নাই। অথচ এই উভয়পক্ষের মধ্যে একটী একতাসূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। এই রকম আরো বিভিন্নমতাবলম্বী লোক আমাদের দেশে রহিয়াছেন, যাঁহারা অকৃত্রিমভাবে সর্বাগ্রে স্বদেশের মঙ্গল প্রার্থনা করেন। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভরূপ একমাত্র প্রতিকারের প্রতি যখন এই সকল ভারতবাসীর দৃষ্টি সংবদ্ধ হইবে, তখন ইহাদের একতাবন্ধন অবশ্যম্ভাবী। সকলেই সর্বাগ্রে স্বদেশের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, এই উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষার উপর ভবিষ্যতে সুদৃঢ় একতার ভিত্তি স্থাপিত হইবে। বর্তমানে প্রকৃত প্রতিকার সম্বন্ধে মতভেদ থাকায় একতার বিকাশ হইতেছে না।

কিন্তু ইহাও সুনিশ্চিত যে যতদিন পর্যন্ত সকল প্রকার ব্যাধির একমাত্র অব্যর্থ প্রতিকার স্বাধীনতা-অর্জনের প্রতি ভারতবাসীর সুদৃঢ় বিশ্বাস ও অটল সঙ্কল্পজনিত সমবেত চেষ্টা প্রযুক্ত না হইতেছে, ততদিন ভারতবাসীর মধ্যে স্থায়ী ঐক্য কেবল কথার কথা থাকিয়া যাইবে। শিক্ষিত সাধরণের মনে এই বিশ্বাস যে, একতা না হইলে স্বাধীনতার বিষয় উল্লেখ করাই অসঙ্গত। কিন্তু তাহারা যদি ভাবিয়া দেখে যে, কোনও বস্তুগত ভিত্তির উপরই একতার অস্তিত্ব নির্ভর করে, শুধুমাত্র (in the abstract) বস্তুনিরপেক্ষ হইয়া একতা বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারে না—এবং সেই বাস্তবভিত্তি গভীর সাহস ও উদ্যমের প্ররোচক কোনও সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, নিরপেক্ষ, সার্বজনীন স্বার্থ ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না, তাহা হইলে তাহারা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে যে একতালাভের পূর্বেই স্বাধীনতা লাভের জন্য সর্বত্র এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া আবশ্যক। এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবার পর একতার বিকাশ হইতে আরম্ভ হইবে ; তখন বাঙ্গালী, মার্হাঠি, মান্দ্রাজী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, উৎকলী, ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, ভদ্র, ইতর সকল ভারতবাসীকেই এক সাধারণের স্বার্থপ্রসূত জলন্ত উৎসাহের দ্বারা উত্তেজিত করা সহজ হইবে। প্রথমেই ভারতের শিক্ষিত সমাজে সর্বত্র অটল স্বাধীনতালিপ্সার সঞ্চার, তারপর তদ্বস্তুলাভের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র একতার সূত্রপাত—তাহাই প্রকৃত উন্নতির পদ্ধতি, ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। যাঁহারা মনে করেন যে একটি সুসাধ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন সাধনাকে

অবলম্বন করিয়া যখন একতার শিক্ষাক্ষেত্র সৃষ্টি হইবে তখন নিশ্চিন্তচিত্তে স্বাধীনতাকে আদর্শ করিয়া সকলে অগ্রসর হইবে, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে সেই ভিত্তিস্থানীয় সাধনার সফলতা বা নিষ্ফলতা, সার্বজনীনতা বা সাম্প্রদায়িকতার উপর একতা সাধনের সফলতা বা নিষ্ফলতা নির্ভর করিতেছে। সার্বজনীন একতাসাধন করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে সার্বজনীন আদর্শের পর আমাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় যে আদর্শ কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজের অথবা যে আদর্শ কেবলমাত্র ব্যবসায়ীদিগের অথবা যে আদর্শ কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদিগের চিত্তকেই সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারে, এইরূপ খণ্ডিত আদর্শের দ্বারা সার্বজনীন সুদৃঢ় একতার বিকাশ হইতে পারে না। স্বদেশের স্বাধীনতা ব্যতীত একটী অখণ্ড অথচ সার্বজনীন আদর্শ আমাদের দেশে এ অবস্থায় আর নাই। এমন কি দেশের সর্বাঙ্গীন-উন্নতিরূপ অখণ্ড আদর্শ অশিক্ষিতের বোধগম্য নহে।

এবং সর্বশেষে ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে যে মিথ্যা বা ভ্রান্তিমূলক কর্মকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্যসমাজের মধ্যে স্থায়ীভাবে একতার বিকাশ হয় না। আমরা বারম্বার বলিতেছি যে পরাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইয়া কোনও সমষ্টিগত বা জাতীয় সাধনা সফলতালাভ করিতে পারে না। 'যত্রান্তে বিষসংসর্গো অমৃতং তদপি মৃত্যবে।' যাহাতে পরাধীনতাবিষের সংসর্গ রহিয়াছে এমন সৎসাধনারূপ অমৃতও মৃত্যুরই কারণ হইয়া থাকে। আমাদের পরাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে মহৎ সাধনাতেই আমরা লিপ্ত হই না কেন কেবলমাত্র একটী ভ্রম হইতে ভ্রমান্তরে ভ্রমণ করা ব্যতীত আমাদের ভাগ্যে আর কিছুই লাভ হইবে না। এই সকল ভ্রান্তিমূলক সাধনাদ্বারা কখনও একতা সাধিত হইবে না। যাহা মিথ্যা তাহাকে মিথ্যা বলিয়া স্পষ্টভাবে না বুঝিলেও সমগ্র দেশের অন্তঃকরণে তাহার প্রতি একটা অস্পষ্ট বিরাগ থাকিবেই থাকিবে। 'হায়রে! ইহাতেই বা কি হইবে।' এই সন্দেহমূলক বাক্য সেই মিথ্যাদূষিত সাধনা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে থাকিবেই থাকিবে। যাহাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে তাহারা জানেন যে এইরূপ বাক্য এমন সকল স্থানেও শোনা যায় যেখানে রাজনীতিক কোন তত্ত্বের আদৌ প্রচার নাই।

বাস্তবিকই যে কর্ম্ম সত্যমূলক, মনুষ্যহৃদয় সহজেই তাহাকে আশ্রয় করে, কিন্তু যাহা অসত্যের দ্বারা দূষিত, সে কর্মকে কেবলমাত্র তাহারাই প্রায় স্বচ্ছন্দে আশ্রয় করিয়া থাকে যাহাদের শিক্ষা ও দীক্ষা অসত্যের সংস্রবে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ও সংসিদ্ধ হইয়াছিল। এই সকল সত্য নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলেই বোঝা যায় যে ভারতের সার্বজনীন একতাসাধন যে কর্মাদর্শের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে তাহা **সম্পূর্ণ সত্যমূলক ও সার্বজনীন হওয়া আবশ্যক। ভারতের স্বাধীনতাই এই অখণ্ড, সম্পূর্ণ সত্যমূলক ও সার্বজনীন আদর্শ।** যদি একতা চাও তবে এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ কর, এই আদর্শের অনুসরণে এক মিলনসূত্রে গ্রথিত হইবার জন্য ভারতবাসী উৎসুক হইয়া আছে। সাহসের সহিত এই সত্য আদর্শ লইয়া তাহাদের নিকট অগ্রসর হও, অবিলম্বে একতার সূত্রপাত হইবে।

রুচিবিকার

দাসত্বে যেখানে রুচি জন্মায়, সেখানে বুঝিতে হইবে যে মনুষ্যত্বের জীবন্তসমাধি আরম্ভ হইয়াছে। পরাধীন হইয়াও দেশে লজ্জা ও ক্ষোভের উদ্রেক হয় না, 'অনন্ত নিখিল' সেই দেশ সংস্পর্শে থাকিয়া লজ্জায় রোমাঞ্চিত। বিধাতার রাজ্যে এমন কুৎসিত ও জঘন্য দেশ বেশীদিন টিকিতে পারে না, স্বাভাবিক নিয়মে বিনাশ প্রাপ্ত হয়! যদি কোন দিব্যধামনিবাসী ভারত পরিভ্রমণ করিবার জন্য পৃথিবীর পথে আসেন, তবে এ দেশে একটী মাত্র লক্ষণ দেখিয়া হৃদয়ে আশার ছায়ামাত্র ধারণ করেন, যদি সেই সুলক্ষণের অল্প বিকাশ না হইত তবে এই মুমূর্ষু দেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিশেষ বিলম্ব নাই দেখিয়া গম্ভীরভাবে তিনি একটু আক্ষেপ করিতেন। এই সুলক্ষণটী

কি? সমাজসংস্কারের উচ্চরোল? ধর্মসংস্কারের আড়ম্বর? শিল্প-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার চেষ্টা? ইহার মধ্যে কোনটীই আমাদের দেশকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারে না। অথচ সুসংস্কৃত সমাজ, সুসংস্কৃত ধর্ম ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শিল্প-বাণিজ্য—সমস্তই অপরিহার্য, নিতান্তই প্রয়োজনীয়। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, স্বাধীনতা বা সায়ত্বশাসনের আকাঙ্ক্ষাই সেই সুলক্ষণ, সেই নবজীবন লাভের পূর্বাভাষ। কারণ সাধনোপযোগী ক্ষেত্রের অভাবে সাধনা নিষ্ফলই হইয়া থাকে।

সাধনক্ষেত্র আগে, সাধনা তাহার পর

ধর্ম, সমাজ, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতির একটী উপযুক্ত সাধনক্ষেত্র আবশ্যক। আধুনিক জগতে এই সকল সাধনা সম্বন্ধে যে সকল আদর্শ বিকশিত হইয়াছে, সেই সমস্ত আদর্শ লইয়া আমরা যথেষ্ট নাড়া চাড়া করিয়াছি ও করিতেছি, কিন্তু সর্বদাই আমরা ভুলিয়া যাই যে, ঐ সকল আদর্শ যে সমস্ত দেশে সফল সাধনার আকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সেই সকল দেশই স্বাধীন, সেই সকল দেশে উপযুক্ত সাধনক্ষেত্র বিদ্যমান। আমাদের মনুষ্যত্বকে একদিকে নির্মমভাবে দাসত্বের দ্বারা নিপীড়িত, নিষ্পেষিত ও বিনষ্ট হইতে দিয়া অপরদিকে বর্ধনশীল মনুষ্যত্বমূলক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা সকলকে দেশে প্রচারিত করিবার জন্য আমরা আকাশ পাতাল আলোড়িত করিয়া তুলিতেছি। দাসত্বে অপর কোন লক্ষণ এই বিমূঢ়তা ও অন্ধতা অপেক্ষা শোচনীয় হইতে পারে কি? যদি মূল ব্যাধির প্রতি অন্ধ হইয়া আমরা আরো কিছুকাল সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ধূয়া তুলিয়া দেশের শক্তির অপব্যয়ে নিযুক্ত হই, তবে জগতের সমক্ষে এক অতি-প্রাচীন সভ্যতার অজ্ঞতাজনিত আত্মহত্যারূপ এক অদ্ভুত মৃত্যুকাহিনী চিরকালের জন্য পশ্চাতে রাখিয়া আমরা যবনিকান্তরালে প্রয়াণ করিতে পারিব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু বলিলে কি হয়, এদেশে একপ্রকারের যুক্তি শিক্ষিত মস্তিষ্কের উপর আপনার অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে। হ্যাটকোট-পেন্টুলেন পরিলে মাঠে ঘাটে হাটে, রেলপথে কতকগুলি সুবিধা বা অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় ভাবিয়া যেমন অনেক ভারতবাসী সাহেবী পোষাকে

সুসজ্জিত (?) হন, সেইরূপ অনেকে মনে করেন যে, স্বাধীন দেশ সমূহে প্রচলিত রীতিনীতি বা সামাজিক বিধি প্রভৃতির প্রচলন আমাদের দেশে যতদিন না সম্পূর্ণরূপে সফল হইতেছে, ততদিন রাজনীতিক অধিকার প্রভৃতি লাভ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। হ্যাটকোটধারীকে দেখিয়া পাহারওয়ালা যেমন পথ ছাড়ে, তেমনি সমুন্নত (অর্থাৎ বৈদেশিক ছাঁচে ঢালা) সমাজের অন্তর্ভুক্ত বাগ্মী রাজনীতিক আন্দোলনকারীর সম্মুখ হইতে ইংরাজ স্বাধীনতার বাধা বিপত্তিগুলি বিনা আপত্তিতে সহজেই অপসারিত করিবে! ইহাদের মূল বিশ্বাস এই যে

স্বাধীনতার মুল্য সামাজিক উন্নতি!!

সমাজ উন্নত হইলেই বৃক্ষচ্যুত পাকাফলটির মত স্বাধীনতা ঝুপ করিয়া হস্তগত হইয়া পড়িবে!! প্রথম ভুল এইখানে, অর্থাৎ স্বাধীনতা ব্যতীত সামাজিক উন্নতিসাধন সম্ভব, ইহাই প্রথম ভ্রান্তি। দ্বিতীয় ভ্রান্তি ঐ উন্নতির ধারণায়; যদি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, বিগত ১০০ শত বৎসরের ভারতীয় সমাজের কি উন্নতি হইয়াছে, তবে বাহিরের চাকচিক্য ও সুমার্জিত ঠাট সরঞ্জাম দেখাইয়া ইহারা দাসত্বের দোহাই দিবে ও সেই দাসত্বের দীর্ঘজীবন কামনা করিবে! যে দেশে প্রতি বৎসর অনশনে মৃত্যুর সংখ্যা আশ্চর্যভাবে বর্ধিত হইতেছে, যে দেশে লোকের স্বাস্থ্য ও বল ভীষণভাবে ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে, যে দেশের লোক ক্রমশঃ আত্মরক্ষা ও অত্যাচার প্রতিকারের শক্তি হারাইতেছে, যে দেশের মনুষ্যত্ব সর্বপ্রকারে জখম হইয়া পড়িতেছে, সে দেশের সমাজে যিনি উন্নতি লক্ষণ আবিষ্কার করেন, তিনি নিশ্চয়ই বায়ুরোগগ্রস্ত! সমাজকে বাহিরে সুমার্জিত করা– সমাজের চাকচিক্য সম্পাদন—এবং সমাজের প্রকৃত উন্নতি এই দুইটীর মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। মরণাপন্ন রোগীকে ভাল পোষাক পরাইয়া সুসজ্জিত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য কিছুই বাড়ে না। একটা মানুষের দশটা হিতকর আদর্শ বুঝিবার বা ধারণা করিবার শক্তি জন্মাইলে যে সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনুষ্যত্ব বাড়িবে, ঐরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। ইংরাজ সংস্পর্শে আমাদের দেশের লোকের কল্পনা বা ধারণার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন ঠাট বা ঢং বা সরঞ্জাম শিক্ষিতদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু কে সাহস করিয়া বলিতে পারেন

যে, আমাদের মনুষ্যত্ব বাড়িয়াছে, আমরা উন্নততর মানুষে পরিণত হইয়াছি? অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সমাজের প্রকৃত উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, সমাজের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে, সমাজ নিজেই বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল হইয়া এমন 'অসামাল' হইয়া পড়িয়াছে যে, একটা সমাজবিধি প্রচলনের প্রাচীন সদুপায়গুলি এখন আর কার্যকর হয় না। এই ত গেল সমাজ। সমাজোন্নতির সাহায্যে স্বাধীনতা ক্রয় করা, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য চাউল বিনিময়ে ধান্য ক্রয় করার মত। যদি চাউল থাকাই সম্ভব হইত তবে ধান্য ক্রয় করিবার কোনই প্রয়োজন থাকিত না, সেইরূপ যদি সমাজোন্নতি সাধিত হওয়া এ দেশে এখন সম্ভব হইত, তবে স্বাধীনতার জন্য 'মাথাব্যথা' থাকিত না। স্বাধীনতা অগ্রে, সমাজোন্নতি তৎপরবর্তী সাধনা।

রোগ নির্ণয়ের উপায়

যে মানুষের আদর্শের একটা ধারণা আছে, অথচ উহাকে সাধনায় পরিণত করিবার শক্তি নাই, সে মানুষের সম্বন্ধে এই বুঝিতে হইবে যে, তাহার আদর্শ অপেক্ষা তাহার মনুষ্যত্ব অন্যদিক দিয়া হীনতা প্রাপ্ত হইতেছে বা হইয়াছে। যে আদর্শকে সাধনায় পরিণত করিতে পারে না, সে কোন নিগূঢ় কারণে নিশ্চয়ই মনুষ্যত্ব হারাইতেছে। বিগত ১০০ শত বৎসরে আমরা ধর্ম সাধনার বিবিধ উচ্চ আদর্শ লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি, এমন কি দেশবিদেশে সেই সকল উচ্চ আদর্শ প্রচার করিবার জন্য উপযুক্ত লোক প্রেরণ করিয়াছি, কিন্তু আমাদের দেশে এই সকল আদর্শ সফল সাধনায় পরিণত হইল না কেন? যেখানে আদর্শ হইতে সাধনার উৎপত্তি হয় না, সেখানে মনুষ্যত্ব নিশ্চয়ই নিগূঢ়ব্যাধি দ্বারা সমাক্রান্ত? সমাজ সংস্কার সম্বন্ধেও এইরূপ বিচার করিলেই বুঝা যাইবে যে, দাসত্বকীট মনুষ্যত্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে অন্তঃসারবিহীন করিতেছে বলিয়াই সামাজিক আদর্শ সফল সাধনায় পরিণত হইতেছে না।

শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সাধনায় দাসত্বের অপকারিতা বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রথমতঃ বাণিজ্যক্ষেত্রের যে সকল কর্মনীতি ও আদর্শ আমরা পাশ্চাত্যের সংসর্গে লাভ করিয়াছি, (যথা- সমবেত চেষ্টা, অভিনবক্ষেত্র প্রবেশে অসঙ্কোচ ও অধ্যবসায় প্রভৃতি) এই সকল আদর্শ যে আমরা কার্যে

পরিণত করিতে অনেক সময় সক্ষম হই না, তাহার কারণ পূর্বোক্ত নিয়মে নির্ণয় করা যায়। অন্য কোন কারণে আমাদের মনুষ্যত্ব ম্লান না হইলে, বাণিজ্যক্ষেত্রের যে সকল আদর্শ আমরা এত পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে ধারণা করিতেছি, নিশ্চয়ই সে সকল কার্যে পরিণত করিতে পারিতাম এই গেল দাসত্বের অপ্রত্যক্ষ প্রভাব। দ্বিতীয়ত: বাণিজ্যক্ষেত্রে বণিক রাজার সহিত সংঘর্ষ ও বিরোধ অনিবার্য এবং রাজার কুটিল নীতি দ্বারা ঐ ক্ষেত্রে আমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। স্বদেশী আন্দোলন আমাদের পক্ষে যে কতদূর সুফলপ্রদ হইতে পারিত, তাহা হয়ত অনেকেই কল্পনা করিতে পারেন না। এই আন্দোলন সম্বন্ধে বণিক রাজা এমন কুটীল নীতি অবলম্বন করিলেন যে উহা উপযুক্ত সুফল প্রসব করিতে পারিল না, নতুবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিপত্তি ও বাণিজ্যের প্রসার বঙ্গদেশে আজ এমনই বিপুল আকার ধারণ করিত যে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া বাঙ্গালীকে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিত না।

প্রতিকারের ভিত্তি

এইরূপে আদর্শ ও সাধনার অসামঞ্জস্য বিচার করিয়া সকল ক্ষেত্রেই দাসত্বব্যাধি নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রতিকার দাসত্বমোচন। যদি ভারতবাসী সর্বত্র এই প্রতিকার বিধানে মনোযোগী ও যত্নশীল হয়, তবে প্রতিকার সহজসাধ্য হইবে। প্রতিকার বিধানের উপায় উপকরণ যথেষ্ট আছে, আমাদের কখনও সে বিষয়ে সম্যক অভিনিবেশ ছিল না, তাই আপনাদিগকে সর্বদাই নিরুপায় মনে করি। অতএব উপায় উপকরণের চিন্তায় বিকল হইবার পূর্বে উপযুক্ত অভিনিবেশ, আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা আবশ্যক। আর সকলের মূলে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও দাসত্বে অরুচি ও বিরাগ বিদ্যমান থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যতদিন না দেশের শিক্ষিতদের হৃদয়ে এই ঘোর বিরাগের সৃষ্টি হইতেছে, ততদিন দেশের মধ্যে প্রকৃত সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে না। ইতর লোকদিগের জন্য বিশেষ চিন্তা নাই; স্থানীয় ভদ্র ও শিক্ষিত লোকেরা যদি স্বাধীনতার জন্য তীব্র সঙ্কল্প পোষণ করেন, তবে তাহাদের সংসর্গে ও অনুকরণে ইতর লোকের হৃদয়ও প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। কোন কার্যে ইতর লোকদিগকে নিযুক্ত বা

উত্তেজিত করা সহজ। কিন্তু শিক্ষিতদের উত্তেজনা তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। সেই দৃঢ় বিশ্বাসকে জাগ্রত করিতে হইলে বর্তমান দাসত্বের বিষময় ফল হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে ও উহার প্রতি দারুণ বিরাগের সৃষ্টি করাইতে হইবে। দেশের দাসত্বের প্রতি অস্বাভাবিক রুচিকে বিনষ্ট করিবার জন্য আমাদিগকে সর্বদাই চেষ্টিত থাকিতে হইবে। ইহাই ব্যাধি প্রতিকারের ভিত্তি।

প্রতিকারের সূচনা

দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সঙ্কল্পে পরিণত করিতে হইবে। ভারতের ভাগ্যবিধাতা সহস্র প্রকার ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, স্বাধীনতার জন্য আমাদের হৃদয়ের অস্ফুট আকাঙ্ক্ষাকে সঙ্কল্পে পরিণত করিবার প্রকৃত সময় আসিয়াছে। আজ দেশের অত্যাচার, নির্যাতন, অন্নকষ্ট, নিরাশাপ্রভৃতির মন্থনে যদি এই সঙ্কল্পরূপ অমৃতভাণ্ড উত্থিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার অপমৃত্যু সুনিশ্চিত। শুভ-সঙ্কল্পের লক্ষণ তিনটী; যিনি হৃদয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প ধারণ করেন, তাঁহার জীবনে একটী পরিবর্তন আছে; লঘুতার পরিবর্তে গাম্ভীর্য, বাচালতার পরিবর্তে অল্পভাষিতা, আবেগ-উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে স্থিরবুদ্ধি ও ধৈর্য, নিরাশার পরিবর্তে উৎসাহ ও আশা, আত্মগ্লানি ও অবিশ্বাসের পরিবর্তে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। যিনি হৃদয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প পোষণ করেন, তাঁহার লক্ষ্য সামঞ্জস্য ও একতার প্রতি স্থাপিত, তিনি সর্বদাই সমব্রতধারীর সহিত মিলিত হইতেছেন ও অচ্ছেদ্য প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। তৃতীয়তঃ যিনি ব্রত ধারণ করিয়াছেন তাহার পক্ষে সকল প্রকার স্বার্থত্যাগ সহজসাধ্য, স্বার্থত্যাগ তাঁহার ধর্ম, কষ্ট স্বীকার তাঁহার দৈনিক অন্ন-জল। স্বার্থত্যাগে তাঁহার কুণ্ঠা নাই, দ্বিধা নাই; অথচ মহত্ত্বের নেশায় ভুলিয়া তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না, স্বকার্য উদ্ধারেই তিনি প্রাণপণ করেন। কর্মের তরঙ্গে গা' ঢালিয়া তিনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হন না, আপন সঙ্কল্প সাধনের ঋজুপথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হন। এস ভাই বাঙ্গালি! আপনার বিকৃত রুচিকে পরিবর্তিত করিয়া স্বাধীনতা সঙ্কল্পের দ্বারা ভারতের সেই মহাযজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হই! তুমি যাত্রা করিয়া বাহির হও, দেখিবে সাধনপথ বিধাতা অগ্রেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

বঙ্গদেশে অভাব কি ?

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে কোন আগন্তুক বঙ্গদেশে আসিলে, তিনি এখানে কেবলমাত্র দুইটী বস্তুর অভাব উপলব্ধি করেন। এই দুইটী বস্তু কি ? আর আমরাও যদি বাঙ্গালার ভবিষ্যতের প্রতি একান্ত অভিনিবিষ্ট হইয়া, অনন্যচিন্ত্য হইয়া, বাঙ্গালার বর্তমান অবস্থা হইতে স্বাধীনতাযজ্ঞের উপকরণাদির অনুসন্ধানে চিত্তকে নিমগ্ন করি তবে ঐ দুইটী বস্তুর অভাবই হৃদয়ে অনুভব করিতে পারি।

চিন্তার অভাব কি ?

বাঙ্গালী কি চিন্তাশীল নহে ? কই বাঙ্গালীকে চিন্তায় অলস হইতে কখনও দেখা যায় নাই। বাঙ্গালার সাহিত্য, বাঙ্গালার বৈঠক, বাঙ্গালার সংবাদপত্রাদি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, দেখিবে বাঙ্গালী সর্বদাই মন্তব্যের সৃষ্টি করিতেছে, অভিমত প্রকাশ করিতেছে, নূতন নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিতেছে। চিন্তন-কার্যে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গদেশকে অগ্রগামীই বলা যায়।

কর্তব্যবিচারেও বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ নহে। যেখানেই বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক স্বার্থপরের ভয় ও অনুকরণপ্রিয়ের মোহ দ্বারা বিকৃত হয় নাই, সেখানেই দেখিবে আমাদের বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে একটা সত্যধারণা জাগিয়াছে,—অন্ততঃ এইটুকু জ্ঞান আছে যে, স্বাধীনতা ব্যতীত আমাদের অন্য উপায় নাই। অবশ্য এই ধারণাকে পরিষ্কারভাবে প্রকটিত করিতে হইলে তোমাকে একটু তর্কবিচার করিতে হইবে, কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে বাঙ্গালার সর্বত্র বিচারের দ্বারা অধিকাংশস্থলেই বাঙ্গালী স্বাধীনতার আবশ্যকতাকেই প্রতিপন্ন করিতেছে।

অতএব স্থির যে, চিন্তাদ্বারা কর্তব্য পথ নির্ণয় করিবার বিষয়ে বাঙ্গালীকে পরাঙ্মুখ বা পশ্চাৎপদ বলা যায় না। "আমরা যাহা চাই **পরাধীন অবস্থায়** তাহা পাইব না"—এই বিশ্বাস বাঙ্গালার জনসমাজে এমনভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে যে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু সমাজের অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চালিত এই বিশ্বাসকে অবহেলা করিয়া আমরা একদিকে আবেদন নীতিকে দেশে বদ্ধমূল করিতে চাহিতেছি,

অপরদিকে দাসত্বগণ্ডির অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও বিবিধ কার্যে স্বাবলম্বন নীতিকে আশ্রয় করিবার জন্য দেশকে উত্তেজিত করিতেছি। অসত্যের দ্বারা বিমিশ্র এই নীতিদ্বয়ের উপর সমগ্র বঙ্গসমাজ হৃদয়ের সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। কিন্তু স্বাধীনতা যে আবশ্যক হইয়াছে এবং সম্ভব হইলে উহারই প্রতি আমাদের চেষ্টা যে প্রযুক্ত হওয়া উচিত, ইহা বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন।

পরিশ্রমের অভাব?

বাঙ্গালী কি শ্রমশীল নহে? সমাজের উর্ধ্বভাগে দু' দশ জন ধনী বিলাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত নহে। বিলাস সকল দেশেই বিদ্যমান এবং সমাজের মধ্যে বিলাস চিরকাল থাকিবেই। বাঙ্গালী শ্রমশীল কিনা—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ইতরলোক ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের জীবন সংগ্রামের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,—বুঝিবে বাঙ্গালায় পরিশ্রমের অভাব নাই। উপযুক্ত আহারের অভাবে বঙ্গে আবালবৃদ্ধ নিবীর্য হইয়া পড়িতেছে, অথচ পরিশ্রমের মাত্রা কমান একেবারে সাধ্যাতীত। বলবান প্রভুর দ্বারা নিষ্পেষিত হইয়া দাস শক্তিহীন হইতে পারে, কিন্তু শ্রমবিমুখ বা শ্রমবিহীন হইবার কোন উপায় নাই—মৃত্যু ভিন্ন। বঙ্গদেশে পরিশ্রমের অভাব নাই; সৎকার্যে পরিশ্রমের অভাব অবশ্যম্ভাবী, কারণ দাসত্বে, জীবন সংগ্রামে অত্যধিক পরিমাণে পরিশ্রম ব্যয়িত হইতেছে। ভারতবাসীর পরিশ্রমের ফল বিলাতবাসীর প্রাপ্য, তাই এত পরিশ্রমেও স্বদেশের উন্নতি সাধিত হইতেছে না। যে গোলাম, শ্রমশীল হওয়াই তাহার স্বার্থ, সে স্বভাবতঃই অন্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া যাহাতে জীবিকা অর্জন হয় তাহার প্রতি চেষ্টা ও পরিশ্রম প্রয়োগ করে।

বাঙ্গালা দেশে শ্রমশীলতার অভাব নাই। তবে সমস্যা এই যে, এই শ্রমশীলতাকে স্বদেশের কার্যে কিরূপে প্রযুক্ত করিতে হইবে। প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে যে, জীবিকারূপ লক্ষ্য হইতে এই শ্রমপ্রবাহকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। সংসার, সমাজ, স্বদেশ সকলের মূলে জীবিকা। তবে ইহাও বাঙ্গালী হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে যে, স্বদেশ পরাধীন হইলে ক্রমশঃই জীবিকা সঙ্কটাপন্ন হইয়া আসে, অবশেষে মজুরি মেলাও ভার হয়। অতএব স্বদেশের একটী সম্পূর্ণনিষ্পত্তিমূলক পাকা ব্যবস্থা যদি একেবারে করিয়া

ফেলা যায়, তবে 'কপাল ঠুকে' অনেক পরিমাণে জীবিকার বিষয় উদাসীন হইয়াও কর্মতরঙ্গে ঝাঁপ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু স্বদেশের একটী সম্পূর্ণ নিষ্পত্তিমূলক পাকা ব্যবস্থা করিবার জন্য আমাদের কেহ বা কোন সম্প্রদায় কি এ পর্যন্ত জীবিকার্জনচক্রে নিষ্পেষিত স্বদেশীয়গণকে আহ্বান করিয়াছেন? আবেদননীতিকে সফল বা সম্পূর্ণ করিবার জন্য কে জীবিকার প্রতি উদাসীন হইতে পারে? আবেদন দ্বারা প্রাপ্ত অধিকার কি চিরস্থায়ী বা পাকা? জীবিকার অবার্থ আকর্ষণ হইতে বাঙ্গালীর পরিশ্রমকে কিয়ৎকালের জন্য বিমুখ করিয়া স্বদেশের প্রতি নিয়োজিত করিতে হইলে, এমন এক আদর্শের দ্বারা তাহার চিত্তকে উন্মত্ত ও উত্তেজিত করিতে হইবে, যাহা তাহার সম্মুখে চিরস্থায়িনী মুক্তির ছবি স্থাপিত করিবে। অতএব একথা বলা অন্যায় যে, বাঙ্গালী স্বদেশের কার্যে শ্রমশীল হইতে বিমুখ। জীবিকার স্বাভাবিক আকর্ষণে তাহার সমস্ত পরিশ্রমকে জীবন-সংগ্রাম গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু উপযুক্ত আদর্শের অনুসরণে বাঙ্গালী এই আকর্ষণকেও কিয়ৎকালের জন্য পরাভূত করিতে পারে।

তবে অভাব কি?

বাঙ্গালী কর্তব্যনির্ণয় করিতে নিপুণ, বাঙ্গালী কর্তব্যবিষয়ে শ্রমশীল, অথচ স্বদেশের বর্তমান অবস্থায় যাহা একমাত্র কর্তব্য সে বিষয়ে বাঙ্গালী অগ্রসর নহে,—এই পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য কিরূপে পোষণ করা যাইতে পারে? যে একমাত্র কর্তব্য বুঝিতে পারে, যে কর্তব্যসাধনে শ্রমশীল, সে কর্তব্য অবহেলা করে কেন? গত বৎসর হইতে যে সকল রাজনীতিক উৎসবে আমরা যোগদান করিয়াছি, সে সমস্ত উৎসবে বাঙ্গালী কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তার পরিচয় দেয় নাই। প্রত্যেক উৎসবেই দেখা গিয়াছে যে, বাঙ্গালীর হৃদয়ের আশা অসঙ্কোচে পূর্ণ রাজনীতিক মোক্ষের প্রতি ধাবিত হইয়াছে। যদি সমস্ত বক্তার ইঙ্গিত বাক্য, যদি সমস্ত সংকীর্তনদলের সঙ্গীতাবলী সঙ্কলিত করা যায়, তবে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, একটীমাত্র সাধনের প্রতি ক্রমশঃই বাঙ্গালীর হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এমন কি মার্হাঠা অতিথিগণ বঙ্গদেশে আসিয়া আমাদিগকে কোনও নূতন তত্ত্ব বা আদর্শ দেন নাই, আমাদেরই কর্তব্যধারণাকে দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন মাত্র। এবং স্বদেশের জন্য সকল সাধনায় বাঙ্গালী ও মার্হাঠীর পরস্পর মৈত্রী ও

একতার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। এইটুকু ইঁহারাও স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালীর মধ্যে একটী বস্তুর অভাবের বিষয়ও ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন—সেটী determination দৃঢ়সঙ্কল্প। আমাদের

প্রথম অভাব—দৃঢ় সঙ্কল্পের

কর্তব্যের ধারণা পরিস্ফুট হইলেও, সেই কর্তব্যকে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত আমরা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। স্বাধীনতা চেষ্টাতেই যদি সকল লাঞ্ছনা, সকল ব্যাধি, সকল দুঃখজড়তা, সকল অভাব অভিযোগের একমাত্র প্রতিকার নিহিত থাকে, তবে সেই চেষ্টার প্রতি আমাদের সমগ্র হৃদয় ও শক্তি উন্মুখ হইতেছে না কেন? বুঝিয়াও আমরা উদাসীন হইয়া দিন যাপন করিতেছি কেন? আমাদের সকল আলস্য ও ঔদাসীন্যের মূলে দৃঢ়সঙ্কল্পের অভাব বর্তমান। যাহার লক্ষ্য সাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প জাগিয়াছে, সে সাধ্যমত লক্ষ্য সাধনের আয়োজন না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। প্রতিদিন সে নিজে লক্ষ্যের প্রতি কতটুকু অগ্রসর হইল, বা আর পাঁচজনকে কতটুকু অগ্রসর করাইল, লক্ষ্যসাধনের কতটুকু আয়োজন করিল বা করাইল—ইহা সে হিসাব করিয়া দেখিবে। যাহার দৃঢ়সঙ্কল্প জাগিয়াছে, সে কখনও নিরুপায় হয় না। "Where there is a will, there is a way"—"যেখানে সঙ্কল্প আছে, সেখানে উপায় আছেই"—ইহা কেবল একটী কথার কথা নহে। এ সত্য প্রতিনিয়তই প্রমাণিত ও পরীক্ষিত হইতেছে। যাহার অন্তরে সঙ্কল্প নাই, এ বিশ্বজগতে বিশ্বকর্মা তাহার জন্য একটীও উপায় সৃষ্টি করিয়া রাখেন নাই। কিন্তু যে সঙ্কল্পের অঙ্কুশতাড়নায় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছে না, উপায় তাহার নিকট আসিয়া আপনিই ধরা দেয়। শুধু মুখে বলিলে চলিবে না, শুধু স্বপ্ন দেখিলে চলিবে না, সঙ্কল্পে দৃঢ়তা চাই, তবে চেষ্টায় ঐকান্তিকতা আসিবে। "কলিকাতায় অনেক লোকের সহিত মিশিলাম, অনেক দেখিলাম, কিন্তু দু' একটী স্থান ব্যতীত কোথাও দৃঢ়সঙ্কল্পের ভাব দেখিলাম না"—এই অভিযোগ কি মিথ্যা? বাস্তবিকই আমরা ভাবিয়াছি, বুঝিয়াছি, ভাবিতেছি, বুঝিতেছি, কিন্তু হৃদয়কে আগ্রহান্বিত ও কর্মোন্মুখ করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞার উদ্রেক হয় নাই। অথচ ভাবিয়া দেখ, সকল মহৎ কর্মের মূলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।

যেমন বিদ্যুৎ আনিবার পূর্বেই মেঘমন্দ্র শোনা যায়, সেইরূপ প্রকৃত সাধনার পূর্বেই হৃদয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প জাগ্রত হওয়া চাই।

দ্বিতীয় অভাব—সংযোগের

আমাদের সমাজের মধ্যে স্বভাবতঃ যে সকল শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর সংযোগ নাই। যেখানে পরস্পর বিশ্বাস নাই, যেখানে সর্বদাই পরস্পর দূরত্ব অনুভব করিতেছে, সেখানে এক উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মিলিত হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, রাজনৈতিক লক্ষ্যসাধনে ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ পরস্পর সমভাবে মিলিত হইয়াছে এবং কেহ অর্থ দিয়া, কেহ বুদ্ধি দ্বারা, কেহ বাহুবলের দ্বারা একই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। এমনকি ভারতেরই অন্যান্য প্রদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর একটা সহজ সংযোগের ব্যবস্থা আছে। মহারাষ্ট্র দেশে ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ায় ক্ষত্রিয় জমিদারগণ তাঁহাদের পরামর্শ মত অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না। সেখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সংযোগ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আবার বাংলাদেশে যাঁহারা নেতৃস্থানীয়, তাঁহাদের সামাজিক আসন এমন স্থানে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে যে, সাধারণ লোক তাঁহাদের সহিত সহজে মিশিতে পান না; কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে মহামতি তিলক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের সহিত অনায়াসেই মিশিতেছেন। অভিনব culture বা শিক্ষার ওজরে তাঁহারা একটা পৃথক সামাজিক শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়া লন নাই। একই বাঙ্গালীসমাজ বিভিন্ন গণ্ডীতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য কোনও আদর্শ সমাজে পরিস্ফুট হইলে উহা সম্যকরূপে পরিপুষ্ট হইয়া সমাজের অঙ্গে অঙ্গে সংক্রামিত হয় না। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর শক্তি একত্র সম্মিলিত না হইলে, রাজনৈতিক মোক্ষসাধনরূপ আদর্শের প্রকৃত অনুশীলন হইতে পারে না, কারণ এই আদর্শের অনুশীলনে সকল প্রকার ব্যক্তিরই আবশ্যকতা রহিয়াছে, ইতর, ভদ্র, শ্রমজীবী, শিল্পী, কেরাণী, উকিল, জমিদার প্রভৃতি সকল প্রকারের লোক এই কার্যে যোগদান না করিলে আদর্শের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। অতএব এখন দেশের সর্বত্র

এমন লোক আবশ্যক

হইয়াছে, যাঁহারা সমাজের ভিন্নপদস্থ ব্যক্তিদিগকে একসূত্রে বাঁধিতে পারেন,

—ইংরাজীতে যাহাকে বলে organizer ; এই সংযোগকারীরা সমাজে নানা প্রকার শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া একই আদর্শের প্রতি পরিচালিত করিবেন। দেশের সর্বত্র, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, এইরূপ সংযোগকারী 'organizer'-এর আবশ্যক হইয়াছে। হে বাঙ্গালি যুবকবৃন্দ, তোমরা শিক্ষিত হইয়াছ, তোমাদের দেশের মঙ্গলচিন্তা করিতে শিখিয়াছ, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে তোমরা প্রস্তুত হইতেছ ; যদি কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিতে চাও, তবে এই সংযোগকারীর আদর্শ অন্তরে পোষণ কর। দেশে বক্তা যথেষ্ট আছে, বক্তৃতার সময় ক্রমশঃই ফুরাইয়া আসিতেছে। এখন স্বাধীনতা মহাযজ্ঞের উপকরণ প্রস্তুত করিতে হইবে। তোমরা দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হও, এক সুমহান আদর্শের সংযোগসূত্রে সমাজের ভিন্ন শ্রেণীর লোককে সংবদ্ধ কর। সমাজের সর্বত্র তোমাদের গতিবিধি আছে, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তোমাদিগকেই এই কার্যে ব্রতী হইতে হইবে। সংযোগকারী, 'organizer' হইতে হইলে স্থিরবুদ্ধি, সহানুভূতি, উদারতা, দূরদর্শিতা, শ্রমশীলতা, ও হৃদয়ের মহত্ত্ব এই কয়েকটী সৎগুণ নিতান্ত প্রয়োজন। বাঙ্গালী যুবকের মধ্যে এই সকল গুণের একেবারে অভাব নাই। দেশের কর্মক্ষেত্রে এই সংযোগকারীর বিশেষ অভাব অনুভূত হইতেছে। আজ বাঙ্গালী যুবক এই অভাব মোচন করিবার জন্য যদি বদ্ধপরিকর হয়, তবে একদিন বাঙ্গালাদেশ হইতে এমন শক্তির উদ্ভব হইবে যে, সমস্ত জগৎ বিস্মিত হইয়া থাকিবে।

"স্বদেশ প্রেমের ব্যাধি"

বিগত জ্যৈষ্ঠমাসের "প্রবাসী"তে "স্বদেশ প্রেমের ব্যাধি" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; লেখক—পূজ্যপাদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়। এই প্রবন্ধ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া আমার মনে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হইয়াছে. উহা সরলভাবে 'যুগান্তরে' ব্যক্ত করিলে আশা করি আমি স্পর্দ্ধা বা ধৃষ্টতারূপ অপরাধে অপরাধী হইব না।

অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ

আমাদের দেশের প্রকৃত অবস্থা কি এবং সেই অবস্থায় কোন্ বিষয়ে কতদূর উন্নতি করা সম্ভব ইহা সম্যকরূপে বুঝিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই অপরাপর দেশের তুলনায় আমাদের দেশ সম্বন্ধে একটা মন্তব্য প্রকাশ করা অথবা আমাদের দেশের উন্নতিকল্পে বিবিধ ব্যবস্থার প্রস্তাব করা সঙ্গত কি না ?

আমাদের দেশ পরাধীন। এই পরাধীনতার কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য কুফল আছে,—উহাদিগকে ব্যাধি বলা যাইতে পারে। এই সকল ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যদি আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ, রীতিনীতি ও চরিত্র ক্রমশঃই অধোগতি প্রাপ্ত হয় তবে আমাদের সেই দুর্দ্দশার সহিত অপরাপর স্বাধীন দেশের অবস্থার কোন তুলনা হইতে পারে কি না ? যদি এইরূপ তুলনা করাই অসম্ভব হয়, তবে তত্তৎপ্রদেশে যে সকল সুব্যবস্থা প্রচলিত আছে, আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় সেই সকলের প্রকৃত 'অনুসরণ' বা assimilation সম্ভবপর কি না? সুস্থের যাহা পথ্য, রোগগ্রস্তের কি ঠিক তাহাই পথ্য হইতে পারে ? ইহাই আমার প্রথম প্রশ্ন।

আমার এই প্রশ্নের মূলে একটী বিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে। আমি আমার দেশের অবস্থাকে পর্য্যালোচনা করিয়া পরাধীনতাকেই উহার মূলব্যাধি বলিয়া মনে করি। আমি ইহাও মনে করি যে, আমাদের দেশের ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি অশেষ প্রকার দোষে দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে মূলব্যাধি বিদ্যমান থাকিতে এই সকল দোষের প্রকৃত সংস্কারের প্রয়াস বিড়ম্বনামাত্র ; এ অবস্থায় দেশে কেবলমাত্র সংস্কারের একটা আদর্শ জাগিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু সেই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত

করিবার সদ্ব্যবস্থা আমাদের দেশে এখন নাই, হইতেও পারে না। পূজ্যপাদ শাস্ত্রীমহাশয় বোধ হয় এরূপ মনে করেন না। তিনি বোধ হয় আমাদের পরাধীনতাকে রাজনীতিক উন্নতির একটা নিম্নস্তর বলিয়াই মনে করেন, এবং আমাদের দেশে যেমন একটা সামাজিক সাধনক্ষেত্র আছে তেমনি একটা রাজনীতিক সাধনক্ষেত্রও যে আছে ইহাই তাঁহার ধারণা, তাই তিনি স্বদেশপ্রেমিকদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন,—"জাতীয় সামাজিক জীবনকে হীন অবস্থায় থাকিতে দিয়াও যেন রাজনীতিক সম্বন্ধে অতি উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারা যায়"। ইহা অপেক্ষা ঘোরতর ভ্রান্তি আর হইতে পারে না।

কিন্তু গলদ এইখানেই।

বাস্তবিকই আমাদের একটা রাজনীতিক সাধনক্ষেত্র নাই। যাহা দেশে আছে, তাহা নিজস্ব নহে, সম্পূর্ণরূপে পরের দ্বারা অধিকৃত। স্বাধীনতার অর্থই নিজেদের একটা রাজনীতিক সাধনক্ষেত্র থাকা। পরের রাজনীতি সম্বন্ধে একটা অভিমত বাক্য বা কার্যের দ্বারা প্রকাশ করাকেই রাজনীতিক সাধনা বলে না, অথচ এই সাধনাই দেশব্যাপী কর্মবিগ্রহের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া জগতে গণ্য। সকল অঙ্গগুলির খোঁজ না লইয়াই সর্বাঙ্গীন উন্নতির উদ্যোগ করা একপ্রকার মোহ। প্রথমতঃ একটী পূর্ণাঙ্গ স্বদেশ, স্বদেশের প্রকৃত উন্নতি তাহার পরে। স্বদেশের রাজনীতিক্ষেত্ররূপ অঙ্গহানি-জনিত মূলব্যাধির দ্বারা ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি অপরাপর সাধনক্ষেত্র কিরূপে ক্রমশঃই জীবনীশক্তিবিহীন হইয়া পড়িতেছে—পরাধীনতার ফলে মনুষ্যত্বহানি, এবং সেই মনুষ্যত্বসংকোচের ফলে মনুষ্যোচিত সকল সাধনাই এদেশে কিরূপ শিথিল ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছে—তাহা 'যুগান্তরে' সম্যকরূপে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। স্বদেশে সকল প্রকার কর্মক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা কোন একটী সাধনক্ষেত্রে অধিকতর শ্রমশীল হইয়া অপর কোনটীকে অবহেলা করিতাম, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা সর্বজনপূজ্য শাস্ত্রীমহাশয়ের তিরস্কারের পাত্র হইতাম। কিন্তু যে সাধনক্ষেত্রের অভাবে আমাদের স্বদেশ অঙ্গহীন হইয়া আজ দুরারোগ্য ব্যাধিজনিত ভীষণ মৃত্যুমুখে নিমজ্জমান, আপাততঃ দেশের সমগ্রশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সেই সাধনক্ষেত্র প্রস্তুত-করণের প্রতি প্রযুক্ত করাই কি যুক্তিযুক্ত নহে? ভগবানের আশীর্বাদে

যেদিন ভারতকে আমাদের পূর্ণাঙ্গ স্বদেশ বলিয়া আমরা গৌরবান্বিত হইব, সেই দিন হইতে সেই নবজাগরণের উদ্দীপনাস্রোতে সর্বাঙ্গীন-উন্নতি-তরণী উজান বাহিয়া ছুটিয়া চলিবে, সেই দিন হইতে দাসত্বপিঞ্জরলব্ধ ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার প্রভৃতির উজ্জ্বল আদর্শ প্রকৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার অবসর পাইবে, সেইদিন সমস্ত পাল খুলিয়া দিয়া স্বরাষ্ট্র নৌকা নিখিলবিশ্বহৃদয়-পোষিত একই লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হইবে।

জাপানের একটা স্বদেশ ছিল

তাই আমাদিগকে যে স্থানে আরম্ভ করিতে হইবে, জাপানকে সেই স্থান হইতেই তাহার সাধনা আরম্ভ করিতে হয় নাই। পূর্ব হইতেই তাহার একটী স্বদেশ ছিল, একটা রাজনীতিক সাধনক্ষেত্র ছিল। জাপানের বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হইবার জন্য সে যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করা আমাদের শুভজনক হইতে পারে না। সে যে স্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছে, প্রথমতঃ আমাদিগকে সেই স্থানে পৌঁছিতে হইবে; তারপর পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, রীতিনীতি প্রভৃতির সম্যক্ 'অনুসরণ' বা assimilation আমাদের পক্ষে সুফলপ্রদ ও মঙ্গলকর হইবে। যে ভারতবাসীর দাঁড়াইবারই স্থান নাই, সে পরের সুন্দর গমনভঙ্গিমা কিরূপে অনুকরণ করিবে? তাহার পক্ষে পদস্খলনই কি স্বাভাবিক নহে? ইংরাজের অনুকরণ করিতে গিয়া অনেক পরিমাণে সে দুর্ভাগ্যও কি এদেশে ঘটে নাই?

সমাজবস্তুটী কি, ইহা সমাজসংস্কারককে সর্বাগ্রে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। মনুষ্যের মত সমাজেরও যেমন একটা অন্তঃকরণ আছে, তেমনি উহার কর্মেন্দ্রিয়ও আছে। মানুষের অন্তরে ইচ্ছার উদ্রেক হইলে তাহার কর্মেন্দ্রিয় যেমন সেই ইচ্ছাকে তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত করিতে পারে, সমাজের কর্মেন্দ্রিয়ও সেইরূপ সমাজে প্রকটিত সৎইচ্ছা বা আদর্শকে সমাজের মধ্যে অনুষ্ঠানাকারে পরিণত করে।

সমাজের এই কর্মেন্দ্রিয় কি?

সমাজের অঙ্গীভূত রাজশক্তিই এই কর্মেন্দ্রিয়। পূর্বকালে আমাদের দেশে রাজাকে এই কারণে সমাজপতি বলিত। সমাজ কোন আদর্শকে হিতকর জ্ঞানে গ্রহণ করিলে, রাজশক্তি ঐ আদর্শের অনুকূল অনুষ্ঠান সমাজে

প্রচলন করেন। কোনো রীতি বা প্রথা সমাজে প্রচলন করাইবার ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় সদুপায় নাই। অনেক তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি মনে করেন যে, সমাজভুক্ত এক একটী ব্যক্তি দ্বারা কোনও নূতন রীতি অনুষ্ঠিত হইলেই ক্রমশঃ অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মে উহা সমাজের মধ্যে সুপ্রচলিত হইয়া যাইবে। এ বিশ্বাস ভ্রমমূলক, সমাজের রীতিনীতি এরূপভাবে প্রবর্তিত হয় নাই। যাহাকে সমাজের মধ্যে প্রচলিত হইতে হইবে, তাহাকে সমাজবিধির আকার ধারণ করিয়া সর্বদাই সকলের চক্ষুসমক্ষে অবস্থান করিতে হইবে। সভাসমিতি করিয়া সমাজসংস্কার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব সর্বসুধীজনসম্মত হইয়া গৃহীত হইল, সেই প্রস্তাবকে বিধির আকারে সমাজের সম্মুখে স্থাপন করিবার কোনও ব্যবস্থা আমাদের নাই। বর্তমান রাজশক্তির সহিত আমাদের স্বাভাবিক দূরত্ব ও বৈরীতা বশতঃ এরূপ ব্যবস্থা আমদের দেশে হওয়াই এখন অসম্ভব। যে রাজশক্তির সহিত আমাদের খাদ্যখাদক সম্বন্ধ, সেই রাজশক্তিকে নিতান্ত আত্মীয় ভাবিয়া তদুপরি হৃদয়ের আস্থা স্থাপন করিয়া, সামাজিক আদর্শকে সমাজবিধিতে পরিণত করিবার জন্য উহাকে অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে একেবারে অস্বাভাবিক, অতএব অসম্ভব। বিলাতী-বর্জনরূপ প্রস্তাবকে একটা বিধির অলঙ্ঘনীয়তা ও গাম্ভীর্যে বিমণ্ডিত করিতে কতদূর চেষ্টা, পরিশ্রম ও কৌশলের আবশ্যক তাহা আমরা বিগত একবৎসর-কাল বেশ অনুভব করিতেছি। রাজার উৎপীড়নের দ্বারা জনসাধারণের মানসিক অবস্থা এই বৎসরব্যাপী প্রয়াস ও পরিশ্রমের সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে যখন এত পরিশ্রম ও চেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক হইতেছে না, তখন আমাদের দেশে একটা সামাজিক আদর্শকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা বিধির আকারে প্রবর্তিত করা কি দুরূহ ব্যাপার! ইহা ব্যতীত আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, আমাদের বর্তমান অবস্থায় দেশের শক্তিকে সমাজসংস্কার বা সামাজিক উন্নতিসাধনের প্রতি আকৃষ্ট করা অসঙ্গত এবং সেই কারণেই অসম্ভব। আগে আবাসগৃহ ; গৃহসজ্জা তারপর।

মনুষ্যত্ববিধায়ক কর্মই সমাজের মেরুদণ্ড

সমাজকে একটী বৃহৎ নদীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মনুষ্যোচিত কর্মপ্রবাহ এই নদীর জলস্রোত। মনুষ্যোচিত কর্মের দ্বারা

বিকশিত মনুষ্যত্বই এই স্রোতের বেগস্বরূপ। সামাজিক মঙ্গলসাধনরূপ জলযান এই নদীর বক্ষে ভাসমান। পরাধীনতার স্বাভাবিক কুটিল নিষ্পেষণে মনুষ্যত্ব যে সমাজে ম্লান হইয়া পড়িতেছে এবং মনুষ্যোচিত কর্ম যে সমাজের অধিকারচ্যুত হইয়াছে, যে সমাজ-নদীতে বেগবান্ স্রোতের সম্পূর্ণ অভাব, সে নদীতে রজ্জুর বন্ধন ও আকর্ষণ প্রভৃতির দ্বারাও প্রকাণ্ড নৌকা চালান ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া পড়ে; স্রোতহীন বিরলজল সেই নদীগর্ভে আগাছা প্রভৃতিই উৎপন্ন হইতে থাকে। কিন্তু যেদিন স্বাধীনতার কর্মপ্লাবন আসিবে, যেদিন নদীতে দুকূল ভাসাইয়া কর্মস্রোত প্রবাহিত হইবে, সেদিন পাল খুলিয়া নৌকাও গন্তব্যপথে ধাবিত হইবে, সমস্ত আগাছা প্রভৃতিও ভাসিয়া যাইবে। জগতের সকল উন্নতিশীল দেশেই জীবিকামূলক কর্মই মনুষ্যত্ব-বিকাশের প্রধান যন্ত্রস্বরূপ। এই কর্ম-নেহাইয়ের উপর দৈনিক পরিশ্রমের মুদ্গরাঘাত পড়িয়া সংসারের মানুষ গঠিত হয়। গোলামির সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতর আমাদের দেশের জীবিকামূলক কর্ম চিররুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; যে কর্মে স্বাধীন মনুষ্যোচিত সংগুণের বিকাশ ও অনুশীলন হয়, সে কর্মে ভারতবাসী বঞ্চিত। কিন্তু সেই কর্মই সামাজিক মঙ্গলের মেরুদণ্ড। নানা অবস্থায় কেবলমাত্র আদেশপালনরূপ কর্মের উপর নির্ভর করিয়া মনুষ্যত্ব বিকশিত হইতে পারে না। যিনি মনুষ্যত্ববিকাশের ব্যবস্থা করিতে পারেন না, তিনি সমাজসংস্কারের কি ব্যবস্থা করিবেন?

সামাজিক উন্নতি

"স্বদেশপ্রেমের ব্যাধি" শীর্ষক প্রবন্ধে সামাজিক উন্নতির কথা স্পষ্টভাবে খুব অল্পই আছে, অথচ এ পর্যন্ত কেবল সেই কথারই আলোচনা করিবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ঋষিপ্রতিম শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রবন্ধের মূলভিত্তি কি? সে ভিত্তি স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর না হইলেও, উহাই কি আমাদের আলোচনার প্রকৃত বিষয় নহে? 'সামাজিক উন্নতি'কে অবহেলা করিলে রাজনৈতিক উন্নতি-সাধন নিষ্ফল হয়, ইহাই ঐ প্রবন্ধের মূলভিত্তি। এই তত্ত্ব আমি সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করি, কেবল এইটুকু স্বীকার করি না যে, আমাদের দেশের বর্তমান আন্দোলনচেষ্টাদির লক্ষ্য রাজনীতিক উন্নতি। যেদেশের একটা রাজনীতিক সাধনক্ষেত্রই নাই, সে দেশে 'রাজনীতিক উন্নতি' এই কথার অবতারণাই হইতে পারে না। যাহাদের একটা রাজনীতিক

status নাই, তাহাদের আবার রাজনীতিক উন্নতি কি? এখন 'জাতীয় জীবনে'র কোন অঙ্গেরই উন্নতির কথা না ভাবিয়া, প্রথমতঃ পূর্ণাঙ্গ স্বদেশকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পৃথিবীতে এমন জাতি অনেক আছে, যাহাদের একটা প্রকৃত স্বদেশ রহিয়াছে। অথচ যাহাদের সমাজ বিশেষ কোন উন্নতি লাভ করে নাই, অবশ্য তাহারা রাজনীতিক উন্নতিও লাভ করে নাই, কিন্তু তাহাদের স্বদেশ পূর্ণাঙ্গ, তাহারা স্বাধীন। স্বাধীনতাই একটা দেশের স্বাভাবিক অবস্থা, পরাধীনতা উহার ক্রমপ্রকটনশীল মৃত্যু।

ইহাই আমার প্রথম কথা। দ্বিতীয়তঃ আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, কোন সামাজিক সুপ্রথা সর্ববাদিসম্মত হইলেও উহাকে প্রকৃতভাবে প্রবর্তিত করিবার ব্যবস্থা পরাধীন দেশে নাই। তৃতীয়তঃ মনুষ্যত্ব-সংকোচের দ্বারা যে সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সে সমাজের জীর্ণসংস্কার করা অপেক্ষা তাহার প্রতি আমাদের একটা মহত্তর কর্তব্য আছে। বিহঙ্গমপক্ষের সৌন্দর্যবিধানের পূর্বে তাহার প্রাণরক্ষার একটা ব্যবস্থা করাই উচিৎ।

আত্মগরিমা ও অতীতানুরক্তি

আর একটী কথা লিখিয়াই পত্রখানি শেষ করিব। নিজের নিন্দা শুনিয়া শুনিয়া যাহার কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে, পরের কাছে, ঘরের লোকের কাছে কেবলই অপবাদ শুনিয়া যে আত্মদ্রোহী হইয়াছে, অথবা মরমে মরিয়া গিয়াছে, তাহাকে উদ্যমশীল করিবার জন্য তাহার গুণকীর্তন করা নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত। আত্মবিশ্বাস না থাকিলে উদ্যমশীল হওয়া অসম্ভব। কেবলই একজনের দোষ ধরিয়া গেলে, তাহাকে সংশোধিত করা যায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আসিবার পর হইতে আমাদের দেশের নিন্দা রটনা করা ও দোষের আলোচনা করা বিদেশীর পক্ষে অনেকটা স্বার্থ হইলেও স্বদেশীয়ের পক্ষে একটা ব্যাধি। ছয় বৎসরের শিশুকে পর্যন্ত বলিতে শুনিয়াছি—"বাঙ্গালীর আবার মরদ আছে"; দেশের আবালবৃদ্ধবনিতাকে যে আত্মনিন্দারূপ ব্যাধিতে আক্রমণ করিয়াছে সেই ব্যাধির ঔষধকেই শাস্ত্রী মহাশয় স্বদেশ-প্রেমের প্রথম ব্যাধি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। রোগ তীব্র হইলে ঔষধও তিক্ত হইয়া থাকে; ঔষধ আহার্যের মধ্যে গণ্য হইলেও, খাদ্যের মত সুস্বাদু ও উপাদেয় নহে। এই হিসাবে আমাদের আত্মপ্রশংসা হয়ত অনেক সময়েই উপাদেয় বা শ্রুতিসুখকর নহে। আত্মপ্রত্যয় হইতে হৃদয়ে যে স্বাভাবিক

আত্মগৌরব জাগে, আমাদের আত্মপ্রশংসা তাহার গণ্ডি হয়ত অতিক্রম করে ; কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে যে, সেই আত্মপ্রশংসা প্রতিক্রিয়ামূলক অর্থাৎ আত্মনিন্দার প্রতিক্রিয়া বা Re-action, এ অবস্থায় উহার মাত্রা অধিক হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের দেশে আত্মগরিমা ও অতীতানুরক্তি এই Re-action বা প্রতিক্রিয়াসম্ভূত শক্তিদ্বারা উচ্ছ্বসিত হইয়া যদি ন্যায় বা সুরুচির সীমা অতিক্রম করে, তবে সে দোষ কাহার? আসন্নমৃত্যু স্বদেশের প্রকৃত ব্যাধির সন্ধান না রাখিয়া সময়ে অসময়ে কেবলই যাহারা তাহার ক্ষতস্থানে নিন্দারূপ ছুরিকাঘাত করেন সে দোষ তাহাদের। দাসত্বভারে নিপীড়িত হইয়া যে মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে নিন্দা করিলে তাহারও উপকার করা হয় না, নিজেরও পৌরুষ প্রকাশ করা হয় না। ঘরের এবং বাহিরের নিন্দাবাদ এতকাল শুনিয়াও যে আমাদের দেশ এখনও অতীতের প্রতি চাহিয়া আত্মবিশ্বাসী হইতে সক্ষম হয়, ইহা ভগবানের এক আশ্চর্য কৃপা, কারণ আত্মবিশ্বাস না আসিলে উদ্যম আসে না। ইতি—

জনৈক স্বদেশসেবক

মণ্ডলী গঠন

"অল্পানামপি বস্তুনাং সংহতিঃ কার্যসাধিকাঃ" অল্প বস্তুর সংহতি কার্য সম্পাদনে সমর্থ হয়। এই বাঙ্গালাদেশের আট কোটী লোকের মধ্যে যদি এক হাজার ব্যক্তিও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন, তবে সমসঙ্কল্প প্রণোদিত হইয়া এই একহাজার ব্যক্তি সমগ্র বঙ্গদেশের চিন্তা ও সাধনাকে পরিবর্তিত করিয়া এক মহান লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু সর্বপ্রথম এই হাজার জন বাঙ্গালীকে মণ্ডলীবদ্ধ হইতে হইবে। কিরূপে এইরূপ মণ্ডলী গঠন করা যাইতে পারে তাহাই আজ আলোচনা করা যাউক।

জেলা মণ্ডলী

একটী জেলার প্রধান সহরে জেলার অধিকাংশ স্থানের প্রতিনিধিই আসা যাওয়া করিয়া থাকেন। অতএব এই সহরে যদি একটী ক্ষুদ্র মণ্ডলী গঠিত থাকে, তবে এই মণ্ডলীর উদ্যোগে অতি সহজেই জেলার অধিকাংশ স্থানেই উপযুক্ত ব্যক্তির অনুসন্ধান চলিতে পারে। ভগবানের অনুগ্রহে স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে এই প্রকারের অনুসন্ধান প্রায়ই বিফল হয় না। অতএব জেলার প্রধান সহর হইতে আরম্ভ করিয়া জেলার অন্তর্গত অনেক স্থানেই আবশ্যক মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী স্থাপিত হইতে পারে। জেলার প্রধান সহরস্থিত মণ্ডলীর পক্ষে সেই জেলাই বিশেষভাবে উহার কর্মক্ষেত্র। প্রথমতঃ এইভাবে প্রত্যেক জেলার কার্য আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। জেলার প্রধান সহরে মণ্ডলী গঠন আরম্ভ না হইলেও বা সেই সহরস্থিত মণ্ডলীর অপেক্ষা না রাখিয়াই জেলার অন্য স্থানে কার্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। কিন্তু জেলায় একটী কেন্দ্রমণ্ডলী স্থাপন ও উহার সহিত সংযোগ, সর্বদাই এবং সর্বত্রই, একটী প্রধান উদ্দেশ্যরূপে চেষ্টার বিষয়ীভূত থাকিবে। এই সকল জেলাস্থ মণ্ডলী সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাদেশের প্রধান কেন্দ্রমণ্ডলীর জন্য প্রকৃত ভিত্তি ও কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকিবে। এই মূল মণ্ডলী সমস্ত শাখা-মণ্ডলীকে সংবদ্ধ ও সংযত রাখিবার ভার গ্রহণ করিবে।

উদ্দেশ্য

অতএব প্রথমতঃ জেলামণ্ডলী গঠনের কার্য সবত্র আরব্ধ হওয়া আবশ্যক। এই মণ্ডলীর উদ্দেশ্য—**স্থানীয় চিন্তা ও সাধনাকে স্বাধীনতার প্রতি প্রধাবিত হয়।**

এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিগত পাঁচ মাস কাল 'যুগান্তরে' যে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অন্ততঃ এই কয়েকটী তত্ত্ব বোধ হয় অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে,

(১) জাতির উন্নতির মূলভিত্তি জাতীয় স্বাধীনতা ; স্বাধীনতা ব্যতীত কোন দিকেই স্থায়ী প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

(২) স্বাধীনতাই স্বাধীন জাতির সৎগুণাবলী বিকশিত করিবার পক্ষে একমাত্র শিক্ষাক্ষেত্র। "It is liberty alone which fits for liberty" (Gladstone).

(৩) বর্তমান অবস্থায় আপনাদিগকে স্বাধীনতালাভের জন্য উপযোগী করিতে হইলে একমাত্র উপায় স্বার্থত্যাগের সহিত স্বাধীনতালাভের চেষ্টা। প্রকৃত উপযোগিতা লাভের জন্য পরাধীন দেশে অন্য কোন শিক্ষাক্ষেত্র থাকিতে পারে না।

এই তিনটী তত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দেশের চিন্তা ও সাধনাকে স্বাধীনতার প্রতি পরিচালিত করাই প্রত্যেক স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তির কর্তব্য। অতএব মণ্ডলীর উদ্দেশ্য নিঃসংশয়িতরূপে স্থিরীকৃত হইল।

উপায়

উপায় নির্দেশ করিতে হইলে, প্রথমতঃ মণ্ডলী বিস্তারের কথাই বলিতে হয়। মণ্ডলীর প্রভাব ও কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার জন্য মণ্ডলীভুক্ত প্রত্যেককেই সর্বদা সজাগ ও উদ্যোগী থাকিতে হইবে। অতএব প্রথম উপায়, মণ্ডলীর প্রসার বৃদ্ধি, ২য়, সাময়িক ঘটনা আন্দোলনাদি অবলম্বন, ৩য়, লক্ষ্যাভিমুখী চিন্তা ও সাধনার শিক্ষা। কেবলমাত্র সংবাদপত্র প্রচারের দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না, একথা আমরা যুগান্তরের প্রথম সংখ্যায়ই বলিয়াছি। তাই আপাততঃ তিনটী উপায় সর্বজনসমক্ষে নির্দেশ করা আবশ্যক। কিন্তু যাঁহারা কোন স্থানে মণ্ডলী গঠন করিতে যাইবেন, তাঁহাদের একটী কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। কোন প্রকারের আড়ম্বর ও অনাবশ্যক আত্মপ্রকাশ—এই দুইটীকে বিপদ মনে করিয়া বর্জন করিতে হইবে; মণ্ডলীর অধিবেশনে কোন প্রকারের আড়ম্বর থাকিবে না, কিংবা উহার কোন বিজ্ঞাপন মাণ্ডলিক ব্যতীত কেহ জানিবে না। মণ্ডলীর প্রকাশ্য কার্যাবলীর প্রভাব জনসাধারণ অনুভব করিবে, কিন্তু কোনও সংগঠিত মণ্ডলীর দ্বারাই যে ঐ সকল কার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহা যতই অজ্ঞাত ও অননুভূত থাকে ততই মণ্ডলীর পক্ষে মঙ্গলজনক এবং শ্লাঘ্য। নীরবে ও নিঃশব্দে মহৎকর্মে সফলতা লাভের ভাব বাঙ্গালাদেশে বিকশিত

হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। প্রত্যেক মণ্ডলী এই ভাবের বিশেষ অনুশীলন করিবে, এবং স্থানীয় বা অপর স্থানের মাণ্ডলিক ব্যতীত নিজ অস্তিত্ব কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।

১। মণ্ডলীর প্রসার বৃদ্ধি

১৬ বৎসর বয়সের অধিক বয়স্ক প্রত্যেক স্বাধীনতাপ্রয়াসী ভারতবাসী এ মণ্ডলীর সভ্য হইতে পারেন। কোন ব্যক্তিকে মণ্ডলীভুক্ত করা যায় কিনা, ইহা বুঝিতে হইলে তাহার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ মণ্ডলীর উদ্দেশ্যের মূলীভূত তিনটী তত্ত্বের উপর লোকটির হৃদয়ের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা আছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ মণ্ডলীর উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া লোকটি কর্মশীল হইবে, না অলস হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা দেশে উচ্চ আদর্শ অলস ব্যক্তির হাতে পড়িয়া অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ লোকটির স্বদেশপ্রীতি নিঃস্বার্থ ও স্বার্থবিজয়ী কি না। চতুর্থতঃ লোকটি গৃহে বা কর্মস্থলে এমন প্রভাবের মধ্যে ও এমন সংসর্গে থাকে কি না যাহাতে সে সহজে দেশদ্রোহী হইতে পারে। পঞ্চমতঃ মণ্ডলীর উদ্দেশ্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া লোকটি অধ্যবসায়, মন্ত্রগুপ্তি, দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য প্রকাশ করিতে পারিবে কি না। সর্বশেষে ইহাও বুঝিয়া দেখিতে হইবে যে, লোকটি সম্পূর্ণরূপে মণ্ডলীর বাধ্য ও অধীনে থাকিবে কি না। এই ছয়টি লক্ষণের অস্তিত্ব দেখিয়া তবে কাহাকেও মণ্ডলীভুক্ত করা হইবে। কাহাকেও মণ্ডলীভুক্ত করিবার সময় সমস্ত মাণ্ডলিকের সম্মুখে তাহা দ্বারা বারম্বার অন্ততঃ উল্লিখিত ছয়টি বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইতে হইবে। কোন মণ্ডলীর নামকরণ স্থানীয় মাণ্ডলিক-দের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, কেবলমাত্র এইটুকু লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে যে, নামের দ্বারা যেন উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট পরিচয় না দেওয়া হয়! কিন্তু ইহাও যেন মনে থাকে যে, সকল মণ্ডলী মূলতঃ 'মণ্ডলী' নামেই এই মাণ্ডলিকদের নিকট অভিহিত ও খ্যাত থাকিবে।

২। সাময়িক ঘটনা আন্দোলন প্রভৃতি

সাময়িক বিবিধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে সর্বদাই যে সকল অনুষ্ঠান, বা আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য দেশের বর্তমান নেতারা

আহ্বান করিয়া থাকেন, সেই সকল আন্দোলন বা অনুষ্ঠানে সর্বদাই মণ্ডলী যোগদান করিতে পারে। কিন্তু সকল সময়ে বিচার করিয়া প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, যে সকল দেশব্যাপী অনুষ্ঠান ও আন্দোলন স্বাধীনতালিপ্সাকে জাগ্রত করে, সেই সকল ব্যাপারেই যেন মণ্ডলী সর্বান্তঃকরণে যোগদান করেন এবং অগ্রগণ্য হইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু যে সকল ব্যাপারে দেশের লোক পরমুখাপেক্ষী হইতে শিক্ষা করে ও আপনার দুর্বলতা স্বীকার করিয়া যায়, সেই সকল ব্যাপারের বিরুদ্ধে মণ্ডলী সর্বদাই সচেষ্ট থাকিবে। আমরা আশা করি, এইরূপ সদ্বিচার করিবার পক্ষে যুগান্তর সর্বদাই মাণ্ডলিকগণকে সহায়তা করিতে পারিবে। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় স্বদেশ-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান আন্দোলনাদির অভাব নাই, এবং বিধাতার কৃপায় এই সকল সাধনার দ্বারা বাঙ্গালী স্বদেশপ্রেমে ও স্বাধীনতার সঙ্কল্পে সর্বত্রই দীক্ষিত হইতেছে। অতএব ইহাদিগকে যেন কোন ক্রমেই অবহেলা না করা হয়। কিন্তু স্বাধীনতার আদর্শ হৃদয়ে ধারণ না করিয়া এই সকল আন্দোলনে যোগদান করিলে, ইহাদের দ্বারা প্রকৃত শক্তি ও শিক্ষালাভ হইবে না। অতএব মাণ্ডলিকগণ একদিকে যেমন মণ্ডলীর প্রসার বৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন, তদ্রূপ এই সকল অনুষ্ঠান আন্দোলনাদির দ্বারা দেশকে মাতাইয়া তুলিবার ব্যবস্থাতেও সর্বদা মনোযোগী ও উদ্যোগী থাকিবেন।

৩। লক্ষ্যাভিমুখী চিন্তা ও সাধনার শিক্ষা

স্বাধীনতালিপ্সার দ্বারা প্রণোদিত না হইলে সকল প্রকার উন্নতির চেষ্টাই যে নিষ্ফল, মূলব্যাধিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্থূল সংস্কার-চেষ্টা যে বৃথা শক্তিক্ষয়, স্বাধীনতারূপ মূলভিত্তির অভাব সত্ত্বে জাতীয় জীবনের কোন অঙ্গই যে গঠিত হইতে পারে না, এই বিশ্বাস শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিতে হইবে। বিশেষভাবে সত্য প্রচার করিবার জন্যই মণ্ডলী কোন সভা আহ্বান করিতে পারিবে না, অথচ অন্য আলোচনা সভাতে এই সত্যকে সর্বদাই প্রকাশ করিবার জন্য মাণ্ডলিকগণ সচেষ্ট থাকিবে। ইহা ব্যতীত ঐ মতের প্রচারক ও পরিপোষক সংবাদ পত্রাদির প্রবন্ধ পাঠ করাইয়া ও আলোচনা করাইয়া সত্য প্রচার-কার্যে প্রত্যেককেই ব্রতী হইতে হইবে, এবং সর্বদাই কথাবার্তার সাহায্যে অপরলোককে

নিজমতে আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। স্থানে স্থানে যে সকল আলোচনা সভা আছে, উহাতেও সত্য প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক কথায় দেশের সর্বত্রই যাহাতে স্বাধীনতার ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, তাহার জন্য প্রত্যেক মাণ্ডলিককেই সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

লক্ষ্যাভিমুখী সাধনা বলিলে অনেক কথা বুঝায়। আপাততঃ নিজ নিজ শরীর, মন ও বুদ্ধিকে স্বাধীনতালাভ ও স্বাধীনতা সম্ভোগের উপযোগী করাকেই লক্ষ্যাভিমুখী সাধনার শিক্ষা বলা যাইতে পারে। দৈহিক বলসঞ্চয় আমাদের দেশের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। অতএব প্রত্যেক মণ্ডলী শারীরিক শক্তি-সাধনকে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের একটী মুখ্য উপায় বলিয়া বিবেচনা করিবে।

কার্য প্রণালী

মণ্ডলীর আভ্যন্তরীণ গঠনপ্রণালী যে সকল স্থানেই এক রকমের হইতে হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। প্রথম অবস্থায় যেখানে যেরূপ লোক পাওয়া যাইবে, সেখানে সেইরূপই ব্যবস্থা স্বভাবতঃ গড়িয়া উঠিবে। উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্ম আরম্ভ হইয়া গেলে, যদি পরিবর্তন আবশ্যক মনে হয়, তবে কেন্দ্রমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইলেই চলিবে। অতএব আপাততঃ মণ্ডলীর কার্য নির্বাহের জন্য মাণ্ডলিকগণ সুবিধা মত একটা ব্যবস্থা করিয়া লইবেন কেবল বিশেষ লক্ষ্য এই থাকিবে যে, মণ্ডলীর মধ্যে শৃঙ্খলা ও বাধ্যতা যেন পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়।

মিথ্যা ভয়

কাণাকে কাণা বলিলে কাণার আর রাগের সীমা থাকে না ; যাহার যেখানে ব্যথা সেখানে হাত পড়িলে সে একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে, জগতের সম্মুখ হইতে আপনার ক্ষতস্থান লুকাইয়া রাখিতে সকলেই সচেষ্ট। ভারতে ইংরাজ সরকারেরও সেই দুর্দশা। ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি যে এদেশে কত ক্ষীণ তাহা ইংরাজ প্রাণে প্রাণে বেশ বুঝে ; আর বুঝে বলিয়াই সে প্রকাণ্ড আড়ম্বরের মধ্যে আপনার দুর্বলতা লুকাইয়া রাখিতে চায় ; গোটা-কত ফৌজ, তোপ, লাল পাগড়ীর ভড়ং দেখাইয়া দেশের লোককে স্তম্ভিত করিতে চেষ্টা করে। ঐ যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদ, ঘন ঘন পাহারা, আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়, বড় বড় গোরা বারিক, ও সমস্ত কেবল একটা যাদু করিবার কল মাত্র। লোকে বিস্ফারিত নয়নে দেখিতেছে আর হাঁ করিয়া ভাবিতেছে—ইংরাজ সরকার কি দোর্দণ্ডপ্রতাপ! ইংরাজ জানে যে লোকের এই অজ্ঞানই ভারতে তাহার রাজত্বের ভিত্তি। তাই সে নানা কৌশলে এই অজ্ঞানতা বজায় রাখিতে চায়, লোকে যেদিন সন্দেহ করিবে যে এ তাসের ঘর সমগ্র ভারতবাসীর এক ফুৎকারও সহ্য করিতে সমর্থ নয়, সেদিন ইংরাজ রাজত্বের অবসানের সূত্রপাত। আজ অনেক দিনের পরে লোকের মনে সেই সন্দেহ আসিয়াছে ; তাই কি তাহার এত আস্ফালন ?

সেদিন ইংরাজ সরকারের পরাক্রমের কথা প্রসঙ্গে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারী একজন দেশীয় রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন—এদেশের লোকের ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু করিবার কি ক্ষমতা ?—রাজা কিছু না বলিয়া তাঁহার একজন কর্মচারীকে এক গামলা কাল কলাই ও গোটা কতক সাদা মটর আনিতে বলেন। সাদা মটরগুলিকে কাল কলাইয়ের উপর ছড়াইয়া দিয়া গামলাটা নাড়িতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শ্বেত মূর্তিগুলি কোথায় অন্তর্হিত হইল। ইংরাজ কর্মচারীকে দেখাইয়া রাজা বলিলেন—ভারতে তোমাদের ঐরূপ অবস্থা, গোটাকতক

মাত্র সাদা সাদা প্রাণী ভারতবর্ষে প্রভুত্ব করিয়া বেড়াইতেছে। শুধু একবার জাতীয় শরীরকে নাড়াচড়া দেওয়ার অপেক্ষা।

তবে এই যে দেড়শত বৎসর ধরিয়া "জনকতক শ্বেত প্রহরী পাহারা" আমাদের নয়নে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়া রহিয়াছে তাহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, আমরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন। সমগ্র ভারতবাসীর তুলনায় দেশে ইংরাজ কয়জন? আর তাহাদের বেতনভোগী স্বদেশদ্রোহীর সংখ্যাই বা কত? দেশের লোকে যেদিন বুঝিবে যে বিদেশীর কেবল পরের দেশে আসিয়া পরদেশবাসীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাওয়াই উদ্দেশ্য, সেইদিন আবার এই বিরাট জাতির মৃতপ্রায় দেহে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিবে; কাঙালের মত ভারতে আসিয়া কুড়ানো রাজমুকুট মাথায় দিয়া ইংরাজ আজ ভাবিতেছে বুঝি সে সত্য সত্যই ভারতের সম্রাট হইয়া পড়িয়াছে— এই জাতীয় শরীরে প্রাণের প্রথম স্পন্দনে সে ভ্রান্ত বিশ্বাস কোথায় উড়িয়া যাইবে। দেশের লোক যদি আপনার পরাধীনতা নির্বিবাদে স্বীকার করিয়া না লয়, দেশের লোক যদি একযোগে খাজনা ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে তাহা শত সহস্র ইংরাজ জাতি আসিলেও ভারতের পায়ে আর শৃঙ্খল বাঁধিতে পারে না।

যাহারা আত্মশক্তিতে অনাস্থাবান্ হইয়া বিশ্বাসহীনের মত এখনও চুপ করিয়া পড়িয়া আছে আর বৃথা বাক্যজালে দেশের লোককে বুঝাইতে চাহিতেছে "এখনও সময় হয় নাই" তাহারা ঐ অলস ভাবেই দিন কাটাইবে। কিন্তু যাহাদের কাণে স্বাধীনতার মন্ত্র পশিয়াছে তাহাদের আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। অনন্যকর্মা হইয়া তাহাদিগকে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যাহারা এখনও বুঝে নাই তাহাদিগকে কর্তব্যের পথ দেখাইয়া দিতে হইবে; যাহারা কর্তব্যের পথ দেখিয়াছে তাহাদিগকে লইয়া মৃত্যুমুখে ছুটিতে হইবে।

ভয় নাই। বহু দিনের পর আজ মূর্চ্ছাভঙ্গের প্রথম লক্ষণ দেখা দিয়াছে। দেখিতেছ না আজ জননীর কাতর ক্রন্দন দেবলোকে গিয়া পৌঁছিয়াছে; ঐ লক্ষ লক্ষ ধৃতাস্ত্র দেবশিশু ধর্মরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জননীর ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়া পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতেছে। আবার

ভারতে গীতার যুগ আসিয়াছে ; আজ যাহারা শিশু তাহারাই ঐ আগতপ্রায় কুরুক্ষেত্রের মহাহবে দ্রোণ, কর্ণ, ভীষ্ম হইয়া দাঁড়াইবে, তাহারাই হৃদ্‌পিণ্ড তর্পণ করিয়া পিতৃগণের তুষ্টি সাধন করিবে ; তাহারাই অমৃতধারা সিঞ্চনে মৃতদেহে প্রাণ আনিয়া দিবে। অমরজাতি আমরা ;—আমাদের আবার কিসের ভয় ?

মিথ্যার পূজা

ভূপেন্দ্রনাথকে জেলে দিয়া ফিরিঙ্গী সরকার ভাবিয়াছিল এইবার তাহারা যুগান্তরের উত্থানশক্তি একেবারে রহিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যুগান্তর আবার বাহির হইল। মরিল না ত বটেই ; অধিকন্তু আবার ভবিষ্যতে যে মরিবে তাহার আশা পর্যন্ত দিল না। ইহাতে সরকারের ত রাগ হইবারই কথা !

ইংলিশম্যান ও ডেলি নিউজ 'হা হুতাশ' করিয়া শেষে আশা দিল—"ভয় নাই ; ছোটলাট আবার যুগান্তর সম্পাদককে জেলে দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।" ছোটলাট নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি যুগান্তরের কতগুলা সম্পাদক আছে একবার দেখিয়া লইবেন ; সব কটাকে জেলে পাঠাইবেন।

যুগান্তরের আবার সম্পাদক কে ? যুগান্তর ত জাতীয় ভাবসমষ্টি মাত্র। লোকের প্রাণের ভিতর দিয়া যে ভাবস্রোত ছুটিয়াছে তাহার এক একটা কণা মাত্র যুগান্তরে আসিয়া ধাকা লাগে। সম্পাদক ত তাহা অভিব্যক্তির যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রকে ধরিলে যন্ত্রী ত ধরা পড়ে না ; যন্ত্রী যে অশরীরী। ঐ যে পালে পালে উন্মাদ বালকের দল "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া অজানা লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে, ঐ যাহারা নৃমুণ্ড মালিনীর খর্পর তলে আত্মবলিদান দিয়া অমরত্ব লাভের জন্য উৎসুক—তাহারাই দেশে যুগান্তর

আনিবে ; তাহারাই যুগান্তরের সম্পাদক। গর্বস্ফীত অন্ধ! তাহাদের সংখ্যা জানিতে চাও! একদিন জানিবে। তাহাদের সকলকে কারাগারে পুরিতে পার এতবড় কারাগার ত আজও তোমরা গাঁথিয়া তুলিতে পার নাই।

আপনাকে আপনি যে গোলাম না সাজায়, তাহাকে গোলাম সাজাইতে পারে এতবড় বীর এ ত্রিভুবনে কেহ নাই। তুমি আমায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তোমার অধীনতা স্বীকার করাইবে ; আমি যদি 'ও দুঃখ নয় মা দয়া তোমার' বলিয়া সহাস্য মুখে কারাগৃহে প্রবেশ করি—তবেই ত তোমার দমনের চেষ্টা ব্যর্থ! তুমি আমায় ফাঁসীকাঠে ঝুলাইবে?—আমি মরিবার সময়েও ক্ষমতা তুচ্ছ করিয়া মরিব। একদিকে মাতৃমন্ত্র অপরদিকে ইংরাজের পরাধীনতা স্বীকার করাইতে চাও! মোগল সম্রাট যখন একদিন তোমাদেরই মত মদগর্বে অন্ধ হইয়া শিখগুরুকে ধর্মত্যাগ করিতে বলিয়াছিল, তখন শিখগুরু হাসিতে হাসিতে আপনার মাথা দিয়াছিলেন ; ধর্ম দেন নাই। আমরাও তাহাই করিব। ভারতে আবার ধর্মের বন্যা আসিয়াছে। মোগল সিংহাসন যেখানে ভাসিয়া গিয়াছিল, তোমার পলাসীতে কুড়ান সিংহাসন সেখাসে ভাসিয়া যাইবে। আমরা রাখি বলিয়া তোমরা আছ, বাঁচাই বলিয়া তোমরা বাঁচ। আমরা তোমাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিই বলিয়াই তোমরা আমাদের অনশনক্লিষ্ট করিতে পার ; আমরা নির্জীব সাজিয়া থাকি বলিয়াই তোমরা আমাদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিতে সাহসী হও ; আমরা তোমদের মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছি বলিয়াই তোমরা সত্যই মাথার মণি ; যেদিন নিষ্ঠীবনের মত তোমাদের ঘৃণার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিব—সেদিন তোমরা নিষ্ঠীবন অপেক্ষা অধিক মূল্যবান নহ। আমরা ভ্রান্তির ঘোরে মিথ্যার পূজায় প্রবৃত্ত বলিয়াই মিথ্যা আজ সত্যের আসনে বসিতে সাহস পাইয়াছে। পরমহংসদেব বলিতেন—মায়াকে মায়া বলিয়া চিনিলে মায়া পলাইয়া যায়। যেদিন আমরা বুঝিব যে আমরা কতকগুলা অন্নদাস, ভবঘুরেকে ধরিয়া স্বহস্তে তাহাদের কপালে রাজটীকা পরাইয়া দিয়াছি, যে দিন বুঝিব আমরা বাস্তবিক কাণা নহি, শুধু স্বেচ্ছায় চোখ বুজিয়া অন্ধকার দেখিতেছি মাত্র, যেদিন বুঝিব আমরা দুর্বল নহি, অপারগ নহি, শুধু আলস্যের ঘোরে, অজ্ঞানের ঘোরে পড়িয়া আছি মাত্র—

সেইদিন আমাদের দুর্দশার নিবৃত্তি। সে দিন আর "আমরা স্বাধীনতার উপযুক্ত নহি" বলিয়া জগতের সম্মুখে হাস্যাস্পদ হইতে ছুটিব না। অনন্ত শক্তির আধারভূতা, রন্ধ্রে রন্ধ্রে চৈতন্যময়ী আমাদের জননী—আমরা আবার কাহার দাস?

প্রতিজ্ঞা কর দেখি আর মিথ্যার সংস্পর্শে আসিব না, ইংরাজের বিশ্ববিদ্যালয়রূপ যাদুগৃহে পাণ্ডিত্যের তক্‌মা পাইয়া ভেড়া বনিয়া থাকিব না; ছোটলাট বড়লাট বাহির হইলে অভিনন্দন পত্র লইয়া চিরদাসত্ব স্বীকার করিবার জন্য তাহাদের পিছু পিছু ছুটিব না—তখন মায়ের যথার্থ স্বরূপ বুঝিবে; দেখিবে মা চির স্বাধীনা। একবার চোখের ঠুলি খুলিয়া ফেলিয়া মায়ের অভয়পদ দেখ দেখি; বুঝিতে পারিবে এ ইংরাজ রাজত্ব একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা মায়াপুরী।

একথা বলিলে ইংরাজ রাগিয়া উঠিবে; কিন্তু আমাদের সহিত ইংরাজের মিলনের ত কোন সম্ভাবনাই নাই। একস্থানে বসিয়া সত্য মিথ্যা উভয়ে ত নির্বিবাদে ঘর করিতে পারে না। ইংরাজের বিরোধ ধর্মের সহিত—সত্যের সহিত। আর যাহার সত্যের সহিত বিরোধ তাহার মরণ অবশ্যম্ভাবী।

———

সম্মোহন

একটী ছোট ছেলে বই বগলে করিয়া বিদ্যালয় হইতে কালি মাখিয়া ফিরিতেছিল; তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই যে দেশে আমরা বাস করি, তার নাম কি বল দেখি?" বালক টপ্‌ করিয়া উত্তর করিল—"কেন, ইণ্ডিয়া।" "দেশটা কাদের?" "ইংরাজদের"। লেঠা চুকিয়া গেল, বুঝিলাম, সাপের সম্মোহন মন্ত্র ধরিয়াছে।

আর একদিন একটী উকিল বন্ধুর সহিত কথাবার্তা হইতেছিল। সুশীল ও সুবোধ বালকের ন্যায় পর্যায়ক্রমে আবেদন ও বক্তৃতার দ্বারা একদিন সুপ্রভাতে যে আমরা ইংরাজের ন্যায়বুদ্ধি জাগাইয়া তাহাদের নিকট হইতে আত্মশাসন পাইব, সে বিষয়ে বন্ধুটী আমার সন্দেহমাত্র করেন না। তিনি বলিলেন—"আগে আমরা উপযুক্ত হই, তাহার পর ইংরাজের নিকট সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন চাহিয়া লইব।" কবে আমরা উপযুক্ত হইব তাহা জিজ্ঞাসা করিবার আর প্রবৃত্তি হইল না। তর্ক শেষ করিলাম; বুঝিলাম এখানে মন্ত্রের পুরা গুণ ধরিয়াছে। বালক যাহা গলাধঃকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, যুবক তাহা পরিপাক করিয়া লইয়াছে।

দেশ ইংরাজদের—তবে আমরা কে? আমরা এই যে ত্রিশ কোটী মনুষ্যের মত আকারবিশিষ্ট জীব ভারতের কোল আঁধার করিয়া রহিয়াছে—আমরা এখানে কেন? গৌরাঙ্গপদরজে দেশ পবিত্র হইলে ধীরে ধীরে তাঁহাদের জয় গাহিতে গাহিতে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইব বলিয়া কি এতদিন আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম?

যে দেশে শিক্ষার প্রভাবে শিশুগণের পর্যন্ত দেশের উপর মমতা ঘুচিয়া যায়, বিদ্যাভিমানী জ্ঞানী পর্যন্ত মুক্তির জন্য ঘাতকের দয়া প্রার্থী হইতে লজ্জা বোধ করে না—হায়, বিধাতার একি দারুণ বিদ্রূপ!—সেই দেশেই বেদ-বেদান্তের জন্ম, সেই দেশের লোকেই মানবাত্মাকে সর্বশক্তিমান বলিয়া স্থির করিয়াছিল, আর 'আত্মবশ' ও 'পরবশ' শব্দ সুখ ও দুঃখের সংজ্ঞা রূপে ব্যবহার করিত। বুঝিলাম, পূর্বপুরুষের সাধনালব্ধ ধন দেড় শত বৎসরের গোলামীর দায়ে বিকাইয়া গিয়াছে।

আর না হবেই বা কেন?

একখানি শিশুপাঠ পুস্তক খুলিয়া দেখিলাম তাহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের রাজভক্তির বন্যা ছুটিয়াছে, এবং এক পৃষ্ঠায় রাজারাণীর যথাবিধি প্যাণ্টালুন ও গাউন পরা ছবির পার্শ্বে লেখা আছে "তোমরা ত দেবদেবী, কলিযুগের রামসীতা"।

হা রাম! হা সীতা! আকাশে কি বজ্র নাই? অন্যান্য দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিবার একবার ইচ্ছা হইল। একখানি ফরাসী শিশুপাঠ খুলিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম ছত্র দেখিলাম—"La france est unpays libre" (ফ্রান্স

একটি স্বাধীন দেশ,) ফরাসী বালক তাহার দেশ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম কথা এই জানিল যে, তাহার দেশ এক স্বাধীন দেশ! সৌভাগ্য-গর্বে তাহার বুক দশ হাত হইয়া উঠিল, চক্ষে তাহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিল। সে তাহার La Bello Franceকে (মনোমোহিনী ফ্রান্স) প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে শিখিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রুসীয়েরা ফরাসী দেশে আসিয়া যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার প্রত্যেক কাহিনী ফরাসী জাতির শিশুপাঠ্য পুস্তকে অশ্রুসিক্ত অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকে, সেই জন্য Alsace Lorraine এর দিকে তাকাইলে ফরাসী বালকের ধমনীতে বিদ্যুৎ ছুটিয়া যায়।

আর আমরা?—ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক গৌরচন্দ্রিকা করিলেন—"Special care has been taken to instil into the minds of young readers a love and respect for the established government, so that they may grow up into loyal citizens." (A. C. Mukerjee's Hist. of India—Preface.)

"এই পুস্তক পাঠে যাহাতে লোক রাজভক্ত প্রজা হইতে শিখে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে প্রেম ও ভক্তি করে তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে।" যিনি ঐতিহাসিক তিনি সত্য নির্ধারণ করিবেন, তাঁহার loyal citizen গড়িবার জন্য এ বিকারগ্রস্তের উৎকণ্ঠা আসিল কেন? Love আর Respect কি ফরমাইস মত গড়িয়া লওয়া চলে? যাই হো'ক, বালকবৃন্দ যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিদ্যার ভারে আক্রান্ত হইয়া "কুব্জ পৃষ্ঠ নুব্জ দেহ" লইয়া সারি সারি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তখন তাহারা জানিয়া রাখে যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিতে প্রধানতঃ আলেকজণ্ডারের দিগ্বিজয়, সেলিম সাহের নুরজাহান, সিরাজদ্দৌলার অন্ধকূপ ও ক্লাইভের পলাসী মাত্র বুঝায়। আর বাকি যা কিছু তাহার মধ্যে রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র (Glorious Proclamation) ব্যতীত আর সমস্ত না হইলেও চলিত!

স্বদেশের অতীত যাহাদের নিকট এইরূপ ধূমাচ্ছন্ন, যাহাদের আত্মশক্তি-জ্ঞান জাগিবার কখনও অবসর পাইল না, তাহারা যে পরপ্রসাদলভ্য স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য গোটা দুই বক্তৃতা করিয়াই স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যের চরম হইয়া গেল মনে করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? হায়, মহারাণীর

ঘোষণাপত্র! তুমি জগতের সমক্ষে আমাদের নির্বুদ্ধিতা ও গোলামীর কতই না ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছে!

কিন্তু আর এ ইংরাজ ওঝার সাপের সম্মোহন মন্ত্র কত দিন চলিবে? আপনার ধন তস্করকে বিলাইয়া লোকে আর কত দিন আত্মপ্রবঞ্চনা করিবে?

ভুবনমনোমোহিনী জন্মভূমি আমার! আর কতদিন পরে তুমি আত্ম-মহিমা প্রকাশ করিবে? হৃতসর্বস্বা নগ্নদেহা জননি! আর কত দিন পরে রাজেশ্বরী মূর্তিতে দেখা দিবে।

খাদ্য ও খাদক*

"ভক্ষ্যভক্ষকয়োঃ প্রীতির্বিপত্তেঃ কারণং মতম্‌"

পণ্ডিতগণ বলেন যে ভক্ষ্য ভক্ষকের মধ্যে প্রীতি বিপদেরই সৃষ্টি করে। ভারতে ইংরাজ আগমনের পর হইতে আজ পর্যন্ত এই বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে। যে দিন বাঙ্গালী বিদেশীর সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সাধ করিয়া গলায় ফাঁসি পরিয়াছিল, সেদিন খাদ্যখাদক সম্বন্ধ তাহাদের নয়নগোচর হয় নাই। তাহাদের অযথা উদারতা দৈন্যের নামান্তর মাত্র। কিন্তু আজও কি আমরা সেই সহৃদয় আমেরিকাবাসীর বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই?—"Called by its right name what is the treatment of India by England? It is national parasitism It is the stronger nation sucking the blood of the weaker". (J. T. Sunderland in the *New England Magazine*)

অর্থাৎ "ইংলণ্ড ভারতের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে তাহাকে প্রকৃত

* 'যুগান্তর,' ২৪শে আষাঢ়, ১৩১৩

ভাবে কি নামে অভিহিত করা যায়? বৃক্ষ যেরূপ কীটের দ্বারা বিনষ্ট হয়, সমগ্র দেশ সেইরূপ ইংরাজকীটের উদরপূরণের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। প্রবল দুর্বলের রক্তশোষণ করিতেছে।"

যে খাদকের উদরপূরণার্থ প্রতি বৎসর ৪৫ কোটী মুদ্রাসহ লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতবর্ষ হইতে অপসারিত হইতেছে, তাহার সহিত গলা জড়াইয়া প্রেম করা কেমন দেখায়!! অথচ বাঙ্গলা দেশে এমন ব্যক্তি এখনও অনেক আছেন, যাহারা কোথাও রাজদ্রোহসূচক বাক্য বা কার্যের সম্ভাবনা দেখিলে চক্ষু ভ্রূমধ্যে আকৃষ্ট করিয়া, বদনবিবর আলম্বিত করিয়া বিস্ময় ও ভয়ের অভিনয় করিয়া থাকেন। খাদ্য ও খাদকের কি সুন্দর প্রীতি!

* * "বঙ্গদেশের লোক সংখ্যার বৃদ্ধির হারও বিগত ত্রিশ বৎসরে অনেক কমিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বৃদ্ধির পরিমাণ, প্রথম দশ বৎসরে ১১||০ জন, পরবর্তী দশ বৎসরে ৭|০ জন ছিল। শেষ দশ বৎসরে উহা ৫ জনে পরিণত হইয়াছে; অর্থাৎ বঙ্গদেশে ত্রিশ বৎসরে বৃদ্ধির হার অর্ধেক কমিয়াছে" (দেশের কথা)। আবার যাঁহারা খাদক, তাঁহারা ভোজনের সময় আত্মহারা হইয়া যান, কত খাইতে পারিবেন তাহার হিসাব থাকে না; যথা—"ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৮৮৪ খৃঃ অনুমান করিয়াছিলেন বৃটিশ ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে প্রতি বৎসর গড়ে প্রতি সহস্রে ১০ হইতে ১৫ জন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। * * "এতদনুসারে ১৯০১ সালের লোক-গণনায় বৃটিশ ভারতীয় অধিবাসীর সংখ্যা ২৮ কোটী ২১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮৮৬ হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা হয় নাই, তদপেক্ষা ৫ কোটী ১০ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭৫৪ কম হইয়াছে" (দেশের কথা)। আমাদের দেশে যাঁহারা "বিধিসঙ্গত রূপ (constitutional) বিশেষণকে লইয়া কেবলই নাড়াচাড়া করিয়া থাকেন, খাদ্য হইয়াও খাদকের প্রতি তাহারা এক অদ্ভুত প্রীতির পরিচয় দিয়া থাকেন। খাদ্যকে সুচারুরূপে, চক্ষুলজ্জা রক্ষা করিয়া, সুরুচিমার্জিত বিধানে উদরসাৎ করিবার জন্য খাদক যদি কতকগুলি বিধিনিয়মাদির সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সেই বিধিনিয়মাদির প্রতি ঘৃণা পোষণ করাই কি খাদ্যের স্বধর্ম নহে? সাণ্ডারল্যাণ্ড মহোদয় আমেরিকা হইতে কি বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া দেখা আবশ্যক:—

"We denounce ancient Rome for impoverishing Gaul and Egypt

and Sicily and Palestine and her other provinces, by draining away her wealth to enrich herself. We denounce Spain for robbing the New World in the same way. But England is doing exactly the same thing in India and on a much larger scale, only she is doing it skilfully, adroitly and by modern and enlightened modes of procedure, under business and judicial forms, and with so many pretences of governing India for her advantage and enriching her by civilised methods that the world has been largely blinded to what has been really going on"—গল, ইজিপ্ট, সিসিলি ও প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশের অর্থ শোষণ করিয়া উহাদিগকে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত করিয়া আপনাকে ধনশালী করিয়াছিল বলিয়া আমরা প্রাচীন রোমের বিরুদ্ধে দোষারোপ করি। সেইরূপ নিষ্ঠুরভাবে প্রাচীন আমেরিকার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল বলিয়া আমরা স্পেনের বিরুদ্ধে ঘোর অভিযোগ আনয়ন করি। কিন্তু আজ ইংরাজ ভারতে ঠিক সেইরূপ কার্যে আরও বৃহত্তর পরিমাণে ব্যাপৃত হইয়াছে। কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে ইংরাজ এই পৈশাচিক ব্যাপারে (hideous business) এমন সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছে যাহা আধুনিক সভ্যতা-দ্বারা সুসংস্কৃত,—যাহাদিগকে শাসনকার্য সম্পন্ন করিবার রীতিনীতি বলা হইয়াছে এবং 'ভারতের সুবিধার জন্য ও সভ্য জগতের কর্মনীতির দ্বারা উহাকে সম্পদ্‌শালী করিবার জন্য আমরা ভারতকে শাসন করিতেছি' এই অজুহাত এমনভাবে ইংরাজ জগতের সমক্ষে ধারণ করিয়াছে যে জগৎ অনেকটা তাহার প্রকৃত কার্যের প্রতি অন্ধ হইয়া আছে।"

যাঁহারা "বিধিসঙ্গত" উপায়ে ভারতের কল্যাণ সাধন করিতে অগ্রসর হন, তাঁহারা ঘোর অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেন। ঐ বিশেষণের কোন উল্লেখ না করাই তাঁহাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল। "বিধি"—শব্দ উচ্চারিত হওয়া মাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিরসে গদ্‌গদ্ হইয়া দণ্ডায়মান হইলে চলিবে না, প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে বিধির বিধাতা কে। এই ব্রহ্মাণ্ডে এমন বিধাতাপুরুষ অনেক থাকিতে পারেন, যাঁহাদের বিধানকে মান্য করা ও ভগবানকে অবমাননা করা একই অনুষ্ঠান! যাঁহারা দুর্বলের স্বাধীনতা

হরণ করিয়া তাহাদের রক্ত শোষণ করে, তাহাদের বিধানকে স্বীকার করিলে তাহাদের পাপভাগী হইতে হয়।

"বিদ্ধো ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মেণ সভা যত্রোপপদ্যতে।
ন চাস্য শল্য কৃন্তন্তি বিদ্ধাংস্তত্র সভাসদঃ॥
অর্দ্ধং হরতি বৈ শ্রেষ্ঠঃ পাদো ভবতি কর্ত্তৃষু।
পাদশ্চৈব সভাসৎসু যে ন নিন্দন্তি নিন্দিতম্॥"
মহাভারত, সভাপর্ব।

অধর্ম্মের প্রতিকার করা দূরে থাকুক যাহারা অধর্মকে স্বীকার করিয়া লন, তাহারা ভগবদ্বিরোধী। নীচ স্বার্থ অপেক্ষা ভারতের কল্যাণ কামনা ইংরাজের মনে কখনও কি বলবতী হইয়াছিল? ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণাপত্র যাহাদের বেদ, যাহারা সেই বেদের অভ্রান্ততার উপর ত্রিশ কোটী পুত্র সমন্বিতা সভ্য জগতের ধাত্রীস্বরূপিণী ভারত জননীর জীবনমৃত্যুকে সংস্থাপিত করিতে প্রয়াসী, তাহারা সেই ঘোষণাপত্রের প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন কি? যদ্যপি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, সেই ঘোষণাপত্রে যাহা লিখিত হইল তাহাতে তৎকালীন ইংরাজ কর্তৃপক্ষদিগের সম্মতি ছিল, তাহা হইলেও ইহা বুঝা নিতান্তই সহজ যে, সেই সম্মতি একেবারেই কৃত্রিম। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আইন ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণাপত্রকে পরবর্তী ইংরাজ কর্তৃপক্ষরাই প্রকাশ্যভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। লর্ড লিটন বলিয়াছেন যে যখন ঐ আইন প্রস্তুত করা হইল তখন হইতেই উহাকে ফাঁকি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। লর্ড কার্জন স্পষ্টই সমস্ত ইংরাজ ও ভারতবাসীর সমক্ষে ঐ আইনকে impossible charter বা অসম্ভব সনন্দ বলিয়াছেন। লর্ড সলস্‌বরি উহাকে political hypocrisy বা "রাজনীতিক কপটতা" বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। যদি কোন দুর্বৃত্ত বিলাসী যুবক হঠাৎ এক অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হয়, তবে তাহার ভাগ্যদেবতার প্রসন্নভাব অনুভব করিয়া প্রজাপালন সম্বন্ধে তাহার মনে সদিচ্ছার উদ্রেক হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে; কিন্তু সে, হঠাৎ ভাগ্য-পরিবর্তনের সময় যে সমস্ত সৎসংকল্প করিয়া থাকে তাহার অভ্যাসগত দোষ সকল প্রকটিত হইতে আরম্ভ হইলে সেই সংকল্পগুলির কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। ইংরাজের ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সংকল্প সম্বন্ধেও এইরূপ দশা

ঘটিয়াছে এখন উহারা নিজেই ঐ সংকল্পকে কপটতামূলক অসম্ভব সংকল্প বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে। ঐ সংকল্পকে কেবলই অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া ইংরাজের কৃপার উপর উচ্চকণ্ঠে ক্রমাগত দাবী করিয়া আমরা আমাদের দৈন্য, সহায়হীনতা ও দুর্বলতাকে নিয়তই প্রশ্রয় দিতেছি।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের আইনকে ইংরাজই যখন প্রকাশ্যে বিধি বলিয়া মানিতে অস্বীকার করিতেছে, তখন ভারতবাসী কেন যে "বিধিসঙ্গত" "বিধিসঙ্গত" বলিয়া ক্ষিপ্তের মত আচরণ করে ইহা বুঝা বড় কঠিন নহে।

শুনা যায় যে যাহারা অনেক কাল পল্টনভুক্ত হইয়া সৈনিকের কার্য করে, সেনানায়কের আদেশ প্রাপ্তিমাত্রে কুচকাওয়াজ সংক্রান্ত গতিবিধির অভিনয় করা তাহাদের এমনিই অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, যে বৃদ্ধ বয়সে পল্টন হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও সেনানায়কের অনুকরণে কোন আদেশ বাক্য তাহাদের গোচরে উচ্চারিত হওয়া মাত্র তাহারা পূর্বাভ্যাস মত কুচ করিয়া থাকে; যেন ইহাদের শরীরে মাংসপেশী শিরা প্রভৃতি আপনা হইতেই সৈনিকের ইচ্ছানিরপেক্ষ হইয়াই নায়কের আদেশবাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। আইনের দাসত্ব করিতে করিতে আমাদের দেশেও অধিকাংশ লোক, স্বাধীন ইচ্ছা বা সংকল্পের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। যাহা আইনসঙ্গত তাহার সহিত বিরোধ করা আমাদের পক্ষে যেন অপ্রাকৃতিক। যাহা একবার আইন হইয়া গিয়াছে, তাহার দাসত্বই যেন আমাদের মজ্জাগত। লর্ড কার্জন কি ভুল বুঝিয়াছিলেন? বঙ্গব্যবচ্ছেদকে আইনে পরিণত করিতে তিনি অত ব্যস্ত হইয়াছিলেন কেন? আমাদের স্বভাব বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই ত।

এই মহৎ রোগের একমাত্র প্রতীকার আমাদের খাদ্যখাদক সম্বন্ধকে সর্বদা স্মরণ করা। "ভক্ষ্যভক্ষকয়োঃ প্রীতির্বিপত্তেঃ কারণং মতম্ এই উপদেশ বাক্য সর্বদা ধ্যান করিতে হইবে এবং হৃদয় হইতে সখ্য বা সন্ধির ভাব সর্বদাই বিদূরিত করিয়া বিরোধের ভাব জাগ্রত রাখিতে হইবে। ভগবানের রাজ্যে দুইটী সৃষ্টজীবের মধ্যে বিরোধ যখন অবশ্যম্ভাবী ও উভয়েরই পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তখন বিরোধকে অবহেলা করা মহাপাপ তখন মোহপরবশ হইয়া এক অবাস্তব উদারতার আদর্শকে আঁকড়িয়া ধরিলে

ভগবদ্‌ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করা হয় এবং অমঙ্গলকে বলবত্তর করা হয়।

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।"

হে অর্জুন ক্লীবের মত আচরণ করিও না, উহা কখনই তোমার উপযুক্ত নহে! হৃদয়ের তুচ্ছ কাতরভাব পরিত্যাগ করিয়া শত্রুনিপীড়করূপে যুদ্ধার্থে উত্থান কর।

রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি

দীর্ঘকালব্যাপী অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বঙ্গদেশে অনেকে ধারণা করিতে পারে নাই যে, বর্তমানে রাজনীতিক ভিক্ষাবৃত্তি দেশের কি অনিষ্ট করিয়াছে ও ভবিষ্যতে করিবে। তাঁহারা বলেন, "ইহাকে ভিক্ষা বলা অন্যায়, আমরা রাজপুরুষদিগের কাছে যাহা আমাদের ন্যায্য দাবী তাহাই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করি মাত্র। ন্যায়ের জয় জগতের মূল নিয়ম। রাজপুরুষেরা আমাদের আবেদন শুনিতে বাধ্য, ভারতে রাজপুরুষগণ যদি না শুনেন, অন্ততঃ ন্যায়-পরায়ণ ইংরাজ জাতি একদিন আমাদিগকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিবেই দিবে।" ইহা পুরাতন গৎ,—আশী বৎসর ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি: রাজদ্বারে ভিক্ষা করিতে করিতে মনুষ্যত্ব খর্ব হইয়া গেল, কই সে দিন ত কাছে আসিতেছে না। রাজপুরুষেরা আবেদন নিবেদন শোনা দূরে থাক, বরং উত্তরোত্তর আরও বধির হইতেছেন, এবং ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ জাতিও কোন প্রকৃত অধিকার দিতে অগ্রসর হইতেছে

না। প্রাচীনেরা কিন্তু বলেন ধৈর্য ধর, যেমন পরমেশ্বর তর্কাতীত ও অদৃষ্টিগোচর, তথাপি তুমি তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস কর, তেমনি এই অতর্ক্যং অদৃশ্যং বৃটিশন্যায়পরায়ণতায় আস্থাবান হও। কথা আছে, 'Rome was not built in a day'; কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে বহু শতাব্দী ধরিয়া হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিলে তবেই ফলপ্রাপ্তির আশা হয়; তুমি না দেখিলেও তোমার পৌত্র-প্রপৌত্র তোমার পরিশ্রমের একটু সুফল দেখিলেও দেখিতে পারে। ভাই, কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা যে ভিক্ষাবৃত্তি করিতে করিতে কাঙ্গাল হইয়া গেলাম, বৎসরে বৎসরে সহস্র সহস্র ভারতবাসী অন্নাভাবে মারা যাইতেছে, সে অবস্থাও কি বহুশতাব্দী ধরিয়া টিকিবে? আমাদের পূর্বসঞ্চিত ব্রহ্মতেজ, ক্ষাত্রতেজ, বৈশ্যদক্ষতা, আমাদের বল, উদ্যম, আশা, সাহস মনুষ্যত্বের যত লক্ষণ ছিল সবই হ্রাস পাইতেছে, সবই ধ্বংসের দিকে সবেগে চলিতেছে। তোমরা পরের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছ, এদিকে তোমাদের ঘরের আগুন যে নিভিয়া গেল?

আমাদের ন্যায্য দাবীই বটে! জাতীয় মহাসমিতি রাজদ্বারে যে আশাগুলি নিবেদন করেন, সবই যে ন্যায়সঙ্গত দাবী তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু জাতীয় মহাসমিতির আবেদনগুলিতেই আমাদের ন্যায্য দাবী সীমাবদ্ধ কি? আমরা রাজপুরুষদিগের নিকট এ আশাও নিবেদন করিতে পারি না কি যে, "হে রাজপুরুষগণ! তোমরা তোমাদের দেশে ফিরিয়া যাও, ভারতবর্ষ আমাদের দেশ, আমরাই শাসন করিব, ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্য, তোমাদের জন্য নহে।" ইহা যদি বলি তাহা হইলে কি নিতান্ত অন্যায় কথা বলা হইল? "আমাদের দেশ আমরাই শাসন করিব। ভারতবর্ষে ভারতবাসীই রাজ্য, সুখ, ধনবৃদ্ধি, আত্মসুখ উপলব্ধি করিবে।" ইহা হইতে আর ন্যায্য দাবী কি হইতে পারে? কিন্তু আজকাল কোন্ মূর্খ আর বিশ্বাস করে যে, ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ জাতি কস্মিন কালেও এ কথাকে মনে স্থান দিবে? উহারা শুনিবেন কেন? ভারতবর্ষ শাসনে উহাদের বিশেষ লাভ, ভারতবর্ষ ত্যাগে উহাদের অশেষ ক্ষতি। উঁহারা দেবতা নয়, অতি সামান্য মানুষ মাত্র। ন্যায়ের খাতিরে নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করিতে যাইবেন কেন? আমরা বলি "আমরা দেশীয় লোক, অধিকাংশ বড় বড় পদ আমাদের হওয়া উচিত"; "দাবীটি" ন্যায়সঙ্গত বটে,

কিন্তু ইংরাজ শুনিবে কেন, নিজের পুত্র-পৌত্রদিগের অন্ন মারিতে? আমরা বলি "আমরা পুরস্বত্ব হারাইতেছি, অস্ত্র আইন রদ কর, কিন্তু ইংরাজ শুনিবে কেন? ভারতবাসীকে সবল করিয়া নিজের প্রাধান্য-ধ্বংসের পথ সুগম করিতে? জাতির স্বার্থের কাছে ন্যায়ের যুক্তি টিকিতে পারে না। সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি-সমুদয়ের উপর ন্যায়ের দাবী চলে। ন্যায়ের প্রাবল্য সমাজের ভিত্তিস্বরূপ, কিন্তু জাতিতে জাতিতে ন্যায়ের দাবী চলে না। সে ক্ষেত্রে তরবারীর রায়ই বাহাল, সেখানে বলীয়ান যাহা বলে বলীয়ান যাহা করে তাহাই ন্যায়। সেদিন সমস্ত মানবজাতি লইয়া একটী মাত্র বৃহৎ সমাজ সংগঠিত হইবে, সেদিন আসিতে অনেক বিলম্ব আছে।

ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইংরাজ জাতি কি কপটতাপ্রিয় ও মিথ্যাবাদী? তাঁহারা ত চিরকাল ন্যায়ের কথা বলিয়া আসিতেছেন, বৃটিশসাম্রাজ্য ন্যায়ের উপর অধিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহারা গর্ব করেন। ইহার কারণ ন্যায় অন্যায়ের আধ্যাত্মিক (metaphysical) এবং ব্যবহারিক বলিয়া দুইটি স্বতন্ত্র হিসাব। আমি যদি আইন উল্লঙ্ঘন না করিয়া আদান প্রদানের সাধারণ পন্থায় পরের সর্বনাশ সাধন দ্বারা নিজেকে বড় করি, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক হিসাবে আমি ঘৃন্য ও পাপিষ্ঠ বটে; কিন্তু ব্যবহারিক হিসাবে আমার আচরণে কোনও দোষারোপ করা অসঙ্গত; কেননা সমাজ প্রত্যেককে স্বার্থসাধনার যে অধিকার দিয়াছে, আমি তাহাই ব্যবহারে নিয়োজিত করিলাম। রাজনীতিক ক্ষেত্রে ন্যায়ের এই ভেদ সচরাচর দেখা যায়। আধ্যাত্মিক হিসাবে স্বাধীনতায় মানবমাত্রেরই সম্পূর্ণ অধিকার। মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি, সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রধান তত্ত্ব স্বাধীনতা। মানুষ যতই স্বাধীন হয়, ততই উন্নত ব্রহ্মপ্রাপ্তিযোগ্য ও ভগবানের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়, আর যতই অধীন দাস গোলাম হয়, ততই পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। অতএব স্বাধীনতায় প্রত্যেক জাতির সম্পূর্ণ অধিকার আছে। প্রাণ বিনিময়ে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা মনুষ্য-মাত্রেরই প্রধান কর্তব্য। কিন্তু আবার ন্যায়ের ব্যবহারিক হিসাবে এ সকল যুক্তি খাটে না। সে হিসাবে সমাজের হিত এবং বলীয়ানের বল ব্যতীত আর কিছুই স্থান পায় না।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের নেতাগণ ন্যায়ের আধ্যাত্মিক হিসাবই দেখিতেন।

তাঁহারা মনুষ্যমাত্রের স্বভাবজাত সত্বগুলি লইয়াই মত্ত ছিলেন, ব্যবহারিক হিসাবের দিকে বড় নজর রাখিতেন না। তাঁহাদের এই আধ্যাত্মিক ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডেও অল্প পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইংরাজ উদারনীতি ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের অস্থায়ী সৃষ্টি। ইংরাজ জাতি চিরকাল ব্যবহারিক হিসাবই ভালবাসেন, আধ্যাত্মিক ভাব তাঁহাদের স্বভাববিরুদ্ধ; সেই জন্য উদারনীতির পূর্ণস্রোতে গা ঢালিতে পারেন না—স্বার্থকে বজায় রাখিতে কখনও ভুলেন না। স্বার্থহানির কোনও সম্ভাবনা না থাকিলে তাঁহারা অতিশয় উদার। দুর্ভিক্ষের সময়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাকে বাঁচাইতে তাঁহাদের অশেষ চেষ্টা এই ঔদার্য্যের সাক্ষী। কিন্তু দুর্ভিক্ষের মূলের সহিত তাঁহাদের স্বার্থ জড়িত, সুতরাং সে মূলের উচ্ছেদ করিতে তাঁহারা কখনও সম্মত হইবেন না। বিজিত জাতির হৃদয়ে মহাশক্তি নিহিত আছে, দলনে অত্যাচারে তাহা জাগিতে পারে, অতএব আমরা অত্যাচার করিব না—নিদ্রাভিভূতা দানবদলনীকে অল্প-স্বল্প ফুল, ধূপ ইত্যাদি উপহার দিব, মধুরমন্দ বীণানিক্কণ দ্বারা নিদ্রাকে ঘনীভূত করিব, আর নিরাপদে স্বার্থসাধন করিব—ইহাই ইংরাজের উদারনীতি। আজকাল তাহাও লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছে। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) বিজ্ঞানের সাহায্য দ্বারা পুষ্ট হইয়া উদারনীতিকে ডুবাইতেছে। ইংরাজ-নীতিবিদেরা বলেন "শক্তিহীন ন্যায় অন্যায়ের তুল্য অনিষ্টকর। ন্যায় ও শক্তি দুইটিতে জগতের শাসন কার্য করে বটে, কিন্তু যতদিন ন্যায় শাসন কার্য করিতে সমর্থ নহে, ততদিন একমাত্র শক্তিরই অধিকার। সে দিন ন্যায়ও শক্তিসমন্বিত হইয়া উঠিবে, সেইদিন তাহার নিজের স্বাভাবিক অধিকারও প্রাপ্ত হইবে।" আজকাল ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মুখে এই যুক্তি সময়ে অসময়ে শুনিতে হয়; যখনই আমরা কোন দাবী করিতে যাই তখনি তাঁহারা এই উত্তর প্রদান করেন। অধিকার প্রাপ্তির জন্য ভারত-বাসীর কোন আবেদন শুনিলেই তাঁহারা বলেন—"আবেদনটী যে নিতান্ত অসঙ্গত তাহা বলি না, কিন্তু তোমাদের এখনও সে শক্তি জন্মে নাই। এই অধিকারের মহৎ ভার বহিতে তোমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ। এইরূপ অধিকার লাভে তোমাদিগের অনিষ্ট ভিন্ন মঙ্গল ঘটিতে পারে না।" আমাদিগের পক্ষ হইতে ইহার উত্তর অতি সহজ, ক্ষেত্র না পাইলে শক্তির বিকাশ অতি

অসম্ভব। যে সামান্য শক্তি আছে তাহাও ক্ষেত্রের অভাবে লুপ্ত হইতে পারে। অধিকার পাইলে তবে সে অধিকারের সদ্ব্যবহার করিবার শক্তি আসিবে। রাজপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই স্বার্থে অন্ধ হইয়া ভারতবাসীর গুণ, ক্ষমতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। অনেকে নিজের যুক্তির অসারতা বুঝিতে পারেন; কিন্তু স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া সমস্ত জগৎকে এবং নিজের মনকে ঠকাইতে চাহেন। মিষ্টার থারবরণ ইংরাজ রাজনীতির মূলমন্ত্র অতিবিশদরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে an enlightened self-interest—সভ্যতানুমোদিত স্বার্থপরতা, ইহাই ইংরাজ-রাজনীতি। রুসের রাজনীতিও স্বার্থপরতাময়, কিন্তু উগ্রমূর্তি, সে নীতি অসভ্য ও নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করে; এই দুয়ের ইহাই প্রভেদ। আমরা এতদিন এই সৌম্যমূর্তি দেখিয়া ভুলিয়াছিলাম; এখন ভুল ভাঙ্গিতেছে, এখন বুঝা যাইতেছে যে, ইহাদের কাছে আবেদন নিবেদন করা একটা হাস্যকর প্রহসন মাত্র।

আসুরিক শক্তিসম্পন্ন বলিরাজা যখন ত্রিভুবন জয় করিয়াছিলেন তখন ছদ্মবেশধারী নারায়ণ তাহার সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া অতি সামান্য দান চাহিয়াছিলেন। বলিরাজা স্থূলবুদ্ধি; কুটিলনীতিবিদ্ মন্ত্রী শুক্রাচার্যের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া সেই সামান্য দান দিতে সহজেই সম্মত হন, সেই মূর্খতার ফল হইয়াছিল, বলির সাম্রাজ্য নাশ এবং পাতালে নির্বাসন। আজ ইংরাজ রাজপুরুষ আমাদিগকে মুষ্টি ভিক্ষাও দিতে পরাঙ্মুখ। তাঁহাদের মনের ভাব সহজেই বুঝা যায়, তাঁহারা বলিরাজার দশা স্মরণ করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অধিকার দিতেও ভয় করেন। কি জানি যদি এই দৈব-শক্তিসম্পন্ন ভিক্ষুক সামান্য সত্ত্ব লাভেও নিজের বিরাট স্বরূপ প্রকাশ করিয়া আকাশ পৃথিবী রসাতল ব্যাপ্ত করিয়া হিমাচল অবধি সাগর পর্য্যন্ত রত্নসম্ভবা ভারতভূমিকে হস্তগত করিয়া দণ্ডায়মান হয়। কর্জন সাহেব এই কুটিল-নীতির শুক্রাচার্য, তিনি পদচ্যুত হইলেও তাঁহার পরামর্শ অনুসারেই ইংরাজ জাতি চলিতে কৃতসংকল্প, এমন কি 'ন্যায়বান' জন মরলিও ভারতবাসীকে কোন প্রকৃত অধিকার দিতে কুণ্ঠিত। অতএব আমাদের বুঝা উচিত যে আমাদের ভিক্ষার পথ একেবারে বন্ধ, সে পথে যাইলে রুদ্ধ দ্বারের উপর মাথা ঠোকা ভিন্ন কোন লাভের আশা নাই। আমাদের নেতাগণ এই কথা বুঝিতে চাহেন না বলিয়া অনেকে তাঁহাদিগকে গালি দিতে বসিয়াছেন,

আমরা সে পথ অবলম্বন করিতে চাহি না। আমাদের নেতাগণ বিদ্বান লোক; তাঁহাদের বিদ্যা, বাগ্মিতা ও প্রতিভাগুণে আমরা গৌরবান্বিত, তাঁহারা দেশের জন্য বহু বৎসর ধরিয়া যে উদ্যম ও পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন, তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁহাদের রাজনীতিক আদর্শ আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। তাঁহারা বিদেশী গুরুর শিষ্য। তাঁহাদের রাজনীতি বিদ্যা ইংরাজ-প্রদত্ত, স্বতঃলব্ধ নহে, অনুভবের ফল নহে, গুরুর জাতি যে কখনও স্বেচ্ছাপূর্বক অন্যায় কার্য করিবে তাঁহারা ইহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাঁহারা ভাবেন "ইংলণ্ড সেই ইংলণ্ডই আছে, ইংরাজ জাতির যে মতিভ্রম হইয়াছে, তাহা শীঘ্রই অপসারিত হইবে। যে জাতি দাসত্ব প্রথা বন্ধ করিয়াছিল, যে জাতি বেণ্টিঙ্ক, ক্যানিং, রিপণকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিয়াছিল, সে জাতি কি আমাদের ন্যায়সঙ্গত আবেদন শুনিবে না? নিশ্চয় শুনিবে", এ ভ্রান্তি দূর হইবার নহে। সেই রুদ্ধদ্বারে সহস্রবার আঘাত পাইয়া রক্তাক্ত শির লইয়া ফিরিয়া আসিয়াও পরদিনই আবার তাহা ভুলিয়া যান, আবার রুদ্ধদ্বারের দিকে ছুটিয়া যান। তাঁহাদের এই আচরণ মনের ঔদার্য্য এবং প্রগাঢ় গুরুভক্তির পরিচায়ক বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। বঙ্গের নূতন যুগের প্রচণ্ড জাতীয়ভাব নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইতে পারে, স্বাধীনতা উদ্দেশ্যে নবোত্থিত ভারতের যে নারায়ণের ভুবনবিজয়ী ত্রিবিক্রমসম অপ্রতিহত গতি আরম্ভ হইয়াছিল, হয়ত তাহা একটী পঙ্গু বামনের হাস্যজনক ভগ্নগতিতে পরিণত হইবে। এই অবস্থায় নেতাদিগের বৃথা তিরস্কার না করিয়া দেশকে প্রকৃত পথ দেখানই সকলের উচিত। বঙ্গদেশে যিনি নির্ভীক, যিনি তেজস্বী, যিনি স্বাধীনচেতা তাঁহকেই সেই পথে আহ্বান করিতে হইবে। পরিশেষে প্রাচীন নেতাদিগের মধ্যে যাঁহারা সম্পূর্ণ দেশহিতৈষী তাঁহারা স্বয়ং আসিয়া জাতীয় সেনার সম্মুখভাগে শোভা পাইবেন।

ভিক্ষাবৃত্তি কখনও জাতীয় জীবনের পুষ্টিসাধন করে না। ভিক্ষালব্ধ সত্ত্ব দ্বারা কোন জাতি কখনও বলবান ও গৌরবান্বিত হয় নাই, বরং ক্ষীণ ও নীচ হইয়া যায়, গোলামীই মানুষকে পশু করিয়া তোলে। সুতরাং ভিক্ষাজীবী গোলামের দশা হইতে আর কি অবনতি হইতে পারে?

ভিক্ষালাভে অধীনজাতির অধীনতা অভ্যাস হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করে, ত্যাগ করা কঠিন হয়। অবশ্য বলবান ব্যক্তি ভিক্ষা করিলে সে ভিক্ষা দুর্বলতার লক্ষণ নহে, তাহাতে বিনয় ও নম্রতাই প্রকাশ পায়। জগৎপতি নারায়ণ অসুরের রাজসভায় ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যে শক্তির একটু অঙ্গুলি হেলনে বিশ্বচরাচর বিচূর্ণ বিনষ্ট হয় সে ভিক্ষার অন্তরালে সেই মহাশক্তি লুক্কায়িত ছিল। যেদিন আমরা জাতীয় শক্তির পূর্ণবিকাশ হৃদয়ে অনুভব করিব, সেদিন আমরা বুঝিব ত্রিশ কোটী ভারতসন্তানের সম্মিলিত শক্তি আমাদের শ্বাস নিশ্বাসে বহিয়া এক ফুৎকারে সমস্ত প্রতিবন্ধক উড়াইয়া দিতে পারে, সেইদিন বিনীতভাবে ভিক্ষুকবেশে রাজপুরুষের দ্বারে বামনের ন্যায় ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করায় লজ্জাবোধ হইবে না। যতকাল সেদিন না আসে ততকাল লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করিতে তাঁহাদের দ্বারদেশ মাড়াইব না। জগতের সম্মুখে হাস্যাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইতে সেদিকে অগ্রসর হইব না। সেদিন পর্যন্ত আমাদিগের এক মন্ত্র হউক শক্তিপূজা ও শক্তিবিকাশ, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

ইংলণ্ডের উদারনীতি ও আমাদের দেশ

ইংলণ্ডের উদারনীতিকদল রাজ্যশাসনের ক্ষমতা পাইলে এতদ্দেশের অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, যখন মিঃ মরলী এক্ষণে ভারতসচিবের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন বঙ্গবিভাগজনিত এই ঘোর অশান্তির নিরাকরণ তিনি অবশ্যই করিবেন। এদেশের অনেকে নাকি তাহার সূচনাও দেখিয়াছিলেন, এবং দৃঢ় আশাও করিয়াছিলেন যে, মিঃ মরলী শান্তি আনয়ন করিবার জন্য কোন উপায় স্থির না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। বঙ্গদেশ

হইতে কত আবেদন নিবেদন মিঃ মরলীর পদতলে পৌঁছিয়াছিল তাহা মনুষ্যের বর্ণনাতীত। ইংলণ্ডে মিঃ ওয়েডারবরণ, মিঃ স্টেড, মিঃ কটন প্রভৃতি মহোদয়গণ বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য মিঃ মরলীর কত সাধ্য সাধনা করিয়াছিলেন।

মিঃ স্টেড নিজের Review of Reviews নামক পত্রিকায় মরলীকে স্পষ্টভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করেন যে, যাহা একবার হইয়াছে তাহা পুনরায় নামঞ্জুর করা রাজনীতি অনুমোদিত নহে, এইরূপ ভাবিয়া যদি মিঃ মরলী বাঙ্গলা পূর্বের ন্যায় এক না করেন, তাহা হইলে ইহা তাঁহার জীবনের একটী ঘোরতর ভুল হইবে। কেবল তাহাই নহে Land League-এর (আয়র্লণ্ড সংক্রান্ত) সময়ে মিঃ ফষ্টরকে যত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার শতগুণ তাঁহাকে সহ্য করিতে হইবে।

কিন্তু এই সকল আবেদন নিবেদন মূল্যহীন বিবেচনা করিয়া উদারবাদী মিঃ মরলী বঙ্গবিভাগ কিরূপে সুদৃঢ় করিলেন, তাহা এখন সর্বজনবিশ্রুত।

সর্বপ্রধান উদারমতবাদী মিঃ মরলী বঙ্গ বিভাগ রদ করিলেন না কেন? ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, উদারবাদীদের হস্তে আমাদের দেশের কণাংশও হিতসাধিত হইবে না; একথা অনেক লোক বহুকাল ধরিয়াই বলিয়া আসিতেছেন, কিন্তু স্পষ্ট কথা এই যে—এদেশে অনেকে একথা বুঝেন না, বা বুঝিতে চান না ইহা বড় দুঃখের বিষয়। আমাদের মধ্যে অনেকের এই স্থির ধারণা ও দৃঢ় আশা আছে যে উদারমতবাদীদিগের হস্ত হইতে ভারতের বড় বড় রাজনৈতিক স্বত্বলাভ হইবে; কিন্তু এ আশা বড়ই ভ্রমাত্মক ও অজ্ঞানমূলক, তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। উদারমতবাদীদিগের দ্বারায় ভারতের যে কোন কল্যাণই হইবে না, ইহা যে কেবল আমাদিগের ধারণা তাহা নহে।

আয়র্লণ্ডেরও তাহাই বিশ্বাস। আয়র্লণ্ডের "United Irishman" নামক একটী সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, "What the Indian people must realize is that whether the man named to rule over them from London is called Radical, Liberal or Conservative is first and always English" অর্থাৎ লণ্ডন হইতে যে ব্যক্তি ভারতবাসীদের উপর শাসন করিতে প্রেরিত হইবে, সে র‍্যাডিকাল, বা উদারমতবাদী বা সংরক্ষক

যাহাই হউক, সর্বাগ্রে সে ইংরাজ এই কথা ভারতবাসীদের নিয়তই স্মরণ রাখা উচিত। নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ 'গেলিক আমেরিকান' পত্র লিখিয়াছে যে, "The people of India will be sadly mistaken if they think that the system on which they have been governed by Great Britain since 1857 is going to be changed in consequence of the accession of the Liberal party to power" অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃঃ হইতে ইংলণ্ড যে নীতিতে ভারত শাসন করিতেছে, উদারনীতিকদের হস্তে আজ ক্ষমতা আসিয়াছে বলিয়া তাহা যে বদলাইবে, এ আশা যদি ভারতবাসীরা হৃদয়ে পোষণ করেন, তবে তাঁহারা অত্যন্ত ভ্রান্ত হইয়াছেন বলিতে হইবে।

আইরিশদিগের এই মত। তাঁহারা বহুশতাব্দী ধরিয়া ইংরাজ শাসনাধীনে থাকিয়া হাড়ে হাড়ে তাহাদের রাজনীতির চাতুরী বুঝিয়াছেন।

আর আমাদের দেশের লোকেরা ইংলণ্ডের সব রাজনীতিকদলেরই ত ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন। কেহই ত প্রসন্ন হইলেন না। আবেদন নিবেদনের চূড়ান্ত হইয়াছে, এখনও হইতেছে; আবেদনকারীদের অসীম ধৈর্য দেখিয়া চমকিত হইতে হয়। কিন্তু একবার আইরিশদের এই কথাটি মনে রাখিলে সব গোল চুকিয়া যায় যে "ভবি ভুলবার নয়", ইংরাজ রাজনীতিকেরা যে দলেরই হউন তাঁহারা ইংরাজ, স্বীয় স্বার্থের জন্য ভারত শাসন করিতেছেন। সেই স্বার্থহানি কোন ইংরাজই করিবে না।



যুবক শক্তিই জাতীয় বল

বঙ্কিম বাবু অনুশীলনের কথা বলিয়াছেন ; এই অনুশীলন-তত্ত্বের দুইটি দিক আছে। যতটুকু অনুশীলনকে পরিণত বা সম্পূর্ণ বলি, মানব মনের বহির্বৃত্তি ও অন্তর্বৃত্তির যে পরিমাণ স্ফূর্তি ঘটিলে মানুষ দেবত্ব পায়, সেই পরিমাণ অনুশীলন দুইভাবে হয়, ইহার কতকটা হয় প্রয়াস বা চেষ্টার দ্বারা এবং কতকটা আপনি স্বভাবতঃ ঘটনার আনুকুল্যে ও নৈসর্গিক নিয়মে পুষ্পের ন্যায় ফুটিয়া উঠে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও জরা এই চারিটি অবস্থার মধ্য দিয়া এই স্বভাবজ অনুশীলন ক্রিয়া চলিতেছে, এই বৃত্তি স্ফূর্তির গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল, যৌবনে এই অনুশীলন নদীতে আশ্বিনে বান ডাকে, তখন তাহার গতি অপ্রতিহতা ও দুর্দমনীয়া। এই জন্য কবি-মুখে যৌবনের এত সুখ্যাতি, এত সমাদর।

যখন মনের ও দেহের বৃত্তিগুলি বসন্ত স্পর্শে মালঞ্চের মত ফুটিতেছে, সেই কৈশোর ও প্রৌঢ়তার সন্ধি সময়ে লোকে গুণে দোষে মানুষ হয়, বড় হয়, আত্ম-অনুশীলনের পরাকাষ্ঠা দেখায়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন, যুবার মধ্যে নারারণ আছেন। কথাটি বড় 'খাটি' ; যুবক যতক্ষণ সংসারের স্বার্থপঙ্কে নামে নাই, ততক্ষণ তাহার মধ্যে সাহস, সত্যপ্রিয়তা, ভক্তি, দয়া. বীর্য, আত্মসম্মানজ্ঞান ও উৎসাহ প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি প্রবলা থাকে ; তাই প্রতি যুবক নারায়ণের মন্দির, প্রতি যুবক অনন্তগুণে গুণী শ্রীহরির পীঠভূমি ও অধর্মনাশিনী দৈত্যদলনী শক্তির বরপুত্র।

যৌবনেই যদি মানবত্বের পরাকাষ্ঠা ও দেবত্বের উন্মেষ হয়, তাহা হইলে তরুণ যুবক সম্প্রদায়ই কোনও জাতি বা মহাদেশের প্রকৃত শক্তি। ইতিহাসেও তাহাই দেখি, ইতালি বল, ফ্রান্স বল, জার্মানী বা আমেরিকা বল কোথায় দেশ-রক্ষা মহাযজ্ঞের ঋত্বিক যুব ব্যতীত বৃদ্ধ হইয়াছে? উৎপীড়কের যমদণ্ডের মুখে বুক পাতিয়া নিজ রক্তে ধর্মের বোধন ব্যতীত ও দেশ-ধর্মের পালন যুবক ব্যতীত কে কবে করিয়াছে বল? যে দেশই উৎপীড়িত, পরপদদলিত পরতন্ত্রতা নিগড়ে নিগড়িত, সেই দেশেই অধর্ম

উৎপীড়নের বা মন্দের নাশ সাধন করিয়া যুবক সম্প্রদায়ই নূতন জাতীয়তা বা সাম্রাজ্যের স্রষ্টা হইয়াছে। নব ইতালিকে রাজনীতি কুশলী কাভুর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পূর্বে ম্যাজিনি ও গারিবল্ডির নেতৃত্বে কত সহস্র যুবক দেহের রক্তে অস্ট্রিয়ার রাক্ষসী শক্তির ধ্বংস সাধন করিয়াছিল! ফ্রান্সেও তাহাই, আমেরিকায়ও তাহাই, এমন কি এসিয়ার বালসূর্য্য জাপানেও তাহাই ঘটিয়াছিল—যুবক মণ্ডলীই নব নব রাষ্ট্র শক্তির রচয়িতা, যুবক বাহিনীই নারায়ণের সাধুত্রাতা দুষ্কৃত নিসূদন নৃসিংহ, বরাহ বা কল্কিঅবতার—ভগবান কারণ, যুবকই নিমিত্ত, ত্রিশকোটী অংশসম্ভূতা শক্তিই ভবানী ভারতী, এবং যুবকদল মার অনন্ত বাহু অগণ্য তেজোদীপ্ত অস্ত্রনিচয়। পুনার তেজস্বী সংবাদ পত্র "বিহারী" "বিদ্যার্থী ও স্বদেশী আন্দোলন" শীর্ষক প্রবন্ধে এই কথাই বলিয়াছেন। জাপানের ডাক্তার মতোদা বলিয়াছেন, "যুবকগণের জীবনব্রত বর্তমানে এবং লক্ষ্য ভবিষ্যতে।" বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় চিরকালই অতীতের দাস সে পরিবর্ত্তনে ভীত হয়, চিরাভ্যস্ত পথ ছাড়িয়া বন কাটিয়া নূতন রাজপথের সৃষ্টি করিতে যাইয়া তাহার জরাক্ষীণ হস্ত কাঁপিয়া যায়, লক্ষ্য ভেদ করিতে হইলে যুবকই আমোঘ বাণ, ধনুত্যক্ত হইলে লক্ষ্যছেদ না করিয়া ফিরিতে জানে না। এই যুবক মণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করিয়া মহাপ্রাণ ধর্মবীর বিবেকানন্দ স্বামী বলিয়াছেন,—"Young men of Bengal, your country requires it. The world requires it. Call up the divinity within you, which will enable you to bear hunger, thirst, heat and cold. Lay down your comforts, your pleasures, your names, fame or position, nay, even, your lives. Do not care under what banner you march. Ours is to work. One vision I see clear as life before me, that the ancient mother has awakened once more sitting on her throne, rejuvenated more glorious than ever." "হে বঙ্গদেশের যুবক সম্প্রদায়, তোমার স্বদেশ ইহাই চায়। বিশ্বজগৎ ইহাই প্রার্থনা করে। যে দেবত্ব তোমাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি দিবে, তোমাদের অন্তরস্থ সেই দেবত্ব জাগাও। নিজ নিজ আরাম, সুখ যশ, কীর্তি পদগৌরব এমন কি প্রাণ

পর্যন্ত বিসর্জন দাও। কবে কাহার ধ্বজের নেতৃত্বাধীনে সমর যাত্রা করিতেছি তাহাতে বড় আসিয়া যায় না। কর্মই আমাদের ব্রত। আমি ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে কি উজ্জ্বল স্বপ্নই দেখিতেছি, আমাদের যুগযুগান্তরের মা জাগিয়াছেন, মা আজ সিংহাসনাসীনা, নবপ্রাণে অনুপ্রাণিতা, যশঃজ্যোতিতে পরম জ্যোতির্ময়ী। বঙ্গের যুবকগণের জন্য স্বামী পথ দেখাইয়া গিয়াছেন,— "Be and make" "নিজে বড় হও এবং (দেশ, জাতীয় গৌরব, ধর্ম জীবনের) সৃষ্টি কর।"

এই মঙ্গলদায়িনী দৈত্যদর্পঘ্না যুবক শক্তির বিকাশ করিতে ইউরোপে কিরূপ চেষ্টা হয়, তাহা স্বদেশ প্রেমিক লালা লাজপৎ রায় বলিয়াছেন,— "The west is a devotee of freedom. They have sucked freedom with their mothers' milk. I was surprised to find that children are taught in their primary schools a book entitled "Struggle against Monarchy." The are taught how are freedom and liberty to be obtained and how to be kept." "পাশ্চাত্যদেশ স্বাধীনতার সাধক মহাঋষি মাতৃস্তন্যের সহিত স্বাধীনতা মন্ত্র পান করিয়া পুষ্ট হয়। আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে "রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম" নামক একটি পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট আছে। কিরূপে স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করিতে হয় তাহা ছাত্রগণ প্রতি বিদ্যালয়েই শিক্ষা করে।" এই যুবক শক্তির বিষয় বলিতে যাইয়া পুনরায় সংবাদ পত্র "বিহারী" বলিতেছেন, "বঙ্গদেশে গভর্ণমেণ্ট ছাত্রগণের উপর বিরক্ত হইয়াছেন এবং সারকুলারের উপর সারকুলার জারি করিয়া তাহাদের দমন করিতেছেন, ইহাতেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, বাঙ্গালী যুবকগণ প্রকৃত দেশনিষ্ঠ হইয়া প্রবলবেগে স্বদেশী আন্দোলন করিতেছেন, কারণ প্রকৃত দেশভক্তি না দেখিলে ইংরাজ কখনও ক্রুদ্ধ হইবে না। বাঙ্গালী যুবক বর্ষে বর্ষে কংগ্রেসের ভলেণ্টিয়ার হইয়া রাজনীতিক আন্দোলন করিয়াছেন; কৈ তাহাতে ইংরাজ তো রাগে নাই? কংগ্রেস কি রাজনীতিক আন্দোলন নহে? হাঁা, কংগ্রেসও রাজনীতি বটে কিন্তু তাহাতে ইংরাজের ভীতি বা ভারতের ইষ্ট আদৌ হয় না। আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী, সামাজিক, রাজকীয় বা ধর্মবিষয়ে শতশত আন্দোলন করিয়াছেন, কিন্তু আজ গবর্ণ-

মেন্টের রোষ দেখিয়া বুঝিলাম এইবার স্বদেশী আন্দোলনেই প্রকৃত যুবক শক্তি জাগিয়াছে।"

ইতিহাসের শিক্ষা, মহাজনের উক্তি ও শাস্ত্রের আজ্ঞা একই সত্য প্রতিপাদন করিতেছে, দেশে যুবক শক্তি জাগাইতে হইবে। স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশানুরাগে আত্মবিস্মৃতি যদি কোথাও থাকে তবে তাহা নারায়ণের অংশ সম্ভূত যুবকহৃদয়েই আছে। "নেতৃত্ব করিবার সময় দাস ভাবাপন্ন হও, নিঃস্বার্থপর হও।" বিবেকানন্দ স্বামীর এ উপদেশ যুবক প্রাণেই অধিক ফলবতী হইবে।

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ

কালের ভেরী বাজিতেছে ; ভেরীরবে মুহ্যমান প্রাচ্যদেশ বহু শতাব্দীর জড়তাজাল ধীরে ধীরে অপসৃত করিয়া নবীন প্রভাতের স্ফুটোন্মুখ পদ্মের ন্যায় আপনাকে বিকশিত করিতেছে। ওই দেখ পূর্বগগনে নবোদিত তরুণ তপন, কনক সন্নিভ পীত প্রভায় দশদিগ উদ্ভাসিত করিয়া, আপনার মহিমায় আপনি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে।

ভারতবাসি! ঐ দেখ জাপানে আগুন জ্বলিল, তাহার তেজে দগ্ধ হইয়া রুষ ভল্লুক পলাইয়াছে। জাপান আলোকিত, জ্যোতিস্মান, পারস্য সে প্রভায় প্রভান্বিত। নেপাল, আফগান, তুর্ক, তিব্বৎ আজ কোথায় সে দীপ্তি নাই? আর দেখ আজ বহু যুগের রুদ্ধ গবাক্ষ ভেদ করিয়া প্রাচ্য সূর্য্যের প্রোজ্জ্বল আলোকরেখা আলস্য সঙ্কুল-বিলাস অবসিত অন্ধকার কক্ষে তোমার ঘুমন্ত মুখের উপর কেমন স্বর্গীয় আভা বিকাস করিতেছে।

আর ঘুমায়োনা এখন একবার এই সুদীর্ঘ বিশ্রামের পর আর্যের হৃদয় লইয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াও দেখি ভাই! পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিরই আত্মপরিচয় দিবার কোন না কোন গৌরবকর বিষয় আছে। আর্যসন্তান তুমি, তোমার কি কিছুই নাই? যে দেশের রমনীগণের প্রতিব্রতের পরিচয় অলন্ত চিতানলে আত্মাহুতি দান, যে দেশের দেশভক্তির পরিচয় দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অম্লান বদনে অরাতি কৃপাণ তলে আপনার নবীন মস্তক অর্পণ, যে দেশের সন্তান অতিথি সৎকারের কঠোর কর্তব্য সম্মুখে আপনার জীবনাধিক পুত্রকে শানিত করাত তলে নিক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না; ক্ষুদ্র এক কপোতের প্রাণ রক্ষার জন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জন যে দেশের আশ্রিত পালন ধর্ম, যে দেশের রাজা সত্য পালনের জন্য প্রাণোপমা সহধর্মিনী, প্রাণাধিক পুত্রকে বিক্রয় করিয়া অবশেষে আত্মবিক্রম পূর্বক জগতে স্বার্থত্যাগের অপূর্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, যে দেশে ব্যাস বশিষ্ঠ গৌতম প্রভৃতি জ্ঞান বীরের, শিবি, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ধর্মবীরের, ভীষ্ম, অর্জুন, প্রতাপ, শিবাজী প্রভৃতি শূরবীরের মাতৃভূমি—স্বয়ং ত্রিলোকপালক নারায়ণ যুগে যুগে যে দেশের যুগ ধর্ম প্রচারক, সেই চিরপুণ্যময়ী নিষ্কাম সাধনক্ষেত্র ভারতভূমির সেই ভারত সন্তানের আত্মপরিচয় দিবার কি কিছুই নাই? ভারতসন্তান মুখের কথায় আত্মপরিচয় দিতে জানেন না, তাঁহাদের পরিচয় তাঁহাদের কার্য। এক সময়ে মণিপুরাধিপতি মহারাজ বভ্রুবাহন পাণ্ডব শিবিরে যাইয়া বিশ্ববিজয়ী অর্জুনের নিকট তাঁহার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন তখন সেই কুরুক্ষেত্রে জয়ী বীরচূড়ামণি অর্জুন মহারাজ বভ্রুবাহনকে বলিয়াছিলেন যে, অর্জুন পুত্র কখনও মুখের কথায় আত্মপরিচয় দিতে জানে না, তাহার পরিচয় তাহার অসির মুখে, যদি আমার পুত্র হও, তবে বীর কার্যে তাহার পরিচয় দাও। বীর পিতার এই তেজগর্বিত উপেক্ষায় বীরপুত্রের চৈতন্য হইল, বভ্রুবাহন বাণের অর্জুনের পুত্রত্বের পরিচয় দিলেন।

কিসের ভয়—কাহাকে ভয়—কোন্ পশুর পশুবলের ভয়ে আর্যসন্তান তুমি—তুমি এত ভীত এত সঙ্কুচিত হইতেছ?

যাঁহাদের ধর্ম শাস্ত্রে মৃত্যুর কোন অস্তিত্বই নাই—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"

যাঁহাদের ধর্ম শাস্ত্র এই মহা সত্য প্রচার করিয়া বজ্রনির্ঘোষে জগতে আত্মার অমরত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, সেই আর্যসন্তান আজ কোন ভয়ে ভীত হইবে ভাই?

এই অনাদি আর্য জাতির অন্তরনিহিত ধর্মোন্মাদনাময় মহাশক্তির পুত্র জাহ্নবীপ্রবাহ ধারণ করা কি পশুবলোদ্দীপ্ত দাম্ভিক ঐরাবতের কর্ম? তোমাদের শক্তির অভাব নাই—মহাশক্তির সন্তানের কি কখনও শক্তির অভাব হইতে পারে? আত্মবিশ্বাসের শোচনীয় অভাবে তোমরা নিজকে যতদূর হেয় যতটা দুর্বল মনে করিতেছ, আজ একবার আত্মপ্রত্যয়ের দিব্য নেত্র উন্মিলন করিয়া দেখ জগতের কোন জাতি অপেক্ষা কোনও অংশে তোমরা হীন নও! তোমরা পৃথিবীর নিখিল জাতির গুরুপুত্র! একবার আপনাদের জাতীয় শক্তির অদম্য বেগে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও, দেখিবে তোমাদের নবশক্তির অপূর্ব বিকাশ দেখিয়া জগৎ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে গুরু জ্ঞানে আবার তোমাদের পায়ে লুটিয়া পড়িবে।

তোমাদের এক বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জগতে বিসম চমক লাগাইয়া গিয়াছেন। তোমরা উপযুক্ত হও উপযুক্ত সাধনাক্ষেত্র প্রস্তুত কর দেখিবে এই ভারতে আবার কোটী কোটী বিবেকানন্দ, কোটী কোটী শিবাজী, কোটী কোটী প্রতাপ হেলায় জন্মিবে। ওই দেখ, তোমার দারিদ্র্য-পীড়িত অন্নাভাবে শীর্ণ দুর্বল ভ্রাতৃগণের উপর রাক্ষসগণ কি নিদারুণ পদাঘাত করিতেছে। প্রতিকার অক্ষম ভ্রাতাগণ যুক্তকরে প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছে, তাহাদের কাতরতা দেখিয়া মদমত্ত রাক্ষস মর্মভেদী অট্টহাস্যে আপনার বীরত্ব ঘোষণা করিতেছে। আর তোমরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নারীগণের ধর্মনাশ প্রাণাধিক ভ্রাতৃগণের অপমৃত্যু দর্শন করিতেছ? এই কি আর্যধর্ম। এই কি তোমাদের আশ্রিত পালন ব্রত!

আর নয়—উঠ, যদি তোমাদের কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে যদি তোমাদের ধমনীতে কণামাত্রও আর্য শোণিত থাকে তবে আর মুহূর্ত বিলম্ব করিও না। জননী ভগিনীর সতী ধর্ম রক্ষার জন্য, ভ্রাতৃগণের দুমুষ্টি অন্নসংস্থানের জন্য, আর ভবিষ্যদ্বংশীয়দের দাসত্ব মোচনের জন্য উঠ, মাতৃভূমির কার্যে তুচ্ছ জীবন "উৎসর্গ" কর। দেখিবে এক নশ্বর জীবনের বিনিময়ে তোমাদের অবিনশ্বর অনন্ত জীবন লাভ হইবে।

ধর্ম্মরাজ্য ও মহারাজা শিবাজী

সাধারণতঃ আমরা বলিয়া থাকি যে, শিবাজী স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্যই প্রবল শত্রুর সহিত আজীবন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধের পূর্বাংশে আমরা বলিয়াছি যে, শিবাজী ধর্মরাজ্য স্থাপন করিবার প্রয়াসে অদ্ভুত বীরত্ব ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এখন ভাবিয়া দেখা আবশ্যক যে এই দুইটী বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? স্বাধীনতা লাভ ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপন কি একই বস্তু? যে দেশ পরাধীন সে দেশে কি ধর্মরাজ্য সংস্থাপন হইতে পারে না?

ইহার উত্তর এই যে, পরাধীন দেশ কখনও ধর্মরাজ্যে পরিণত হইতে পারে না। পরাধীন দেশবাসী রাজধর্ম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম হইতে বঞ্চিত থাকায়, সে দেশে ধর্ম সর্বদাই ব্যাহত ও অধোগতিশীল হয়। মুসলমানরাজ্যে ক্ষাত্রবীর্য, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি প্রায় অক্ষুণ্ণই ছিল, তবে প্রাচীনকালে যাঁহারা সমাজের শীর্ষে অবস্থান করিয়া সকলের স্বধর্মকে পরিপুষ্ট ও পরিচালিত করিতেন, মুসলমানরাজ্যে তাঁহাদের উচ্চাসন একেবারেই অপসারিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভারতবর্ষে অনেক পরিমাণে মোক্ষ হইতে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মোক্ষাভিলাষীদিগকে ক্রমশঃই সমাজ হইতে পরাঙ্মুখ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান বিজয়ের পর মোক্ষ-পন্থিগণ আপনাদের উচ্চাসনে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া সমাজ হইতে আরও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। সমাজকে পরিচালন করিবার ভার শাস্ত্রবিৎ অধ্যাপক ব্রাহ্মণদের উপর ক্রমশঃই সংন্যস্ত হইতে লাগিল। তত্ত্বজ্ঞের আসনে শাস্ত্রজ্ঞ উপবিষ্ট হইলেন। এই সকল শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাচীনকালের "ঋষিদিগের উচ্চাধিকার প্রাপ্ত না হইয়াও সাধ্যমত পরোক্ষভাবে ও আংশিক ভাবে সমাজকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। সেই পরাজয় অবধি আজ পর্যন্ত ক্ষীণ চেতনার সূত্রাবলম্বন করিয়া এখনও যে সেই প্রাচীন আর্যসমাজ ভারতবর্ষে বাঁচিয়া রহিয়াছে ইহার প্রধান কারণ এই সকল শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের বেদনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা। পক্ষীমাতা স্বীয় পক্ষবিস্তার করিয়া

তাহার আবরণে যেমন শাবকগুলিকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করে, এই ব্রাহ্মণগণ সেইরূপে কঠোর বিধানের আবরণ দ্বারা প্রবলের অনুকরণাদি হইতে প্রাচীন আর্যসমাজকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই আশঙ্কাজনিত সঙ্কোচ সমাজের অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া সমাজকে নূতন নূতন প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়াছে। আর্য্যসমাজ কি ইহার পূর্বে বিদেশ হইতে নূতন তত্ত্ব বা নূতন উপকরণ কখনও গ্রহণ করে নাই? অবশ্য করিয়াছে; কিন্তু তখন সে স্বপ্রতিষ্ঠ ছিল, তখন স্বাধীনভাবে আত্মস্থ থাকিয়া আপনার মৌলিক বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া, সে নূতনকে স্বায়ত্ত ও অঙ্গীভূত করিতে পারিত। মুসলমান বিজয়ের পরবর্তীকালে নূতনের সংস্পর্শে সঙ্কুচিত হওয়াই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল, এই সঙ্কোচের কুফলস্বরূপ অনেক ব্যাধি দ্বারা আজ সে আক্রান্ত হইলেও স্বাক্ষিপ্রদত্ত বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া ম্রিয়মাণ অবস্থায়ও আজ সে আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছাইতে পারিয়াছে বলিয়া আমরা ধন্য, কারণ আমাদের অতীতকে হৃদয়ে ও দেহের রক্তে রক্তে পাইয়াছি বলিয়াই আমরা নিশ্চয়ই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অধিকারী হইব, নচেৎ ব্যাবিলনবাসী, বা রেড ইণ্ডিয়ান, বা প্রাচীন মিশর বাসীর মত আমাদেরও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলীন হইতে হইত।

মুসলমান আধিপত্যের সময় আকবরের মত সম্রাট সিংহাসনারূঢ় হইয়া হিন্দুদিগের সম্বন্ধে যদি প্রাচীন রাজার আদর্শে ও মুসলমানদিগের সম্বন্ধে যদি তাহাদের আদর্শে আপনাকে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইতেন, তবে হিন্দুর স্বধর্ম সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিত। কিন্তু আকবরের রাজত্বকালে এইরূপ বন্দোবস্ত সম্ভবপর বোধ হইলেও, পরবর্তী সম্রাটদিগের সময় ক্রমশঃই উহার সম্ভাবনা রহিল না। তারপর শিবাজীর আবির্ভাবকালে ভারতের সর্বত্র হিন্দুদিগের দুর্দশার কথা কাহারও অবিদিত নাই।

কিন্তু মুসলমানাধিকৃত ভারত ও ইংরাজাধিকৃত ভারতের মধ্যে কত প্রভেদ। মুসলমানাধিকারে ভারতবর্ষ ভারতবাসীরই আয়ত্তাধীন ছিল, তখন বর্তমান যুগের সুসংস্কৃত নিয়মতন্ত্রাদির সাহায্যে রাজকার্য পরিচালিত না হইলেও, বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে স্বীয় মনুষ্যত্বের অনুশীলন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার প্রত্যেক প্রজারই বিদ্যমান ছিল। তখন রাজা স্বদিচ্ছাক্রমে প্রজার উপর অত্যাচার করিতেন বটে, কিন্তু সেই অত্যাচার এমন

সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিত যে, প্রজার মনে তৎক্ষণাৎ ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক করিয়া দিত; আজকাল রাজার অত্যাচার সমগ্র দেশের পক্ষে মারাত্মক হইলেও এমন কৌশলে সম্পাদিত হয় যে, উহা প্রজার অজ্ঞাতই থাকিয়া যায় এবং অজ্ঞাত অবস্থায় অনিষ্ট সাধন করে বলিয়াই সেই অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবার শক্তি দেশে উদ্বোধিত হয় না। পূর্বকালে রাজার অত্যাচার তৎক্ষণাৎ একটী মানসিক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিত এবং সেই প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই উহার প্রতিকার নিহিত থাকিত। ইংরাজের অত্যাচার অনিষ্টকারী কীটের মত দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া দেশকে অন্তঃসারহীন করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্বকালে দারিদ্র্যের তাড়না কাহাকে বলে তাহা ভারতবর্ষ জানিত না। এখন দরিদ্র বিদেশীকে ধনসম্পন্ন করিতে করিতে ভারতের দারিদ্র্যব্যাধি করাল মৃত্যুর আকার ধারণ করিয়া নিয়তই কোটি কোটি ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে।

যে দেবাধিষ্ঠিত ভারতে ধর্মরাজ্যের স্বপ্নকে বস্তুগত করিবার জন্য কত বীরপুরুষ জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতবর্ষ আজ অধর্মের লীলাভূমি হইয়া বিশ্বসমক্ষে লাঞ্ছিত হইতেছে। যে ভারতের বৃক্ষ, তৃণলতাগুল্ম, নদীগিরি, বননগরাদি, এমন কি প্রত্যেক ধূলিকণা, ধর্মরাজ্যের মাহাত্ম্যে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, আজ সেই ভারতের বায়ু, মৃত্তিকা, আকাশ, জল অধর্মকে পোষণ করিয়া অধর্মের দ্বারা দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া দেবতার অস্পৃশ্য হইয়া গিয়াছে! বোধ হয় এমন অধর্মমূলক রাজ্য কোনও কালে কোনও দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বধর্মের মূলতত্ত্ব মনুষ্যত্ব, এই মনুষ্যত্বকে বিকশিত করিয়া মানুষকে মোক্ষের অধিকারী করিবার জন্যই স্বধর্মের সৃষ্টি হইয়াছিল। পূর্ব পূর্ব কালে ভারতে যখনই ধর্মে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, তখনই দেখা যায় যে, স্বধর্মের অঙ্গ বিশেষই বিপন্ন। যেখানে স্বধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত, বর্তমান পরাধীনতা সেইখানে আক্রমণ করিয়াছে এবং মনুষ্যত্বকে ম্লান ও বিলুপ্ত করিতে করিতে সহস্র সহস্র বৎসরের আশা ও আদর্শকে চিরকালের জন্য ধ্বংসমুখে প্রেরণ করিতেছে। যদি মনুষ্যত্বই ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তবে বিজ্ঞানশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, উন্নত আদর্শ প্রভৃতি লইয়া কি হইবে? যে অন্নরোগে কঙ্কালসার হইয়াছে, তাহার ভোজন পাত্রে বিবিধ উপাদেয় চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় খাদ্যাদি থাকিলেও তাহার দেহ সেই খাদ্যে পরিপুষ্ট ও

বলিষ্ঠ হয় না। যাহার মনুষ্যত্ব বর্তমান যুগের স্বাধীনমনুষ্যোচিত বিচিত্র উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের অভাবে ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে, সে কেবল স্মৃতিশক্তি ও কল্পনাকে বিবিধ তত্ত্বের ভারে প্রপীড়িত করিয়া, বিদ্বান আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া, জগতের কি উপকারে আসিবে? যদি মনুষ্যত্বের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ভারতবাসীকে ত্যাগ করে তবে এক মুহূর্তও নরক-কীটের মত জীবনধারণ করিয়া ফল কি?

যিনি গীতায় অর্জুনের উপদেষ্টা এবং যিনি ইংরাজাগমনের পূর্বে প্রাচীন আর্যসভ্যতার বিজয় খড়্গকে অনেককাল পরে শানিত করিয়া দিয়াছিলেন, ইহাদিগকে পূজা করিবার সময় ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মরাজ্য-সংস্থাপন-সংকল্প যদি নবোৎসাহে উদ্দীপিত না হয়, তবে ইহাদিগকে পূজা না করিয়া অপমান করা হইবে। তাঁহাদের পূজাদ্বারা যদি তাঁহাদের সাধনমন্ত্রের অধিকারী হইবার প্রয়াসী না হও, তবে হে ভারতবাসি, তাঁহাদের পবিত্র নাম তোমাদের খেলাঘরের স্বদেশপ্রেমের সংস্রবে উচ্চারিত করিয়া তাঁহাদের মর্যাদার হানি করিও না। শিবাজী আপন খড়্গকে আপনার অধিক সম্মান করিতেন, কারণ এই খড়্গই তাঁহাকে ভবানীর নিকট প্রিয় করিয়া দিয়াছিল; আজ যদি হে ভারতবাসি, এই খড়্গকে সসঙ্কোচে সরাইয়া ফেলিয়া খড়্গহীন শিবাজীমূর্তিকে হৃদয়াসনে উপবিষ্ট করাইতে যাও, নিশ্চয়ই জানিবে তোমার হৃদয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

বর্তমান ভারতে ধর্মরাজ্যের আদর্শ কি ইহার বিচার করিয়াই আমরা এই প্রবন্ধের শেষ করিব। প্রাচীনকালে জনসাধারণ সাক্ষাৎভাবে ধর্মের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু রাজ্যের সহিত তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ সুস্পষ্ট সম্বন্ধ ছিল না। ধর্মরাজ্য তাহাদের জন্য স্থাপিত হইত; তাহারা স্বধর্মের অনুশীলনই জানিত, রাজ্যের সহিত তাহাদের বাহ্যিক বা আন্তরিক কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিলনা। তাহাদিগকে যে রাজভক্তি শিক্ষা দেওয়া হইবে, কেবলমাত্র ধর্মরাজ্যেই তাহা সার্থক হইত; এইরূপ অনিশ্চিত অস্থায়ী ভিত্তির উপর তাহাদের সহায়তা নির্ভর করিত বলিয়াই প্রাচীন কালে বিপদে হিন্দুরাজা প্রজাসাধারণের নিকট বিশেষ সাহায্য পায় নাই। দেশের সম্পদে ও বিপদের সহিত জনসাধারণকে সংযুক্ত করিতে হইলে, কেবলমাত্র রাজার প্রতি তাহাদিগকে অনুরক্ত না করিয়া, দেশেরও প্রতি

অনুরক্ত করিতে হয়। কালভেদে এই শিক্ষা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মরাজ্যে বাস করিয়া আমাদিগকে স্বধর্মের সম্যক অনুশীলন করিতে হইবে, সেই রাজ্যের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ আন্তরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই রাজ্যকে সুরক্ষিত করিতে হইলে, যখন জনসাধারণের সহায়তা সর্বদাই অপরিহার্য, তখন এই সহায়তাকে চিরস্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই সর্বতোভাবে বিধেয়। স্বদেশের প্রতি মমতাই এই চিরস্থায়ী ভিত্তি।

মানবমাত্রেরই স্বধর্ম আছে। এবং সকলেই স্বধর্মের অনুশীলনদ্বারা মোক্ষ পথের অধিকারী হয়। অতএব হিন্দুর যেরূপ ধর্মরাজ্যের আবশ্যক, মুসলমান বা খৃষ্টানেরও সেইরূপ আবশ্যক। ধর্মরাজ্যের আদর্শের মধ্যে এই সহজ সামঞ্জস্য থাকিলেও, জনসাধারণের দৃষ্টি সেই সামঞ্জস্যের প্রতি নিবদ্ধ হয় না; তাহারা স্বভাবতঃ বিবিধ অনুষ্ঠানমূলক বৈষম্যের প্রতিই মনোযোগী হয়। এইজন্য ধর্মরাজ্যের আদর্শের দ্বারা সর্বসাধারণকে অনুপ্রাণিত করা সম্ভবপর নহে; তাহাদের নিকট ধর্মরাজ্য স্থাপনরূপ আদর্শকে ব্যক্ত না করিয়া স্বদেশ প্রতিষ্ঠারূপ আদর্শকেই স্পষ্ট করিয়া প্রচার করিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্মরাজ্যস্থাপনরূপ আদর্শকে সহজেই অবলম্বন করিতে পারিবেন এবং উহারই একমাত্র উপায়স্বরূপ স্বদেশপ্রতিষ্ঠাকে ধ্রুবলক্ষ্য বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবন উৎসর্গ করিতে করিতে নবজীবনলাভের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। এই স্বদেশ বা নেশনের প্রতিষ্ঠাই ধর্মরাজ্য-স্থাপনের মূলভিত্তি; অভূতপূর্ব অশ্রুতপূর্ব বিপদরাশির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া ভারতবর্ষ এই মুল ভিত্তির সন্ধান পাইয়াছে। সমগ্র ভারতকে এক রাজচক্রবর্তিতে সম্মিলিত করিয়া ধর্মরাজ্য সংস্থাপনরূপ মহাব্রতে ব্রতী হইয়া ভগবান বাসুদেব মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াগিয়াছিলেন; ভারতবর্ষের ইতিহাস অভিনিবিষ্ট হইয়া পাঠ কর, দেখিবে এই যজ্ঞে সিদ্ধি-লাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষ সহস্রবর্ষ ধরিয়া আহুতিমন্ত্রের অনুসন্ধান করিতেছে। যে মন্ত্রের বা আদর্শের সূত্রে বিশাল ভারতের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মবিধানকে সংবদ্ধ করিয়া ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা যায়, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সেই মন্ত্রের গভীর অনুসন্ধান চলিতেছে। ভারতের দুঃখ-তমিস্ররাশির মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভায় স্বদেশ বা নেশন্ প্রতিষ্ঠারূপ আদর্শের প্রকাশ

হইয়া সেই মন্ত্রের সন্ধান বলিয়া দিয়াছে। ভারতবাসি, তুমি কি আজ হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতে পার যে "বন্দেমাতরম্"ই সেই ধর্মরাজ্য-স্থাপনের আহুতিমন্ত্র? তুমি কি এই মহামন্ত্রের অপূর্ব মাহাত্ম্য আজও বুঝিয়াছ? তুমি কি বুঝিয়াছ যে এই মন্ত্রসহযোগে যশ, মান, ধন, প্রাণ ধর্মরাজ্যস্থাপনরূপ যজ্ঞে আহুতি দিতে পারিলে যজ্ঞ সুসিদ্ধ হইবেই হইবে? তুমি কি অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছ যে আজ সেই মহাযজ্ঞে সফল আহুতিদান করিবার জন্য ভারতের প্রাচীন ধর্মরাজ্যসংস্থাপকগণ অন্তরীক্ষে উপস্থিত আছেন? তবে, এস ভাই, আজ এই নবকুরুক্ষেত্রে ভগবান বাসুদেবকে চিরসারথিত্বে বরণ করিয়া ভবানীপুত্র অমর শিবাজীকে অগ্রগামী জানিয়া "বন্দেমাতরম্"-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ধর্মরাজ্যস্থাপনযজ্ঞে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া অনন্তকালের জন্য ধন্য হইয়া যাই।

সামাজিক ভেদ ও স্বাধীনতা

"যতদিন দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্র থাকবে, হিন্দু মুসলমান ভেদ থাকবে, ততদিন আমরা স্বাধীনতা পাবার অনুপযুক্ত।"

টেবিলের উপর সজোরে এক ঘুসি মারিয়া ঈষদুচ্চ স্বরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নকল্প বন্ধুবর এই জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বকথাটী বুঝাইয়া দিলেন। বাল্যকালে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বোধোদয়' পড়িয়া শিখিয়াছিলাম যে, যাহাদের চক্ষু আছে কিন্তু দর্শন শক্তি নাই, কর্ণ আছে কিন্তু শ্রবণ শক্তি নাই, জিহ্বা আছে কিন্তু যাহারা রসাস্বাদনে বঞ্চিত সেই অদ্ভুত পদার্থের নাম পুত্তলিকা। আর আজ দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলাম যে, যেখানে শব্দ আছে অর্থ নাই, বাগাড়ম্বর আছে মনুষ্যত্ব নাই সেই অদ্ভুত স্থানের নাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ইউরোপের উচ্ছিষ্ট বিদ্যার চর্বণ করিতে করিতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন ফুরাইয়া যায়, এবং যখন আমরা গোলদিঘির জল মাথায় ছিটাইয়া সমাবর্তন ক্রিয়া সমাপন করি তখনও আমাদের কার্যকারণজ্ঞান বেশ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবার অবসর পায় না। শরীর রক্ষার জন্য যেমন জল, বায়ু, আলোকের প্রয়োজন, মনুষত্ব রক্ষার জন্য যে স্বাধীনতার প্রয়োজন তদপেক্ষা ন্যূন নহে—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড পাঠ্য তালিকার মধ্যে এ সহজ ও সরল সত্যের স্থান নাই।

একজন ফরাসী জীবতত্ত্ববিদ্ একবার পরীক্ষার জন্য কতকগুলা বেঙাচি ধরিয়া একটা অন্ধকার ঘরের ভিতর রাখিয়া দিয়াছিলেন। জল, বায়ু, আহারাদি ঘরে সবই ছিল, ছিল না শুধু আলোক। যথা সময়ে যখন সেগুলিকে বাহিরে আনা হইল তখন দেখা গেল তাহারা সকলেই আয়তনে বাড়িয়া এক একটি বৃহৎ বেঙাচি হইয়াছে মাত্র, একটীও লাঙ্গুলচ্যুত হইয়া যথার্থ বেঙ হইয়া দাঁড়ায় নাই।

আমাদের বিদেশী পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়েও সেই ব্যবস্থা। বাড়ী, থাম, পুঁথি, নোট, পাশ, ডিগ্রী সবই আছে, নাই শুধু এক মৃতসঞ্জীবনীমন্ত্র। আর তাহার অভাবে আমরা মানুষ না হইয়া বর্দ্ধিতায়তন শিশুমাত্র হইয়া রহিয়াছি। ইউরোপীয় গুরু আমাদের শিখাইয়াছে যে সামাজিক সংস্কার না হইলে স্বাধীনতার চেষ্টা বৃথা; আর আমরাও আপ্তবাক্যের ন্যায় তাহা বিশ্বাস করিয়া আপনাদের জড়ত্বপ্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া দিয়াছি।

আমাদের সামাজিক ভেদের একটা নৈসর্গিক কারণ আছে। নানা বর্ণের লোক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে বিরাট সমাজতন্ত্রের আশ্রয়ে আসিয়া তাহারা ধীরে ধীরে আর্যনীতি ও আর্য্য-আচার গ্রহণ করিয়া সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্যেই ভারতে জাতি ভেদ। জগতে বৈষম্য চিরদিনই থাকিবে। জোর করিয়া তাহা একাকার করিবার চেষ্টা কখনও সফল হইবে না। বহুত্বের মধ্যে একত্বস্থাপন ভারতবর্ষের অদ্ভুত কীর্তি।

আমরা চিরদিন আগন্তুককে আশ্রয় দিয়া পরকে আপনার করিয়া লইতেছি। পরাক্রান্ত রোম যখন জেরুসালেমের ধর্মমন্দির ধ্বংস করিয়া য়িহুদী জাতিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় তখন মালাবার প্রদেশ সেই দুর্ভাগ্য

জাতিকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। তুর্কীদিগের অত্যাচারে যখন পারসীকেরা স্বদেশচ্যুত হইয়া পড়ে তখনও ভারতবর্ষ অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করে নাই। এবং হে পরস্বাপহারী ইউরোপীয় তস্কর! তোমরা যখন উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া সভ্যতা বিস্তারের নামে ডাকাতি করিতে বাহির হইয়াছিলে, তখন তোমাদের ন্যায় কালভুজঙ্গকেও হৃদয়ে স্থান দিতে ভারতবর্ষ দ্বিধাবোধ করে নাই।

আর তোমরা?—তোমরা সাম্যবাদী খৃষ্টশিষ্য যেখানে একবার পদার্পণ করিয়াছ সেখান হইতে চিরদিনের জন্য শান্তির নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমেরিকার আদিম নিবাসিগণকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে কে মুছিয়া দিল? কোন্ দুর্বৃত্ত আফ্রিকায় গিয়া রোরুদ্যমানা জননীর ক্রোড় হইতে শিশুসন্তানকে ছিন্ন করিয়া তাহার কোমল হস্তে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া দিত? বেয়নেটের খোঁচা দিয়া কে চীনাদিগের মুখে আফিম গুঁজিয়া দিত? কাহার পাশবিক অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া আজ কঙ্কালসার জননী আত্মবিস্মৃত সন্তানগণের মুখের দিকে চাহিয়া তীব্র প্রতিশোধ প্রার্থনা করিতেছেন!

ধর্মের কথা আর কহিয়া কাজ নাই। বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, নকুল, পাশুপত প্রভৃতি বহুবিধ সম্প্রদায় ভারতবর্ষে উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু কেহ কখনও আপনার ইষ্টসাধনের জন্য উৎপীড়িত হয় নাই। য়িহুদী, পারসী, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বহুবিধ আগন্তুক সম্প্রদায়ও ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কখনও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে বাধাদান করে নাই। এই উদারতার ফলে ভারতবর্ষে সর্বপন্থার সমন্বয় হইয়াছে; এবং সর্ববিধ পন্থাই যে ব্যাপকতর সনাতন ধর্মের অন্তর্নিবিষ্ট, ধীরে ধীরে এই সত্য জগতের চক্ষে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—এই আর্য জ্ঞান একদিন ভারতবর্ষকে জগতের দীক্ষাগুরু করিয়া তুলিবে।

কিন্তু তোমরা?—তোমাদের দেশে সে দিবস পর্যন্ত Inquisition-এর অগ্নি জ্বলিয়াছে। ধর্মের নামে তোমরা সহস্র সহস্র নরনারীকে ভস্মীভূত করিয়াছ। য়িহুদীদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারে ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের রক্তপাতে তোমাদের ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠা কলঙ্কিত, আর আজ পর্যন্ত তোমাদের দেশে ক্যাথলিকের রাজা হইবার অধিকার নাই।

হায়, মানবকলঙ্ক! তোমরা স্বাধীনতার উপযুক্ত আর আমরা নহি? তোমরা আমাদের একত্র বাঁধিয়া মিলিত করিতে চাও? ভাবিয়াছ কি তোমাদের দাসত্ব আমাদের সম্মিলনসূত্র হইবে?

যে ঘোর অমানিশায় মায়ের বন্ধনমুক্তির জন্য হিন্দু-মুসলমান মহাশক্তির উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হইবে সেই আমাদের সম্মিলনের দিন। আর যে সাধন-ভূমিতে সন্তানের হৃদয় রক্তে মায়ের লোলজিহ্বার পরিতৃপ্তি হইবে, শব আবার পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবে, সন্তানব্রত উদ্‌যাপিত হইবে, সেই পুণ্যতীর্থ মহাশ্মশান আমাদের সম্মিলন ক্ষেত্র।

খেপাক্ষ্যাপার চিঠি

(১)

পরিচয়

* * * *

আর একটু পরিচয় বাকি আছে। আজকালকার দিনে আপন মতের পরিচয় না দিলে পরিচয় দেওয়াই যেন হইল না। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ আপনার বলিয়া কোন বিশেষ মত আছে কিনা তাহাই সন্দেহ। গুরুদত্ত ধনে ধনী হইয়া ডঙ্কা বাজাইয়া বেড়াই, নিজের আমার কিছুই নাই। সেদিন শিরোমণি ঠাকুরকে যা' বলিয়াছি তাই আবার তোমাদের বলিব, তা'হলেই আমার গুরুবাক্য বুঝিতে পারিবে।

শিঃ ঠাঃ। আপনার মত কি তাহা বুঝা গেলনা, আপনি কোন পন্থী? হয় আপনি বৈষ্ণব, নয় শাক্ত, নয় শৈব, নয় গাণপত্য; হয় আপনি হিন্দু, না হয় মুসলমান, না হয় খৃষ্টান। একটা ত কিছু পরিচয় দিতে হবে?

আমি। আমি এত গোলমাল জানি না বাপু; আমার গুরু আমাকে সাদাসিদে দুকথা বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাই নিয়েই নাড়াচাড়া করি। তোমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শাস্ত্রে হাবুডুবু খাও, আমি শাস্ত্রের কি জানি।

শিঃ ঠাঃ। তবুও ধর্ম্ম বলিতে আপনি একটা কিছু বোঝেন? সেটা কি?

আমি। তা' ধর্ম্ম বলিতে ঠিক ধর্ম্মই বুঝি। লবনের ধর্ম্ম নোনতা হওয়া—লবণত্ব; আগুনের ধর্ম্ম দাহন করা—অনলত্ব; দড়ির রজ্জুত্ব; পাখীর ধর্ম্ম—পক্ষীত্ব; মানুষের ধর্ম্ম—মনুষ্যত্ব। 'ত্ব' যোগ দিলেই ধর্ম্মের মীমাংসা হইয়া গেল। এর জন্য এত তর্কই বা কি, বিচারই বা কি।

শিঃ ঠাঃ। তা' হলে আপনার মতে মনুষ্যত্বই মানবের ধর্ম্ম। তা' যদি হয়, তবে হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টানধর্ম ইত্যাদি বিবিধ ধর্মের বিশেষত্ব বা বিরোধ উড়াইয়া দেওয়া হইল। অত সহজে কি মীমাংসা হয়, মহারাজ?

আমি। তা' যদি বিরোধ না মেটে, আমি তার কি করছি বল না। কিন্তু মানুষের ধর্মে, ঠিক জেনো, কিছুই বিরোধ নাই; এসকুইমোর যা ধর্ম আফ্রিদির তাই ধর্ম, নিগ্রোর যা ধর্ম, বার্মিজের তাই ধর্ম, খৃষ্টানের যা ধর্ম, হিন্দুরও তাই ধর্ম। সব মানুষেরই এক ধর্ম, সব শেয়ালের এক ডাক। সকলেই এক ধর্মসাধন করিতেছে, সে ধর্ম হ'ল মনুষ্যত্ব। বিধাতার এমনি সংসার-চক্র যে নানা ধর্ম লইয়া যারা চিরকালটি বিবাদ কর্‌ছে তাদেরই কলে ফেলে ঠিক এক ধর্মসাধন করিয়ে নিচ্ছেন। গুরু আমার এই কৌশলটুকু চুপি চুপি দেখিয়ে দিয়েছেন।

শিঃ ঠাঃ। আচ্ছা, এই বিশ্বজনীন ধর্মের সাধন-প্রণালী কি? এই ধর্মে ইষ্ট দেবতা কে? ইহার মন্ত্রই বা কিরূপ? এ ধর্ম সাধনের কোন ব্যবস্থা ত এপর্য্যন্ত দেখি নাই, শুনিও নাই।

আঃ। ধর্মের সাধন প্রণালী একই—একদিকে বিঘ্ননাশ, আর একদিকে বিকাশ। যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব, মহম্মদ সকলকেই একদিকে ধর্মের বিঘ্নগুলিকে বিনাশ করিতে হইয়াছে, অপরদিকে আপন ধর্মকে বর্দ্ধনশীল করিতে হইয়াছে। যীশুর পশ্চাতে শয়তান লাগিয়াছিল, বুদ্ধের পশ্চাতে মার ছিল। ধর্মের উন্নতি করিতে গেলেই সর্বদা বিঘ্ন বিনাশ করিতে হয়। বিঘ্ননাশ ও বিকাশ এই উভয় ডানার উপর নির্ভর করিয়া ধর্মে সন্তরণ করিতে হইবে। মনুষ্যত্বের বিকাশ ও উহার বিঘ্ননাশ এই মূল সাধনার উপর মনুষ্যের আর সকল সাধনই প্রতিষ্ঠিত

রহিয়াছে ; তোমরা যাহাকে ধর্মসাধনা বল, উহা এই মনুষ্যত্বসাধনরূপ বৃক্ষের একটী শাখামাত্র, আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠান, পূজা মন্ত্র ইত্যাদি মনুষ্যত্ব সাধনের উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব-বিকাশ। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার প্রতিপালন ইত্যাদি সংসারধর্ম উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য—মনুষ্যত্ব-বিকাশ। সামাজিক আচার-ব্যবহার, রাজনীতিক উদ্যোগ-অনুষ্ঠান, শিক্ষা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ইত্যাদি এই মনুষ্যত্বসাধনের উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য—মনুষ্যত্ব-বিকাশ। এই যে মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব, ইহা কি সামান্য ব্যাপার বাপু, ইহাই বিকশিত হইয়া তোমাকে সচ্চিদানন্দে পরিণত করিবে ; তোমার মনুষ্যত্বের মধ্যে স্বয়ং ব্রহ্ম আপনাকে বীজরূপে উপ্ত রাখিয়াছেন। এই মনুষ্যত্বই তাই মানুষের ধর্ম, হিন্দুরও ধর্ম, মুসলমানেরও ধর্ম, খৃষ্টানেরও ধর্ম। এই তত্ত্ব যে বুঝিবে, তার কাছে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ভেদাভেদ নাই ; সে যদি হিন্দু হয় তবে মুসলমানের ধর্মে আঘাত পড়িলে তার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে ; এবং সে যদি মুসলমান হয়, তবে হিন্দুর ধর্মে আঘাত পড়িলে তাহার ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিবে। কারণ উভয়েরই এক ধর্ম—মনুষ্যত্ব।

শিঃ ঠাঃ। মহারাজ মাপ করিবেন, আপনার কথা শুনে বেশ বোঝা যাইতেছে যে, আপনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের বেদান্তই মানিতেছেন।

আঃ। তা' হবে, সে দোষ আমার নয় আমার গুরুদেবের। তিনি যেমনি বুঝিয়েছেন, আমি তেমনি বুঝেছি ; তবে এইটুকু বেশ জানি যে এই তত্ত্ব কাহারও কেনা সম্পত্তি নয়। তুমি যে ভাবে "আমাদের বেদান্ত" বল্লে তাতে যেন মনে হয় যে, ধর্ম ব্যাখ্যাটা তোমরা একচেটে করেছ। সেটা কিন্তু বিষম ভুল।

শিঃ ঠাঃ। তাত, নিশ্চয়ই, সব দেশেই মহাপুরুষ জন্মেছেন। যদি মনুষ্যত্বই আপনার মতে সব মানুষের সধারণ ধর্ম হয় তবে আমাদের দেশে ধর্ম নিয়ে এত তর্ক বিচার চল্ছে কেন ?

আঃ। ধর্ম নিয়ে তর্ক বিচার কোন দেশে ফুরায় ? ওটা চলবেই। তবে প্রকৃত ধর্ম সাধনের দকে একবার মনোযোগ দিতে হইবে ; ধর্মের খোসা ক্রিয়াকলাপ নিয়ে দ্বেষ-হিংসা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা যথেষ্ট হয়েছে, সকলেই ধর্মে যে উন্নতি কল্লেন তাত খুব বোঝা গেল ; এইবার একটু প্রকৃত ধর্ম-

সাধনা করলে ভাল হয় না? সকলেই ধর্মের বিকাশকে লক্ষ্য করে বেড়াচ্ছে আর হোঁচট খেয়ে পড়ছে, বিঘ্ননাশ ব'লে যে আর একটা প্রধান অপরিহার্য সাধনা রয়েছে তার দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। বিঘ্ননাশ না হইলে বিকাশ হবে না, হবে না, হবে না, কারো বাপের সাধ্যি নেই যে এদেশে ধর্মের উন্নতি করে। দু-একটা মানুষের পূর্ব সংস্কারবশতঃ ধর্ম সাধনায় ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভ হতেও পারে। কিন্তু নিশ্চয় জেনো যে, সমগ্র দেশের হিন্দু-মুসলমান ধর্মে একপাও অগ্রসর হইবে না, যতদিন তাহারা ধর্মের প্রধান একটী অঙ্গকে অবহেলা করিবে! মনুষত্বের বিকাশ ও উহার বিঘ্ননাশ এক সময়ে একেবারে সংঘটিত হয়। যদি ধর্মের বাধাবিঘ্ন প্রবল থাকে তবে সহস্র বেদব্যাস, সহস্রবুদ্ধ, মহম্মদ তোমার পশ্চাতে লাগিয়া থাকিলেও তোমার ধর্মে উন্নতি হইবে না। ধর্মে, মনুষ্যত্বে বাধা কি ভয়ঙ্কর বিপদ! আমাদের দেশে এই বাধা কি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সর্বত্র মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে, মনুষ্যত্বের শ্মশান জ্বলিতেছে, সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। হিন্দু-মুসলমান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। আজ তাহাদের কি করা উচিৎ? প্রথমতঃ তীক্ষ্ণ শ্যেনদৃষ্টিতে মনুষ্যত্বসাধনার বাধাবিঘ্নগুলির উৎপত্তিস্থান নির্ণয় কর। ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ কে এই বাধাগুলির সৃষ্টি করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ এই বাধাবিঘ্ন বিনাশ করিবার প্রাণপণ উদ্যোগ করিয়া প্রকৃত ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হও। এই পুণ্য উদ্দেশ্য সাধনের উপায় বিবিধ। উদ্দেশ্য যখন সাধু, তখন উপায় লইয়া বিচার করিলে চলিবে না। পবিত্র উদ্দেশ্যের সংস্পর্শে শঠতা, ধূর্ততা, নিষ্ঠুরতা সমস্তই নূতন আকার ধারণ করিবে। কোন চিন্তা নাই। পুরাণে আছে যে স্বয়ং মহাশক্তি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে :—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতে
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরি সংক্ষয়ম্।

বাপু, এই ধর্মের বিঘ্ননাশ কি সহজ ব্যাপার, ইহা দেবতাদের এক মহোৎসব। ভারতে এই ধর্ম সাধনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ইহাতে হিন্দুমুসলমানের ভেদ নাই, কারণ ধর্মলোপ উভয়েরই হইতেছে, বিপদ উভয়েরই। একবার যদি তাহারা বুঝে যে, প্রকৃত ধর্ম উভয়ের একই, তবে সব গোলযোগ মিটিয়া যায়। শিরোমণি ঠাকুর তোমার পুঁথিগুলি

দিনকতক বন্ধ করিয়া এই মানুষের "মানুষ হওয়া" ধর্মটী হিন্দুমুসলমানকে বুঝাইয়া দাও দেখি, দিবানিশি দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবো।

সেই অবধি শিরোমণি ঠাকুর একটু চিন্তাকুল হইয়াছেন, আর প্রায়ই আমার সহিত দেখা ক'রে কাজের হিসাব দিয়া থাকেন। তবুও ঠাকুরকে যা বলেছি, ওটা কিছু একটা সম্পূর্ণ ধর্মমত হইতে পারে না; গুরুদেবের দু-একটা বোল চাল মাত্র। আমার পরিচয় বোধ হয় দেওয়া হইল। এখন ছুটী চাই! আবার আসব। ইতিঃ—যোগানন্দ ক্ষ্যাপা।

প্রতাপাদিত্য

কোটী কোটী হৃদয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষা
যারে করিছে আহ্বান
যার স্মৃতি-স্পর্শে আজি ক্ষণেকেরো তরে
শৃঙ্খলের ব্যথা অঙ্গে হয় অবসান,
প্রতাপ! প্রতাপ! বুঝি তব তপোবলে
বাঙ্গালী শিরায় আজি শক্তিচ্ছটা খেলে?
কে বলে প্রতাপ বন্দী অতীত-কারায়
লুপ্ত কোন্ ইতিহাসে?
ঐ দেখ কে চাহিছে আশ্রয় আজিকে
লাঞ্ছিত বঙ্গের ক্ষুব্ধ আবাসে আবাসে!
বাঙ্গালি! জাননা তুমি অন্তরে তোমার
কি স্বপ্ন ভাসিছে আজি—পূর্ণ প্রতিকার!
বৈশাখী পূর্ণিমা মাঝে মেঘের আড়ালে
আজি দাঁড়ায়ে প্রতাপ!

সপ্তকোটী ভুজে শক্তিবিজলী চমকি
কে নাশিবে অবিশ্বাস-মেঘ মহাপাপ!
কোন অসি-স্পর্শে পুনঃ কাটিবে তমসা,
লক্ষবীর মাঝে ব্যক্ত প্রতাপ সহসা!!!
বৈশখী পূর্ণিমা এই বাঙ্গালীর শিরে
দিয়েছিল রাজার মুকুট,
আজি লাঞ্ছনার গুরুভার বহি শিরে
বিদেশীর ক্রীতদাস কৃতাঞ্জলি পুট!
কি তীক্ষ্ণ বিষাদে মুখ ঢাকিল পূর্ণিমা
অহো কি অতৃপ্তি ঘোর, নাহিক উপমা!*
প্রতাপ আদিত্য বীর! পূর্ণকাল এবে
এস বঙ্গে মহোৎসব মাঝে,
আজি লক্ষ হিয়া আছে প্রতীক্ষায় বসি
সংকল্প-হোমাগ্নি পাশে উদাসীন সাজে;
এস শক্তি-বরপুত্র! বাল্যক্রীড়া ত্যজি
মহাশক্তিযজ্ঞে বঙ্গ মগ্ন হবে আজি।
এস বঙ্গজননীর তপোলব্ধ মণি
মাতৃদুঃখ কে করিবে দুর!
বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব জীবন্ত কবরে
হানিছে কৌশলে ঐ দুর্দান্ত অসুর
এস চিরমুক্ত, এস শোনিত প্লাবনে
শুদ্ধ পূতদেহ কর বঙ্গবাসী জনে।
আজি বৈশাখের এই স্তব্ধ পূর্ণিমায়
বঙ্গদেশ বরিল তোমায়,
উদ্ভাসিত হোক নব রণক্ষেত্র আজি
হে রাজা নূতন তব মুকুট প্রভায়!
বঙ্গ-হৃদি হাহাকার তোমার উদ্দেশে
আকর্ষি তোমার রথ আনিবে এদেশে!

* ১৩১৩ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা মেঘাচ্ছন্ন ছিল

যোগাঙ্গ্যাপার চিঠি

(২)

২। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ

ইংরাজ বাঙ্গালাকে দুভাগ করিল; কোন ওজর আপত্তি, নিবেদন আবেদন শুনিল না, দুভাগ করিল; সমস্ত বাঙ্গলা দেশ এক হ'য়ে অনুরোধ করিল, কিছুতে দৃকপাত করিল না, বাঙ্গালা দুভাগ করিল। কত অনুনয়-বিনয়, কত কাতর প্রার্থনা, ইংরাজ শুধু মনে মনে শত্রুর হাসি হাসিল, বাঙ্গালাকে দুভাগ করিল। কি ভীষণ শত্রুতা!! এ ঘোর শত্রুতা বুকে চেপে রেখে, হাসিমুখে মানুষে রাজ্যশাসন করিতে পারে!

এদের আবার প্রজাবাৎসল্য, হায় রে! তোমাদের দুটী ছোলা গুড় দিয়ে খাটিয়ে নিয়ে তার ফলে আমরা নবাবী কর্বো, তাই দুটী দুটী ছোলা গুড় দিব বই কি,—এই হ'ল ওদের প্রজাবাৎসল্য। ত্রিশকোটী ভারতবাসী এই দুটী ছোলা ও গুড়ের জন্য ধন্বা দিয়ে ব'সে আছে, তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ বছর বছর অনশনে মরছে। এই সেবার ২০ বছরে নাকি প্রায় দু কোটী লোক ধরাপৃষ্ঠ থেকে যেন মুছে চ'লে গেছে! কি ভীষণ নরহত্যা, কি পাশবিক! এত দেখেও, এত বুঝেও এখনো নাকি একটী রাজভক্তের দল এদেশে র'য়ে গেছে! রাজার প্রজাবাৎসল্য আর তাদের রাজভক্তি এই দুয়ে মিলে খুব ঢলাঢলি হ'তে থাকুক, আর ঐ দেখ সোনার অঙ্গে লোহার শিকল নাড়িতে নাড়িতে, শীর্ণদেহে, জীর্ণবসনে, রুক্ষকেশে জননী আমার বনে বনে মাঠে মাঠে দুর্ভিক্ষে কঙ্কালসার মৃতদেহ কোলে টানিয়া কি গভীর দুঃখে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন। আর বেশী দিন নয়, আমরা পশুত্ব পেয়ে এই রকম ক'রে রাজভক্তির জাবর কাটিলেই, সীতাদেবীকে যেমন বসুন্ধরা আপন কোলে লইয়া গিয়াছিলেন, তেমনি বিশ্বকর্মা ভারতের লক্ষ্মী অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে এ দেশ থেকে আকৃষ্ট করে চিরকালের জন্য ল'য়ে যাবেন। তারপর দাসত্বের নরক। সে নরকে কীটের মত হয়ে ভারতবাসী জীবন ধারণ করিবে!

হে বাঙ্গালি! তুমি কি নরক-কীট হতে জন্মেছিলে? একবার ভেবে দেখ; এইবার বাস্তবিকই ভাবিবার সময় আসিয়াছে। যখন বাঙ্গালা দেশ দুভাগ হ'ল দেখে সাত কোটী বাঙ্গালী মর্মাহত হ'য়ে পড়লো, সেদিনকার কথা আজ একবার ভাব। সেদিন স্বদেশের জন্য কোটী কোটী হৃদয়ের ব্যথা যেমনি এক হল, অমনি মাতৃরূপিনী স্বদেশশক্তি পলকের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের সর্বত্র আপনাকে প্রকাশ করিলেন. বাঙ্গালীও সর্বত্র আচম্বিতে "বন্দে মাতরম্" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে মাকে আহ্বান করিল। ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ—যে ঐ "বন্দে মাতরম্" বলিয়া চীৎকার করে তাহারই হৃদয়ে, বাহুতে, এক আশ্চর্য শক্তি আসিয়া আবির্ভূত হয়। সেদিন যেন এক নিমেষের জন্য বাঙ্গালীর কাছে মা আমার প্রকাশিত হয়েছিলেন; সেদিন যে বাঙ্গালী বড়ই ব্যথা পেয়েছিল, ভেবেছিল মা বুঝি দ্বিখণ্ড হয়েছে, তাই মা আত্মপ্রকাশ ক'রে বলেছিলেন—"আমি দ্বিখণ্ড হই নাই, তোদের একত্র রেখে সহজেই শক্তি দান কর্তুম, আজ সেই বাঁধা ঘর শত্রুরা ভেঙ্গে দিলে মাত্র; যেদিন আমার জন্য স্বার্থ ও সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রাণ দিতে অগ্রসর হবি, সেদিন আবার সেই শক্তি-তরঙ্গ মাঝে আমার দেখা পাবি, আমি মরি নাই।" মা এমনি করে দেখা দিয়ে পলকের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে গেলেন।

হায়! আমি ক্ষ্যাপা, আমার কানে আজো মার সেই কাতরকণ্ঠ বাজ্‌ছে :—

বঙ্গবাসি! গৃহে তব বসায়েছ কারে
দেখ আঁখি তুলে
কাহার চাকুরি লহ, কাহার পাদুকা বহ?
সে যে আজ তব নাম ডুবাল অতলে,
গৃহ হ'তে দুখিনীরে তাড়াল কৌশলে!
আর কে পালিবে,
মাতৃহীন শিশুপ্রায়, মৃত্যুভয় পায় পায়,
শত্রু পরিবৃত ক'রে অকালে নাশিবে,
তরুণ তপন রাহু-দানবে গ্রাসিবে!
"আজি" গৃহে ছিন্ন তব নিরাশ্রয় আমি
একা পথে বসি,

জননীর নাম ভুলি, লইতে চরণ ধুলি
দেখায়ে রজত যবে ডাকিবে বিদেশী—
ভুলিবি কি মাতৃদুঃখ ওরে বঙ্গবাসি !

মাগো ! সে দিন কি আসবে যে দিন তোমার দাসত্ব দেখে, তোমার দুঃখ দেখে, বাঙ্গালী বাস্তবিকই কাতর হয়ে উঠবে ; যে দিন তোমার দুঃখ মোচন করিবার জন্য সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগের ভাব, বৈরাগ্যের ভাব সাত-কোটী হৃদয়ে উজ্জ্বল হ'য়ে হোমাগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিবে ? যখন বঙ্গচ্ছেদ হ'য়েছিল, তখনই ত তুমি আমাদের ডেকেছিলে, সে কথা তোমার ক্ষ্যাপা ছেলে ভোলেনি, তুমি বলেছিলে :—

"এস আজি কে আসিবে মাতৃ অনুচর
গৃহ ছাড়ি পথে,
যে দেশ রচিয়া পরে আজি হ'তে রাজ্য করে
সে দেশনিবাসী মোরা নাহি কোন মতে
"বঙ্গ বিনা নাহি বাস কোথাও জগতে
শোন বঙ্গবাসি !
বালবৃদ্ধ আজি হ'তে জেনো জেনো স্থিরচিত্তে
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ বাঙ্গালী প্রবাসী
দেশহীন মাতৃহীন উন্মত্ত উদাসী !
"প্রবাসীর মত আজ ব্যাকুলতা তব
হোক ভাষাহীন।
শুরু তীব্র চিন্তা ভার বেগ বজ্রসম যার
হৃদয়ে ধারণ কর ; সাজ দুঃখী দীন
অন্তরে সংকল্প দৃঢ় উৎসাহ নবীন।
"এস আজ কে আসিবে মতৃ অনুচর
গৃহে গৃহে তপস্যার কর আয়োজন,
এক লক্ষ্য পানে সবে করি অগ্রসর
একত্রে সকলে কর শক্তি উদ্বোধন।
জান না জননী গৃহে হয়েছে সঞ্চিত
যুগে যুগে কি সম্পদ তোমাদের তরে,

সন্ধান লইয়া তাহে করিতে বঞ্চিত
জেনো সাধ্য নাহি কোন বিদেশীয় নরে।
ভিক্ষা ঝুলি ছিন্ন কর, নিরাশা-জড়তাহীন
রাজার উৎসবে দানে অনুষ্ঠানে উদাসীন।
"জানিও বিপুল শক্তি সমাজের বুকে
করে খেলা আশা-ভয়-তরঙ্গে লুকায়ে
এক লক্ষ্য হ'লে স্থির তাহার সম্মুখে
অসাধ্য সাধন করে মুহূর্তে নির্ভয়ে।
কেন মিছা ভাব বসি কি ক'রে কি হবে
যেটুকু উন্মুক্ত পথ গিয়াছ কি তাহে?
বর্তমানে যথাসাধ্য করিলে দেখিবে
যা' চাও তা' পাবে সবি কালের প্রবাহে।
বসিয়া ভাবিলে শুধু কে কবে সন্ধান পায়
প্রতি পদক্ষেপে পথে তমসা কাটিয়া যায়।"
"সত্য-অনুরাগী যদি হও বঙ্গবাসি কর অবধান,
একমাত্র নির্ধারিত, সত্যপথ প্রসারিত—
—নানা উপলক্ষ্য ল'য়ে শক্তি-সংস্থান
ধ্রুবলক্ষ্য মাতৃনামে পূর্ণাহুতি দান।"

আজো সেই অমূল্য উপদেশবাণী, সেই আহ্বান কানে বাজছে। সে দিন মার কি অপূর্ব মূর্তি!

"ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,
বাম হাতে করে শঙ্কাহরণ।
তোর দুই নয়নে মধুর হাসি—
ললাট নেত্র আগুন বরণ।"

বাঙ্গালি, সে দিন কি তোমার মনে আছে? যেদিন বাঙ্গালী মাতৃ-শক্তির অল্পমাত্র আস্বাদ পেয়েছিল, সে দিন মা আমার পলকের মধ্যে হৃদয়ে হৃদয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর কোটী কোটী সন্তানের মাঝে খড়্গ হস্তে অবতীর্ণ হতে তিনি কত ব্যাকুল, কত আগ্রহান্বিত? তাঁর সেই গভীর অব্যক্ত ব্যাকুলতা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁর মূর্তির মধ্য হ'তে যেন ফুটিয়া

বাহির হইতেছিল ; সে দিন কি তোমার মনে নাই ? সেদিন স্মরণ ক'রে তুমিও কি ব্যাকুল হও না ? সত্য বল দেখি, মার সেই আগ্রহ, ক্ষোভ, দুঃখ দেখে কার না পাষাণ-হৃদয় গলিয়া যায় ? তাই আজ জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আমাদের গোলামি, জড়তা ও ভীরুতার মধ্যে মা আমার কতদিন আর কারারুদ্ধ থাকিবেন ? সাতকোটী সন্তান মিলে এই সামান্য কারাগার ধ্বংস করিতে পারিব না ? তবে মানুষ-সমাজে জন্মেছিলাম কেন ?

এস বাঙ্গালি, আজ মার সন্ধানে বেরুতে হবে। সে বার মা আপনি এসে দেখা দিয়েছিলেন, এবার মার জন্য লক্ষ রুধিরাক্ত হৃদয়ের মহাপীঠ প্রস্তুত করে রেখে মাকে খুঁজে খুঁজে কারামুক্ত করে নিয়ে আসব। সে বার মাকে বসিবার আসনটি পর্যন্ত দিতে পারি নাই, শুধু "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণ করিতে না করিতে তিনি অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। আমাদের জড়তা ও গোলামিই ত তাঁকে ভাল করে প্রকাশিত হতে দিলে না, তাই তিনি মর্মান্তিক কাতরতা প্রকাশ করে বল্লেন—"আজ হতে প্রস্তুত হও, আবার আসবো দেখো, ভুলো না শীঘ্র ডেকে এনো !" উঃ কি গভীর কাতরতা !! ভাই বাঙ্গালি, আমিত সেই অবধি পাগল হয়ে গেছি ; তোমাদের কি সত্যই কিছু মনে নাই ? একবার সকলে বুকে হাত দিয়ে হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর দেখি, প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, মন, সংসার সমস্ত পণ করে আজ মার সন্ধানে বেরুতে পারবে কি না ? যদি পার, তবে যুগযুগান্তরের দীনতা, হীনতা, লাঞ্ছনা, নীচতা ঘুচিয়া যাইবে, যদি পার তবে অন্ধকার ভবিষ্যৎ উন্নতির আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, যদি পার তবে অর্থকষ্টের হাহাকার ঘুচিয়া ঘরে ঘরে স্বচ্ছলতার উন্মুক্ত হাসি ফুটিবে, দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী চিরকালের জন্য সুজলা সুফলা ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে, কল, শিল্প, বাণিজ্য, দেশের সর্বত্র আবার জাগিয়া উঠিবে, সাহিত্য বিজ্ঞান হাঁপ ছাড়িয়া উন্নতির সোপানে উঠিতে থাকিবে। ধর্মের মৃতপ্রায় দেহ জীবন্ত হইয়া আপন ব্যাধির প্রতিকার আপনি করিবে, সমাজ দেহে প্রাণ আসিবে, সমস্ত গ্লানি দূর হইয়া যাইবে ; অনেকদিন হইতে ভারতবাসী নিরানন্দ, ম্লানমুখ, সঙ্কুচিত হইয়া জীবন ভার বহিতেছে, তাহারাও মানবজীবনের সহজ সুখ ও আনন্দে মগ্ন হইয়া স্বদেশের পূজা করিতে শিখিবে। যে ভবিষ্যৎ এত আনন্দময়,

এত সুখপূর্ণ, এত উজ্জ্বল, সেই ভবিষ্যতের জন্য গোটাকতক জীবন দান করা কি বড় বেশী কথা? লক্ষ লক্ষ লোক কি প্লেগ, ম্যালেরিয়া, কলেরায় মারা যাইতেছে না? যে বিদেশী ভারতে আসিয়াছে, সেই এই সুন্দর নন্দনকাননের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিয়াছে যে, এমন দেশের জন্য মরিবার অধিকার শুধু দেবতারাই পায়। ভারতবাসি, এমন সুন্দর দেশের জন্য মরিবার অধিকার শুধু তোমাকেই ভগবান দিয়াছেন, তুমি কি সেই অমূল্য অধিকার আজও বুঝিয়া লইবে না?

তবে এস আজ মার উপদেশ স্মরণ কর; শক্তি কি আমাদের নাই? মা ত ইঙ্গিত করিয়াছেন :—

"জানিও বিপুল শক্তি সমাজের বুকে
করে খেলা আশা-ভয়-তরঙ্গে লুকায়ে,
এক লক্ষ্য হ'লে স্থিত তাহার সম্মুখে
অসাধ্য সাধন করে মুহূর্তে নির্ভয়ে।"

আমাদের লক্ষ্য কি স্থির আছে? গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, আমি খোঁজ লইয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছি, "নানা মুনির নানা মত"; বেশীর ভাগই লক্ষ্য-ভ্রষ্ট; কেউ ধর্মসংস্কার, কেউ সমাজ-সংস্কার, কেউ আবেদন নিবেদন, কেউ মরলি, কেউ হেনরি কটন ইত্যাদি নানা লক্ষ্য ও সাধনা লইয়া বাঙ্গালী বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়া আছে। এখনো বাঙ্গালীকে "বন্দে মাতরম্" মাতৃমন্ত্র শিখাইতে হইবে। "বন্দে মাতরম্"-এর সহজ অর্থ কি? না, সর্বাগ্রে মাকে সাক্ষাৎ বন্দনা কর, মাকে তাঁর উপযুক্ত আসনে অধিষ্ঠিত করিলে, বিদ্যা, অর্থ, মোক্ষ ইত্যাদি সবই ক্রমশঃ আসিয়া পড়িবে।

*   *   *

বিপ্লব তত্ত্ব

লোকমত গঠন

যে দেশে রাজশক্তি পশুবলকে সহায় করিয়া প্রজাকে উৎপীড়ন করে, সে দেশে নৈতিক বলের সাহায্যে বিপ্লব বা রাজ-পরিবর্তন আনয়ন করা অসম্ভব। সেখানে প্রজাকেও পশুবলকে সহায় করিতে হয়। বিপ্লবের দুইটী স্তর আছে—লোকমত গঠন এবং পশুবলের সংগ্রহ। এই দুইটীই বিপ্লব কার্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

বিপ্লব কার্য যদি সাধিত করিতে হয়, তবে সে কেবল প্রজার মঙ্গলের জন্য—প্রজাসাধারণকে প্রতিকূল রাজশক্তির করাল কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য। কোনও ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য বিপ্লব হয় না—সম্ভবও নহে। সুতরাং প্রজার কার্য প্রজাকে বুঝাইতে হয়। সমাজের মধ্যে নানারূপ মানসিক অবস্থা সম্পন্ন লোক বাস করে; কেহ অজ্ঞ, সুতরাং ভীত এবং সঙ্কুচিত; কেহ শিক্ষিত কিন্তু স্বার্থসার-সর্বস্ব; এবং কেহ বা পূর্ণ মনুষ্যত্বসম্পন্ন। অতএব বিপ্লবের উপকারিতা সকলের মনেই প্রথমে উদিত হওয়া সম্ভব নহে। কয়েকজন মনুষ্যত্ব ও তেজযুক্ত ব্যক্তির হৃদয়েই সর্বপ্রথমে দাসত্বের কঠোর যন্ত্রণার কথা উদিত হয়। এই কয়েকজন তেজস্বী ব্যক্তিদিগের দ্বারাই নিঃশব্দে লোকমত গঠিত হইতে থাকে। সমস্ত কার্যই এই কয়েকজন লোকের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। ইহাদের সংখ্যা অতি কম হইলেও ইহারা প্রত্যেকে একটী অগ্নিকণা বিশেষ। এই অগ্নিকণাই হীনতা ও অজ্ঞতারূপ ভস্মস্তূপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া দাবানলের সৃষ্টি করে। রুষের বিপ্লব এইরূপ অল্প সংখ্যক শক্তিসম্পন্ন লোকের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে এবং হইতেছে। ফরাসী দেশেও প্রথমে রুসো, ভলটেয়ার প্রভৃতি কয়েকজন লোকের দ্বারাই বিপ্লবের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইটালী দেশেও ম্যাট্‌সিনি প্রমুখ কয়েকজন স্বার্থ-ত্যাগী ব্যক্তির দ্বারাই স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। অতএব দেখা

যাইতেছে যে, অল্প সংখ্যক ব্যক্তির দৃঢ়তা ও কর্মকুশলতার দ্বারাই বিপ্লব কার্য সৃষ্ট এবং পুষ্ট হয়।

কিরূপে এইরূপ লোকমত গঠন করিতে হয়? পতিত সমাজের অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি প্রভৃতি সকলই হ্রাস হইয়া যায়। পরাধীন দেশে বিদেশীর দ্বারা সমস্ত রাজকার্য প্রভৃতি সমাধা হয় বলিয়া পরাজিত জাতির মানসিক অবস্থা বড়ই হীন এবং জড়তাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বাধীনতা এবং জাতীয় আত্মসম্মানের উচ্চ ভাবগুলি তাহার মলিন হৃদয়ে সহজে প্রতিফলিত হয় না। সুতরাং স্বাধীনতার দিকে তাহাদের জড় হৃদয়কে ছুটাইতে হইলে নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সে অবস্থায় যতটা লোকের মনকে সহজেই অধিকার করিতে পারা যায়, সেই সেই অবস্থা ধরিয়া ততটা উচ্চভাবের রোল তুলিতে হয়। সাধারণের মনকে এই সকল ভাবের দ্বারা এরূপভাবে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হয় যে, যে পর্যন্ত না সেই ভাবগুলি বাস্তবিক ঘটনায় পরিণত হয়, সে পর্যন্ত তাহাদের মন কিছুতেই শান্ত হইবে না; একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা হৃদয়কে সর্বদাই উদ্বেলিত করিতে থাকিবে; এই আকাঙ্ক্ষার ফলে সমগ্র দেশব্যাপী অসন্তোষ জ্বলিয়া উঠিবে। তখন সকলেই পশুবল সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিবে।

লোকমত গঠনের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক নিম্নে তাহার প্রধান কয়েকটীর উল্লেখ করা গেল।

(১) প্রথমতঃ সংবাদপত্র। সংবাদপত্রের উপকারিতা এবং ক্ষমতা সকলেই জ্ঞাত আছেন। সংবাদপত্র সম্পাদকের কার্য একটী দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার। সাধারণের মনকে সংবাদপত্র যত সহজে গঠিতে করিতে পারে, এত শীঘ্র কেহই পারে না। সুতরাং স্বাধীনতা ও বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার আলোচনা দ্বারা সংবাদপত্রগুলিকে পূর্ণ করিতে হয়। এই কার্যের জন্য সম্পাদকদিগকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিতে হয়। সম্পাদকদিগের মনে যদি একবার এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে পারা যায়, তবে তাঁহারাই সেইভাবে লোকমত গঠিত করা স্বীয় কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকেন। তাহাদের লেখনীই তখন বজ্ররূপ ধারণ করিয়া লোকের মনে তড়িৎ ছুটাইয়া দেয়।

(২) আর একটী উপায়—সঙ্গীত। সঙ্গীতের দ্বারা লোকের মনকে

অতি সহজেই বশ করা যায়। সঙ্গীতই মানবহৃদয়ে একটা অজ্ঞাতপূর্ব অশ্রুতপূর্ব যুগের কথা বলিয়া দিয়া তথায় একটা প্রবল অভাবের সৃজন করে। মানুষ তখন অনুভব করে যে, তাহার বর্তমান অবস্থা বড়ই হীন—বড়ই পতিত ; সুতরাং একটা উন্নত অবস্থা আনা চাইই চাই। মহারাষ্ট্র দেশে মহাত্মা শিবাজী যখন স্বাধীনতার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন চারণ সঙ্গীতগুলি তাঁহার কার্যের বিশেষ সহায় হইয়াছিল।

(৩) তাহার পর সাহিত্য। স্বাধীনতার ভাবে জাতীয় সাহিত্যকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হয়। উপন্যাস লিখিতে হইলে নায়ক নায়িকাকে উচ্চ বীরত্বে আদর্শে গঠিত করিত হয়, এবং ঘটনা বর্ণনার সময়েও স্বাধীনতা ও বীরত্বের বর্ণে তাহাকে রঞ্জিত করিতে হয়। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতি লেখকগণ সাহিত্যের ভিতর দিয়া কৌশলের সহিত এই ভাব কতকটা পরিমাণে দিয়াছেন। শুধু ফাঁকা স্বাধীনতার কথা বলিলে অনেকের মনে শুষ্ক লাগিতে পারে, কিন্তু যদি কাব্য বা উপন্যাসের ভিতর দিয়া ঐ ভাবই প্রচার করা যায়, তাহার অজ্ঞাতসারে সাধারণ লোক তাহা দ্বারা আক্রান্ত হয়। শুষ্ক ভাবের উপর্যুপরি বিন্যাস অপেক্ষা একটী জলন্ত আদর্শ সাধারণের মনে অধিকতর প্রবলভাবে কার্য করে।

(৪) যাত্রা, কথকতা, থিয়েটার প্রভৃতি দ্বারা স্বাধীনতার আবশ্যকতা প্রচার করা। মানুষের একাগ্রতা এই সকল দিকে বড় বেশী ভাবে পতিত হয়। সুতরাং রোগীকে চিনিমাখান বড়ী খাওয়াইবার মত এই সকল আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া স্বাধীনতার ভাব প্রচার করিলে সাধারণের মন বড় সহজেই তাহা গ্রহণ করে। জাতীয় ইতিহাসে যে সকল বীরপুরুষ স্বদেশের ও স্বাধীনতার জন্য জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জলন্ত আদর্শ সাধারণের মনে একটা উচ্চ ভাবের উদয় করিয়া দিয়া বর্তমান পতিত অবস্থার কথা ভাবিবার সুযোগ ঘটাইয়া দেয়।

(৫) আর একটী উপায় গুপ্ত সভাসমিতি প্রভৃতি। এই উপায়টি সাধারণের জন্য তত নহে যত স্বদলের লোকের জন্য। অত্যাচারী রাজশক্তি সকল সময়ে খাঁটি সত্যটুকু প্রচার করিতে দেয় না। সঙ্গীন ও বন্দুকের গুঁতাতে সত্যকে চাপা দিতে চায়। প্রকাশ্য স্থানে স্বাধীনতার

কথা প্রচার করিতে বা লিখিতে হইলে একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লিখিতে হয়। এই জন্যই এমন একটা গুপ্তস্থান দরকার যেখানে সত্য আপনার সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জলন্ত তেজ বিকাশ করিতে পারে। সেখানে অত্যাচারীর দৃষ্টির সাধ্যও নাই যে প্রবেশ করে। রুষের বিপ্লবকারীগণ গভীর নিশিতে গুপ্তস্থানে বসিয়া স্বকর্তব্য সাধনের বিষয় আলোচনা করিতেন এবং করেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহার "আনন্দমঠে" ঠিক এই প্রকার ব্যাপারেরই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গভীর নিশিতে, নিবিড় অরণ্যেই সন্ন্যাসীদল স্বাধীনতার অস্ত্র সংগ্রহ করিত।

এই পাঁচটী উপায় ব্যতীত দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে আরও অনেক উপায় অবলম্বন করিতে হয়। ভিন্ন দেশের লোকের মন ভিন্ন প্রকার, সুতরাং এক দেশের মন যেখানে অধিক নিবিষ্ট, হয়ত অন্য দেশে সেখানে অন্যরূপ হইবে। প্রয়োজন ও অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব আনয়ন যখন অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়, তখন যে কোনও উপায়ে হউক, তাহা প্রচার করিতেই হইবে। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সকল উপায়ই অবলম্বনীয়। তবে কৌশল এবং দৃঢ়তা বিশেষ প্রয়োজনীয়। দৃঢ়তা থাকিলে পন্থা আপনিই আসে।

ভূত ও ভবিষ্যৎ

কথাটা যখন উঠিয়াছে, তখন ভাল করিয়া আলোচনা হওয়াই উচিৎ। "আজ যদি ইংরাজ দেশ থেকে চলে যায়, তাহলে কাল তোমরা উৎসন্ন যাবে" এই তীব্র মন্তব্য, এই আশঙ্কা বঙ্গে আবালবৃদ্ধ পোষণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই কি ভারতবাসীর স্বদেশ রক্ষণ ও স্বদেশ শাসনের ক্ষমতা নাই? এই প্রশ্নের একটা মীমাংসা করিতে হইবে।

অতীতের অভাব

আমরা অতীত ইতিহাস হইতে দেখিয়াছি যে, ভারতের সর্বত্রই প্রাচীন কাল হইতে রাজ্যস্থাপনে, রাজ্যশাসনে, রাজ্যসংরক্ষণে ভারতবাসী স্বীয় ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে। যে দেশের ইতিহাস এত প্রতিভা ও বীরত্বের কাহিনীতে পূর্ণ, সে দেশ কেন আজ পরের গোলাম হইল, তাহাও "আত্মবিস্মৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে সূচিত হইয়াছে। বর্তমান যুগে যে দেশের শাসন ও সংরক্ষণ স্বদেশধর্ম বা Nationalityর দ্বারা অনুপ্রাণিত নহে, সে দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে পরাজিত হইবেই; যে রাজ্যের রাজনীতি আজ ঐ স্বদেশধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সে রাজ্য কোন মতেই প্রবল শত্রু সমক্ষে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। ভারতে ঐ স্বদেশধর্মের প্রতিষ্ঠা অতি দুরূহব্যাপার; কিন্তু ইহাও সত্য যে, ভারতবর্ষ যে দিন স্বদেশধর্মের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জগতে দণ্ডায়মান হইবে, সে দিন সে অজেয় হইয়া স্বদেশধর্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য মানবের নিকট প্রকটিত করিবে; সে অপূর্ব একতা, সে নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রাণতার দৃষ্টান্ত জগতে এক নূতন যুগের অবতারণা করিবে। স্বদেশ ধর্মের মূলতত্ত্ব—ভেদের মধ্যে অভেদের প্রতিষ্ঠা, বৈষম্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের বিধান। সকল প্রকার সংশ্লেষণের মধ্যেই বিভিন্ন অঙ্গ বা উপকরণ যে পরিমাণে পৃথক ও বিশিষ্ট হয়, সামঞ্জস্য সেই পরিমাণে দৃঢ়তা ও সম্পূর্ণতা লাভ করে; ইহা একটী প্রাচীন দার্শনিক সত্য। ভারতবর্ষে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা জাতিগত বা ধর্মগত বৈষম্য হয়ত প্রবলতর, কিন্তু

ইহাতে নৈরাশ্যের কারণ নাই, বরং স্বদেশ নীতির প্রয়োগের নিমিত্ত একটী চরম, সম্পূর্ণ ও অভূতপূর্ব ক্ষেত্র বিধাতা এদেশে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহারা ইউরোপের ইতিহাসে এই স্বদেশনীতির আশ্চর্য কার্যকলাপ দেখিয়াছেন, যাঁহারা বর্তমান যুগে জাপান প্রভৃতি দেশে এই স্বদেশনীতির অদ্ভুত প্রভাব পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, ভারতের জাতিগত ও ধর্মগত ভেদ দেখিয়া তাঁহারা কখনই নিরাশ হইবেন না। প্রভঞ্জন যতই ভীষণ আকার ধারণ করে, মহোদধি অজেয় আত্মপ্রভাবে আস্থাবান হইয়া ততই জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া উঠে; ভারতের জাতিগত ও ধর্মগত বিভিন্নতার সম্মুখে স্বদেশ-নীতির প্রভাব আজ "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে বর্ধিত আকার ধারণ করিয়া নির্দিষ্ট সংগ্রাম ক্ষেত্রের প্রতি অগ্রসর হইতেছে। অতীতের অভাব ভবিষ্যতে পূরণ হইবেই—ইহাই বিধাতার আদেশ।

বর্তমান অক্ষমতা

অতীতে যাহা ছিল না,—যাহার অভাবে অতীতে দাসত্ব শৃঙ্খল অনিবার্য হইয়াছিল তাহাও কালের প্রভাবে, দারুণ দুঃখকষ্টের তাড়নায়, ভারতবাসীর হস্তগত হইতে চলিল; কিন্তু যাহা ছিল, যাহার প্রভাব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত, রাজ্যস্থাপন, রাজ্যরক্ষণ ও রাজ্যশাসনের সেই ক্ষমতা আজও কি ভারতবাসীর অধিকারে বিদ্যমান আছে? এ প্রশ্নের সদুত্তর কি?

ভারতে চারিদিকের দুর্বলতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জিহ্বাগ্রে স্বতই এ প্রশ্নের উত্তরে মনে হয় - "নাই"। আমরা যে অবস্থায় আজ ভারতবর্ষে বিচরণ করিতেছি, ঠিক এই অবস্থায় আমাদের পশ্চাতে ফেলিয়া যদি ইংরাজ হঠাৎ বিলাতে প্রত্যাগমন করে তবে আমরা যে "উৎসন্ন" যাইব ইহাতে আশ্চর্য কি? বাহিরের রাজনীতিক বাঁধনে আবদ্ধ হইয়া আমরা ইংরাজের গোলামি করিতেছি, ইহা যেমন সত্য, আমাদের অন্তরে মনুষ্যত্বের স্রোতমুখে কতকগুলি শক্ত বাঁধন জমিয়াছে, ইহাও ঠিক তেমনি সত্য। বাহিরের বাঁধন অন্তরের বাঁধনের হেতুভূত। এই অন্তরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? "যুগান্তরে" আমরা প্রায়ই এই একমাত্র উপায় নির্দেশ করিতেছি। বাহিরের বাঁধনই যে অন্তরে বাঁধনের সৃষ্টি করে, অন্তরের বাঁধন খুলিতে গেলে যে বাহিরেও বন্ধন মুক্ত হইতে হয় এ শিক্ষা

আর্যাবর্তে এই প্রথম প্রচারিত হইল। রাজনীতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে মানুষ যে অধ্যাত্মসাধনা ও সামাজিক উন্নতির অধিকারী হয় না, ভারতবর্ষ এবার এ শিক্ষা পাইয়াছে। তাই বাহিরের বাঁধন সর্বাগ্রে ছিন্ন করিতে হইবে। কিন্তু যে কেহ সে বাঁধন ছিন্ন করিলে কোনও ফল হইবে না; যে আবদ্ধ তাহাকেই স্বহস্তে এ বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। ইহাই একমাত্র উপায়, ইহাই একমাত্র প্রতিকার।

ভবিষ্যতের সক্ষমতা

শাপগ্রস্ত ভারতবাসীর শাপমোচনের একমাত্র ইঙ্গিত বিধাতা কৃপায় প্রদর্শিত হইয়াছে—স্বহস্তে নিজবন্ধন ছেদন। দুষ্মন্ত যেমন শাপগ্রস্ত হইয়া শকুন্তলাকে ভুলিয়াছিল এবং হারাইয়াছিল, ভারতবাসীও আজ স্বোপার্জিত ক্ষমতা ভুলিয়া গিয়াছে, আত্মশক্তি হারাইয়াছে। রাজ্যশাসন ও রাজ্যরক্ষণের যে ক্ষমতা একবার উদ্বোধিত হইয়াছে, বিধাতার নিয়মে সে ক্ষমতার বিনাশ বা বিলোপ হয় না, সে ক্ষমতা ভারতবর্ষে অন্তর্নিহিত ও দৃষ্টির অগোচর হইয়া রহিয়াছে মাত্র; কিন্তু ভারতবাসী যে মুহূর্তে শাপমুক্ত, সেই মুহূর্তে সেই নিহিত শক্তি আবার প্রকট হইবে, আবার খুঁজিয়া পাইবে।

জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে ইংরাজ ভারতের অনেক শত্রুতা করিয়াছে, অনেক অনিষ্ট করিয়াছে; কিন্তু আজ হঠাৎ সে যদি আমাদিগকে রাখিয়া আপন মনে ভারত পরিত্যাগ করে, তবে ভারতের প্রতি সে যে অনিষ্ট করিবে তাহার ইয়ত্তা নাই, তাহার তুলনা নাই। জোঁকের মত নাছোড়-বান্দা হইয়া ইংরাজের ভারতে অবস্থান আমাদের শাপমোচনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ভারতকে স্বাধিকারে রাখিবার জন্য ইংরাজের পক্ষ হইতে সহস্র উদ্যোগ, সহস্র চেষ্টা, আমাদের শাপমোচনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তাহারা যদি আপন মনে অতি সহজেই ভারতকে নিষ্কৃতি দেয় তাহা হইলে সমূহ বিপদ; তাহা হইলে এদেশে মনুষ্যত্বের স্রোতমুখে যে বাঁধন লাগিয়া আছে, তাহা লাগিয়াই থাকিবে,—মরিয়া হইলে যে ঐশ্বরিক স্বার্থত্যাগ জাগিয়া উঠে তাহার চাড়ে সেই স্রোতমুখ খুলিয়া যাইবার অবসর পাইবে না—সব পণ্ড হইয়া যাইবে! তাই বিধাতার নিকট প্রার্থনা যে ইংরাজ যেন এদেশকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে, যেন আমাদের

শাপমোচনের একমাত্র সুবিধা হইতে আমরা বঞ্চিত না হই। একবার সেই পৌরাণিক ক্ষীরোদ সমুদ্রের তরঙ্গ হইতে যেমন ভারতাধিষ্ঠিত দেবতাদিগের অমৃতভাণ্ডের উত্থান হইয়াছিল, এবার যেন পূতরুধির সাগরগর্ভ হইতে ভারতবাসীর জন্য স্বাধীনতামৃতের অপূর্ব সমুত্থান জগতে অভিনীত হয়।

ইংরাজ ভারত হইতে হঠাৎ চলিয়া গেলে চলিবে কেন; তা'হলে ত ভারতবাসী "উৎসন্ন" যাইবেই। চকমকির ঘর্ষণে যেমন শোলাতে অনলের অধিষ্ঠান হয়, তেমনি ভারতবাসীর মধ্যে রাজ্যশাসন সংরক্ষণের বিলীন শক্তির অধিষ্ঠান করাইতে হইলে সংঘর্ষণের প্রয়োজন। অতএব ইংরাজকে হঠাৎ চলিয়া যাইবার মতি বিধাতা যেন না দেন, কারণ একটীমাত্র প্রস্তর লইয়া অগ্নি উৎপন্ন করা যায় না।

মীমাংসা

অতএব এতক্ষণে প্রশ্নের সদুত্তর মিলিল। ভারতবাসীর স্বদেশরক্ষণ ও স্বদেশশাসনের ক্ষমতা একেবারে কালসাগরে বিলীন হইয়া যায় নাই। অনেক বস্তু জগতে থাকে, অথচ তোমার আমার চেষ্টায় তাহার সাড়া হঠাৎ পাওয়া যায় না—অলস ব্যক্তির আহ্বানে হঠাৎ সে আত্মপরিচয় দেয় না। যাহা এই ভাবে নিহিত, তাহাকে প্রকট করিবার একটা সুনিয়ম থাকে; ভারতবাসীর স্বদেশরক্ষণ ও স্বদেশ শাসনের ক্ষমতাকে যদি আবার প্রকটিত করিতে হয়, তবে ভারতবাসীর আত্মশক্তির দ্বারা সর্বাগ্রে সেই স্বদেশের প্রতিষ্ঠা করাইতে হইবে। যেদিন ভারতভূমির উপর নিজ পদে ভর করিয়া ভারতবাসী স্বগৌরবে বলিতে পারিবে "এদেশ আজ আমার", সেইদিন হইতে তাহার রূপান্তর ঘটিবে, ভূত ও ভবিষ্যতের সংযোগসূত্র মিলিবে, যাহা ছিল তাহা আবার আসিবে, উন্নতি তরণী পাল খুলিয়া কালসাগরে ভাসমান হইবে।

অনন্তানন্দের প্রতিবাদ

মহাশয়! যুগান্তরে 'ভূত ও ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া দুই একটী প্রশ্ন মনে উঠিয়াছে। সদুত্তর কামনায় সেগুলি আপনাদের নিকট পাঠাইলাম।

অতীতে আমরা স্বদেশশাসনে অপারগ ছিলাম না; বর্তমানে স্বদেশকে বিদেশীর হাতে তুলিয়া দিয়া আমরা সে ক্ষমতা কতক পরিমাণে হারাইয়াছি, এবং ভবিষ্যতে যতদিন না শাসনভার সম্পূর্ণরূপে আমাদের করায়ত্ত হয় ততদিন আমাদিগকে প্রতিপদে বিদেশীর ক্ষমতা প্রসারের পথ রোধ করিয়া আপনাদিগের সুপ্ত শক্তি জাগাইতে হইবে। বাধা ভিন্ন শক্তিবিকাশের উপায় নাই, সুতরাং ইংরাজ যদি আজই দেশ হইতে চলিয়া যায় তাহা হইলে বিরোধী শক্তির অভাবে আমাদের জাতীয় শক্তির বিকাশ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

'যুগান্তরে' প্রকাশিত প্রবন্ধের আমি এইরূপ অর্থ বুঝিয়াছি। কিন্তু এদেশে ইংরাজের অবস্থিতি ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে যে আমাদের জাতীয় শক্তির উদ্বোধন কেন হইতে পারিবে না তাহা বুঝিতে পারিলাম না। মনে করুন আজ ইংরাজ চলিয়া গেল, পরক্ষণে

(১) হয় আমাদের স্বদেশ রক্ষণ ও শাসন করিতে হইবে।

(২) নয়ত আন্তর্জাতিক বিপ্লব উপস্থিত হইবে।

(৩) অথবা অন্য কোনও পরাক্রান্ত বিদেশী জাতি আমাদিগকে আক্রমণ করিবে।

(১) যদি কোনও উপদ্রব উপস্থিত না হয় তাহা হইলেও প্রথম কয়েক বৎসর আমরা শাসনকার্যে নানাবিধ ভুল, ভ্রান্তি, গোলমাল করিয়া ফেলিব

সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ভুল ভ্রান্তিই প্রতিপদে আমাদের বাধা দিয়া আমাদের সুপ্ত শক্তি জাগাইয়া তুলিবে, এবং অন্যান্য বিদেশীর আক্রমণ ভয় আমাদের জাতীয় একতা সাধনকার্য সম্পন্ন করিবে।

যদি হিংসাদ্বেষবশতঃ আন্তর্জাতিক বিপ্লব উপস্থিত হয় তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ও ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজাদিগের মধ্যে খুব খানিকটা মারামারি কাটাকাটি হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু এইরূপ জাতীয় মৃত্যু অপেক্ষা তাহাও কি বাঞ্ছনীয় নহে? ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলি ত নানারূপ হিংসাদ্বেষবশতঃ চিরদিনই মাথা কাটাকাটি করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহাতে ইউরোপীয় জাতিগুলি ত একেবারে উৎসন্ন যায় নাই। আন্তর্জাতিক বিপ্লব কিন্তু আর চিরদিনই চলে না। তাহা থামিয়া গেলে সমস্ত ভারতবর্ষ এক সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত না হইতে পারে, কিন্তু এখন যে ভয়ানক শোষণে দেশ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আবাসস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহারও প্রতিকার হইবে।

(৩) দেশ যদি অন্য কোনও বিদেশী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় ও বিদেশী যদি ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়া বসে তাহা হইলে তাহা যে ইংরাজ শাসন অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে তাহারই বা কারণ কি? বিদেশী আসিয়া যদি লাঠির চোটে আমাদের বশে রাখিতে চায়, তাহা হইলে তাহার অত্যাচার আমাদের ঈষদ্বিকশিত জাতীয়ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত করিয়া আমাদের স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে মাত্র। আর বিদেশী আসিয়া যদি আমাদের ঘুম পাড়াইয়া রাখিতে চায় তাহা হইলেও Morleyর "Sympathy" অপেক্ষা বোধ হয় তাহা অধিক অনিষ্টকর হইবে না। আর এক কথা। চক্ষের সম্মুখে এক বিদেশী রাজার পরিবর্তে আর এক বিদেশী রাজা আসিলে অসুবিধা যতই হউক, একটা প্রকাণ্ড সুবিধা এই যে লোকে বেশ বুঝিতে পারে যে দেশটা আমাদের চিরদিনের জিনিস, বিদেশী কেবল দুদিনের জন্য, দুদিন পরে চলিয়া যায়।

এ সমস্ত কথা• আপাততঃ কেবল কল্পনাকুসুম মাত্র, কেননা ইংরাজ ত আর গলিতনখদন্ত ব্যাঘ্রের মত হবিষ্যাশী হইয়া দাঁড়ায় নাই। আর

ইংরাজ ভারতবর্ষে যে বিষবৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছে, তাহার ফলভোগের পূর্বে সে যাইবেই বা কোথায় ?*

যুগধর্মতত্ত্ব

(১)

ক্ষমা ও ক্ষমতা

সক্ষমই ক্ষমাধর্মের অধিকারী, দুর্বলই ক্ষমার পাত্র। অক্ষমের আবার ক্ষমা কি ? প্রবল কি আবার ক্ষমা চায় ? তুমি প্রবলের অত্যাচার দমন করিতে অক্ষম, তুমি ভয়ই করিতে পার, ক্ষমা করিতে পার না। ক্ষমা সক্ষমেরই ভূষণ, অক্ষমের মোহজাল। অক্ষমের ক্ষমায় পুণ্য নাই, মোহবিষই আছে। 'ক্ষমাণাং ভূষণং ক্ষমা'। যে ভারতবাসী বলে যে ইংরাজকে ক্ষমা করিতে হইবে, সে ধর্মবিনাশী, সে ক্ষমাধর্মকে বিকৃত করিতেছে, তাহার বলা উচিত, "এস আমরা ইংরাজের অত্যাচার সহ্য করি।"

* ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পত্র সম্বন্ধে দুইটী কথা বলিবার আছে। ১ম—ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে আমাদের বর্তমান সুনিয়ম পরিচালিত গোলামির অবস্থা অপেক্ষা অরাজকতা অনেকাংশে শ্রেয়স্কর। অতএব ভারত হঠাৎ ইংরাজবিহীন হওয়াতে যদি অরাজক হইয়া উঠে তাহা মনুষ্যত্বহীন, অতএব অনন্যোপায়, ভারতবাসীর পক্ষে এইবার একটা চরম মীমাংসা আমরা সর্বান্তঃকরণে অভিলাষ করি। যদি ধরাপৃষ্ঠে ভারতকে এখনও জীবিত থাকিতে হয়, তবে আর যেন শৃঙ্খললগ্ন কণ্ঠে কাতরোক্তি করিতে করিতে তাহাকে বাঁচিতে না হয়, তদপেক্ষা যে পথে নিনেভ, ব্যাবিলন প্রভৃতি প্রাচীন দেশ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, সেই পথে ভারতও যেন সগৌরবে বিলীন হইয়া যায়। আর যদি বাঁচিতে হয়, তবে ইংরাজ দাসত্বই যেন ভারতের শেষ দাসত্ব হয়, আবার নূতন দাসত্বের কল্পনায়ও আমাদের শ্বাসরোধ হইয়া আসে ! "রুধির লোহিত ক্ষীরোদ সমুদ্রে" হয় নবজীবনের জন্য অমৃতভাণ্ড, না হয় চিরসুপ্তির জন্য নিমজ্জন—ইহা ব্যতীত ভারতের যেন অন্য পথ আর না থাকে। আশা করি, ব্রহ্মচারী মহাশয় "ভূত ও ভবিষ্যতের" প্রকৃত তাৎপর্য এইবার হৃদয়ঙ্গম করিবেন। ইতি—

(২)

বিদ্বেষ ও বিরোধ

যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যিনি পূর্ণ সামঞ্জস্যের আস্বাদন পাইয়াছেন, তিনি সম্পূর্ণ বিরোধভাবাপন্ন হইয়াও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন না হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ বিরোধী হইয়া অকুণ্ঠিতভাবে খড়্গাঘাত করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্বেষের লেশমাত্র তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই। মানুষের চরমাবস্থায়ও বিরোধ অপরিহার্য হইতে পারে; বিরোধ সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত বিজড়িত, কিন্তু বিদ্বেষ একদিন কর্পূরের মত হৃদয় হইতে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। বিরোধের মধ্য দিয়া না যাইলে যে পরাধীন দেশে উন্নতি লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, যে দেশে মুক্ত, মুমুক্ষু, বদ্ধ, সকল মানুষকেই বিরোধের মধ্য দিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার পর মনুষ্যোচিত সাধনার দ্বারা দেশের উন্নতি করিতে হয়, সে দেশের পক্ষে কি উপায়? তাহারা কি বিরোধে পরাঙ্মুখ হইয়া মৃত্যুমুখ আশ্রয় করিবে? তাহারা বিরোধকে বিদ্বেষলেশহীন করিতে পারিবে না বলিয়া কি সকল উন্নতির আশা জলাঞ্জলি দিয়া জগৎপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে? দালানে ছোট শিশু টলিতে টলিতে চলিতে চলিতে একটী পাথরে হোচট খাইয়া কাঁদিল, তার মা সেই পাথরটির উপর রাগ না করিয়াও সেটাকে সরাইতে পারেন অর্থাৎ তাহার উপর বিদ্বেষহীন হইয়াও তাহার বিরোধী হইতে পারেন (তাহার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন), কিন্তু তিনি কাজে ব্যস্ত তাই শিশুর দ্বারাই পাথরকে সরাইতে হইবে। অগত্যা তিনি নির্মমভাবে পাথরটিকে গাল দিলেন, শিশুও রাগিয়া উঠিল তখন সে বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া কান্না ভুলিয়া পাথরটিকে ছুঁড়ে ফেলিয়া দিল। শিশুকে অলস ক্রন্দন ছাড়াইয়া বিরোধী করিতে গিয়া বিদ্বেষের প্রয়োজন হইল। যদি বিরোধ শ্রেয়স্কর হয়, অনিবার্য হয়, তবে উহা মনুষ্যস্বভাবসুলভ বিদ্বেষের দ্বারা আবৃত হওয়াতে দুঃখিত হইও না, আপাততঃ ভগবান এইরূপ বিরোধের দ্বারাই জগতে অনেক ইষ্টসাধন করাইয়া লইতেছেন। সেই ভবিষ্যতে মনুষ্যোচিত কর্মক্ষেত্র পাইয়া যখন ভারতের লোক উন্নতির পথে ছুটিবে তখন অবসর মত বিদ্বেষবিহীন বিরোধের শিক্ষা দিও। আজ যেরূপ বিরোধশক্তি দেশে পাইতেছ, উহা দ্বারাই কাজ চালাতে হইবে। কারণ

কাজ বন্ধ রাখা যায় না, মৃত্যু সন্নিকট হইয়া আসিতেছে। আর বিলম্ব না করিয়া বিদেশীবিদ্বেষ ও বিদেশীবিরোধের দাবানল প্রজ্বলিত কর, নচেৎ সহস্র সহস্র বৎসরের আশা নির্বাপিত হইবে।

(৩)

শান্তির জীবন, যুদ্ধের মরণ

দেশের জড়তাকে শান্তিভ্রমে অনেকে নিশ্চিন্ত আছেন। এই ভ্রান্তির দ্বারা আমাদের অশেষ অকল্যাণ হইতেছে। জগতে অন্যত্র যে সকল কর্মে ব্যস্ত হইয়া মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতেছে, সেই সকল কর্ম হইতে ভারতবাসী বঞ্চিত ; বিদেশী দেশে প্রবেশ করিয়া সেইরূপ অনেক কর্মসাধন করিয়া অর্থ ও মনুষ্যত্ব সঞ্চয় করিয়া নিজ দেশে ফিরিয়া যাইতেছে। আমরা কর্মহীন হইয়া অতিদীন ভাবে সামান্য ব্যবসা ও কেরাণীগিরির সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। যে রাজব্যবস্থার কৌশলে আমরা কর্ম হইতে বঞ্চিত, সেই ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া, তাহাকেই পরিপুষ্ট করিতে করিতে জীবিকার জন্য দুইমুষ্টি অন্ন লাভ করিতেছি। দেশের যাহা কিছু সার অংশ—দেশের অর্থ, দেশের সকলপ্রকার সম্পদ,—বিদেশী কৌশলে আহরণ করিয়া লইয়া ভারতবাসীকে কঙ্কালসার করিয়া, দুর্ভিক্ষ মহামারী দারিদ্র্য প্রভৃতির করাল কবলে নিক্ষেপ করিতেছে। একদিকে নিরুদ্যম, জড়তা, নির্জীবতা, ক্লীবতা অপরদিকে দারিদ্র, মহামারি, অন্নকষ্ট, দুর্ভিক্ষ দেশের সর্বত্র সমান আসন পাতিয়া বসিয়াছে।

ইহাকেই কি শান্তি বলে? "বিগত ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একশত সাত বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহে সর্বসমেত ৫০ লক্ষের অধিক লোক নিহত হয় নাই। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ভারতে ৩ কোটী ২৫ লক্ষ লোক অনশনে পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে!" ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৮৮৪ খৃঃ অনুমান করিয়াছিলেন, ব্রিটিশ ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে প্রতি বৎসর গড়ে প্রতি সহস্রে ১০ হইতে ১৫ জন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধবিগ্রহহীন, দাম্পত্যজীবনপ্রিয়, শান্তিপূর্ণ উর্বর দেশে শতকরা বৎসরে ১৷৷০ হিসাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া কিছুই অধিক নহে। এতদনুসারে ১৯০১ সালের লোক গণনায় ব্রিটিশ

ভারতীয় অধিবাসীর সংখ্যা ২৮ কোটী ২১ লক্ষ, ৭৯ হাজার ৮৮৬ হওয়া উচিৎ হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা হয় নাই, তদপেক্ষা ৫ কোটী ১০ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭৫৪ কম হইয়াছে। যে 'শান্তি'র প্রকোপে ভারতবর্ষে মৃত্যুসংখ্যা ক্রমশঃই প্রবলবেগে বাড়িয়া যাইতেছে, সে শান্তি অপেক্ষা যুদ্ধ-বিগ্রহ রাষ্ট্রবিপ্লব সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। উদ্ধারের চেষ্টায় ভারত হইতে যদি ৫ কোটী লোক বিলুপ্ত হইয়া যায় তাহাও কি এই শান্তির কবলাশ্রয়ে ক্লীব মৃত্যু অপেক্ষা শতগুণে বাঞ্ছনীয় নহে? যে মানুষ হইয়া,—যে মানুষ হইতে—জন্মিয়াছে, সে কীটের মত মরিবে কেন? জীবনে যে মনুষ্যধর্ম রক্ষা করিতে পারিল না, জীবনে যে মানুষ হইতে পারিল না, ভগবান কি তাহার উপায় করেন নাই? করিয়াছেন বই কি? **জীবনে না পার, মরণে মানুষ হও।** তুমি কিরূপে বাঁচিবে তাহা বিদেশী আসিয়া স্থির করিয়া দিয়াছে। **কিন্তু তুমি কিরূপে মরিবে তাহা সম্পূর্ণ তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে।** তোমার জীবনে পরে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। তোমার মরণে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না; সে অধিকার তোমার নিজস্ব। জীবনে মনুষ্যত্ব লাভ না করিতে পার, মরণে মনুষ্যত্ব লাভ কর—ইহাই যুগধর্মের উপদেশ।

বিপ্লব তত্ত্ব

অর্থ সংগ্রহ

আমরা কয়েক বারে লোক মত গঠন এবং অস্ত্র সংগ্রহ বিষয়ে যৎসামান্য বলিয়াছি বটে, কিন্তু এই সকলের সহিত আর একটী কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন! তাহা—অর্থ সংগ্রহ। সংসারে সকল কাজেই অর্থ বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষতঃ যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি কার্য অর্থ বিনা একপদও অগ্রসর হয়না। এই বিষয়ে বিপ্লবীদলকে একটু অসুবিধায় পড়িতে হয়। বহুদিনের স্থাপিত রাজশক্তির ভাণ্ডারে অনেক অর্থই সঞ্চিত থাকে, সুতরাং

প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিকে অর্থের অভাবে বড় কষ্ট পাইতে হয় না। অধিকন্তু প্রয়োজন হইলে সে অন্যদেশ হইতে ঋণের দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু বিপ্লবকারীদের এসকল সুবিধা কিছুই থাকে না! তাহাদের একমাত্র সহায়—ন্যায়, সত্য এবং ঈশ্বর। সুতরাং এই অর্থসংগ্রহ ব্যাপারটা একটা গুরুতর সমস্যার বিষয়। কিন্তু দৃঢ়চিত্ততার নিকট কিছুই শক্ত বলিয়া বোধ হয় না। বৈপ্লবিক দল যেখান হইতেই হউক অর্থসংগ্রহ করিয়া থাকে। আমরা সকল দেশে যে প্রধান পন্থাগুলি অনুসৃত হইয়াছে, তাহার বিষয়ই কিছু বলিব।

পূর্বে বলিয়াছি বিপ্লবের আয়োজনের দুইটী স্তর আছে—লোকমত গঠন ও পশুবলসংগ্রহ। অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে আর একটী স্তরের কথা বলা প্রয়োজন—সেটী প্রকৃত যুদ্ধ। এই তিনটী স্তরে তিনটী ভিন্ন পন্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। লোকমত গঠন করিবার সময় এক উপায়ে অর্থোপার্জন করিতে হয়—অস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য আর এক উপায় অবলম্বিত হয়, এবং রাজশক্তির সহিত বাস্তবিক সংঘর্ষের সময় যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য আরও শক্ত পন্থা অনুসৃত হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ দেখা যাউক লোকমত গঠনের সময় কিরূপ উপায় অনুসৃত হয়। বিপ্লবের উদ্দেশ্যে লোকমত গঠন করিতে যাইলে রাজশক্তি নিশ্চয়ই প্রাণপণে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। সুতরাং প্রথমে নিঃশব্দে কার্য করিতে হয়। প্রথমতঃ ভিক্ষা বা স্ব ইচ্ছায় দত্ত অর্থের দ্বারাই প্রচারকার্য চালাইতে হয়। দেশ বিদেশে গুপ্ত প্রচারকেরা গুপ্ত ভাবে চারিদিকে দল গঠন করিতে থাকে। ইহার জন্য অনেক অর্থ প্রয়োজন হয়। কার্য যদি বাল্যাবস্থা অতিক্রম না করিয়া থাকে, তবে তখন চাঁদা প্রভৃতির দ্বারাই ব্যয় নির্বাহ হয়। কিন্তু যদি কার্য এতদূর অগ্রসর হইয়া যায় যে, অধিক অর্থ সংগ্রহ না করিলে আর চলে না, তখন আর স্বেচ্ছাদত্ত সামান্য অর্থের উপর নির্ভর করা অসম্ভব হয়। তখন শক্তি প্রয়োগের দ্বারা সমাজের নিকট হইতেই অর্থ লইতে হয়। এইরূপ বল প্রয়োগের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ প্রথমতঃ অন্যায় বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় এরূপ পন্থা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। বিপ্লবকার্য যদি সমাজের মঙ্গলের জন্যই হয়, তবে তাহার জন্য সমাজেরই নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। সত্য বটে, সমাজের ইচ্ছার

বিরুদ্ধে লইলে তাহা অন্যায়। কিন্তু দেহ পীড়িত হইলে ঔষধ তাহার মুখে কটু লাগিতেই পারে ; চিকিৎসক ঔষধের কটুতা কি মিষ্টতা বিচার করেন না ; যাহা প্রয়োজন হইবে, তাহা বলপ্রয়োগের দ্বারাও প্রয়োগ করিতে তিনি পরামর্শ দেন। বিপ্লবকারীরাও পীড়িত সমাজের চিকিৎসক স্বরূপ। সমাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহাদিগকে কার্য করিতে হইবে, যেহেতু সমাজকে মৃত্যু মুখ হইতে বাঁচানই তাহাদের উদ্দেশ্য। আর একটা কথা—এরূপ কার্য বে-আইনী বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখা উচিত—আইনের মূল উদ্দেশ্যই সমাজের মঙ্গল সাধন। সমাজের উৎপত্তি, স্থিতি, রাজশক্তির উৎপত্তি, আইনকানুনের উৎপত্তি ইত্যাদি কতকগুলি মৌলিক তত্ত্ব চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই সকল সমাজ নিজেরই মঙ্গলের জন্য নিজেই স্থাপন করিয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে তাহার পরিবর্তনও করিতে তাহার অধিকার আছে। সুতরাং সমাজের ন্যায় অন্যায় সমাজেরই মঙ্গলা-মঙ্গলের তুলাদণ্ডে ঠিক হইয়া থাকে। অত্যাচারী রাজশক্তি স্বেচ্ছাচারিতার বশে লক্ষ লক্ষ আইন প্রণয়ন করিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া সমাজ তাহা প্রতিপালন করিতে বাধ্য নহে ; বরং এরূপ রাজশক্তিকে ধ্বংস করাই তাহার কর্তব্য। তৃতীয়তঃ চুরি ডাকাতি দোষ বলিয়া গণ্য হয় কেন? ব্যক্তি বিশেষের পরিশ্রমলব্ধ অর্থাদি অপর এক ব্যক্তি বল প্রয়োগের দ্বারা গ্রহণ করিলে সমাজ চলিতে পারে না। যে কারণ উৎপন্ন করিয়াছে, ফলও সেই ভোগ করিবে—ইহাই বিশ্বের নিয়ম। সমাজে তত্ত্বের মূল নিয়মও এই। কিন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত যে, সমাজের ব্যক্তিবর্গের মঙ্গলের জন্যই এই নিয়ম আইনে পরিণত করা হইয়াছে। সুতরাং উচ্চতর মঙ্গলের জন্য এই ক্ষুদ্র মঙ্গলটীকে ভঙ্গ করায় কোনও পাপ নাই, বরং পুণ্য আছে। সুতরাং বৈপ্লবিকেরা যদি সমাজের কৃপণ বা বিলাসী ধনীদিগের নিকট বলপ্রয়োগের দ্বারা অর্থগ্রহণ করে, তাহাদের সে কার্য সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

দ্বিতীয়তঃ অস্ত্র সংগ্রহের সময় আসিলে অনেক বৈপ্লবিকেরা প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির অর্থ লুণ্ঠন দ্বারাও অর্থসংগ্রহ করিয়া থাকে। এ কার্যটীও সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। কারণ রাজকোষ প্রজাদত্ত অর্থের দ্বারাই পূর্ণ হইয়া থাকে, যে মুহূর্ত হইতে রাজশক্তি প্রজার মঙ্গলকে পদদলিত করিতে আরম্ভ করে, সেই মুহূর্ত হইতেই প্রজার অর্থেও তাহার দাবী ন্যায়তঃ অদৃশ্য

হইয়া যায়। তখন সে যাহা লয় তাহা কেবল বলপ্রয়োগের দ্বারাই লইয়া থাকে। অতএব বৈপ্লবিকেরা যখন ভবিষ্যৎ রাজশক্তির সৈন্যরূপে দণ্ডায়মান হয়, তখন বর্তমান রাজশক্তির বলপ্রয়োগের দ্বারা লব্ধ অর্থে তাহাদের সম্পূর্ণ দাবী আছে। বর্তমান রাজশক্তিই তখন দস্যু বলিয়া বিবেচিত হয়; সুতরাং তাহার অপহৃত অর্থে ভবিষ্যৎ রাজশক্তির স্থাপনের ব্যয় নির্বাহ হইলে কোনই দোষ নাই।

অবশেষে বিপ্লবকার্য যখন প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হয়, তখন প্রকাশ্য ভাবে প্রজার নিকট কর লইতে হয়। অব্যবস্থিত যুদ্ধের দ্বারাও তখন বহু অর্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

বিপ্লব তত্ত্ব

(৩)

অস্ত্র সংগ্রহ

আমরা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি যে বিপ্লবের উদ্যোগের দুইটী স্তর আছে—লোকমত গঠন এবং পশুবল বা অস্ত্র সংগ্রহ। লোকমত গঠন কিরূপে করিতে হয়, তাহা গতবারে দেখাইয়াছি। বিপ্লব সাধন করিবার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ কিরূপে হইয়া থাকে, তাহাই এক্ষণে দেখাইব।

যখন কোন জাতি স্বাধীন হইবই হইব বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া দণ্ডায়মান হয়, তখন তাহার অস্ত্র সংগ্রহে বড় বিলম্ব হয় না। বাঙ্গলায় একটা প্রবাদ আছে—"গরু হইলে রাখালের ভাবনা হইবে না।" রাজনীতিক জগতেও ঠিক এই ভাবেই বলা যাইতে পারে—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকিলে অস্ত্র আপনিই আসে। অস্ত্র শস্ত্র কিছু জাতি বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের দেবদত্ত বা বরলব্ধ সম্পত্তি নহে। অস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল

সরঞ্জামের প্রয়োজন, সকল দেশেই তাহা অল্পবিস্তর পরিমাণে আছে। দৃঢ়পণ থাকিলেই এই সরঞ্জামের দ্বারা উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রস্তুত করা কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। বিশ বৎসর পূর্বে কে কল্পনা করিতে পারিত যে আজ প্রাচ্য জাপান অস্ত্র নির্মাণে পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষাও একস্তর উচ্চে উঠিবে? প্রয়োজন হইলে তদনুযায়ী দ্রব্যাদি সংগ্রহে কোনও কালেই বিলম্ব হয় না।

সকল দেশেই অস্ত্র সংগ্রহ ব্যাপারে তিনটী প্রধান পন্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করিলাম। অবশ্য সকলগুলিই যে একেবারে অবলম্বিত হয় তাহা নহে। অবস্থা বিশেষে একটীতেও কার্য সাধিত হয়; কখনও তিনটীই গ্রহণ করিতে হয়। স্বাধীনতা লাভের জন্য যখন একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তখন যে কোন উপায়েই হউক লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা হয়, এমন কি চুরি ডাকাতি করিয়াও যদি অর্থসংগ্রহের প্রয়োজন হয়, তাহাতেও স্বাধীনতালিপ্সু জাতি পশ্চাৎপদ হয় না। সুতরাং অস্ত্রসংগ্রহ ব্যাপারে সদসৎ বিবেচনা কিছুই থাকে না; সকলই স্বাধীনতা-দেবীর চরণে বিসর্জিত হইয়া থাকে। যাহা হউক এক্ষণে দেখা যাউক এই তিনটী উপায় কি।

প্রথম উপায়—কোনও গোপনস্থানে নিঃশব্দে অস্ত্র প্রস্তুত করা। আমেরিকার মার্কিণ যুক্তরাজ্য যখন স্বাধীন হইবার জন্য উদ্যোগ করে, তখন সে বয়কট ঘোষণা করিয়া অস্ত্র এবং সৈন্যসংগ্রহে নিযুক্ত হয়। নিজেরাই দেশে যতদূর সাধ্য কামান, গোলাগুলি প্রস্তুত করিয়াছিল। রুষের বিপ্লবেও যে সকল বোমা ইত্যাদির কার্য কলাপ প্রত্যহ সংবাদ পত্রে পাঠ করা যায়, তাহার প্রায় সমস্তই ভূগর্ভের কোনও নিভৃত কক্ষেতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। অস্ত্র প্রস্তুত কার্যটা এমন কিছু অদ্ভুতব্যাপার নহে যে তাহা পরাধীন জাতির বুদ্ধির অসাধ্য হইবে। এক দেশের মনুষ্যের যাহা সাধ্য, অপর দেশের মনুষ্যের দ্বারাও যে তাহা সম্ভব, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। যাহা হউক পরাধীন জাতি যখন এরূপ আকাঙ্ক্ষা লইয়া দণ্ডায়মান হয়, তখন সে অত্যাচারী রাজশক্তির দৃষ্টির অন্তরালে বিদেশে অস্ত্র প্রস্তুতকরণ বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য লোক পাঠাইতে থাকে। এই সকল লোক ফিরিয়া আসিয়া উৎসাহী যুবকদলকে লইয়া কামান বন্দুক ইত্যাদি নির্মাণ করে।

দ্বিতীয় উপায়—বিদেশ হইতে অস্ত্র শস্ত্রের আমদানী। যাঁহারা ইউরোপের বন্দুকের কারখানাগুলির খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে নানাদেশের বিদ্রোহীদিগকে বন্দুক আদি সরবরাহ করিয়াই এই সকল বন্দুকওয়ালা জীবিত আছেন। সকল দেশেই গভর্ণমেণ্ট নিজের কারখানা হইতেই বন্দুক তৈয়ারী করে, ইহাদের নিকট ক্রয় করিতে যায় না। সাধারণ লোকেও এত বন্দুক ক্রয় করে না যে তাহাদের জন্য বড় বড় কারখানা চলিতে পারে। সুতরাং এই সকল বন্দুকওয়ালা যদি বিদেশের বিদ্রোহী দলকে সরবরাহ না করে, তাহা হইলে তাহাদের লাভই হয় না। জার্মাণীর এক সাহেব একবার একখানি মাসিক পত্রিকাতে লিখিয়াছিলেন যে, বিদ্রোহী দলকে বন্দুক ইত্যাদি সরবরাহ করার মত লাভজনক ব্যবসায় অতি কমই আছে। এই জন্যই দেখিতে পাই যে আফ্রীদিরা ও উত্তর আফ্রিকার মোল্লার সৈন্যেরা ইংরাজের সহিত ইংরাজেরই দেশের বন্দুক ইত্যাদি লইয়া যুদ্ধ করিয়াছে। অর্থ দিতে পারিলে পাশ্চাত্য জাতি শুধু বন্দুক কেন, নিজের জন্মভূমিকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে পারে।

তৃতীয় উপায়—স্বদেশীয় সৈন্যের সাহায্য। সকল দেশে বিপ্লবকারীদের সহিত একমতাবলম্বী লোক রাজশক্তির সৈন্যদলেও অনেক থাকে। দেশের লোক যখন স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করে, তখন তাহাদেরও হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। তাহারাও তখন জন্মভূমির প্রতি তাহাদের কর্তব্য উপলব্ধি করিতে থাকে। এই সকল সৈন্য যদিও পেটের দায়ে অত্যাচারী রাজশক্তির সরকারে চাকুরী গ্রহণ করে, তথাপি তাহারা রক্তমাংস গঠিত মানুষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহারাও চিন্তা করিতে জানে, সুতরাং তাহাদিগকে বিপ্লবকারীরা যখন দেশের দুঃখদুর্দশার কথা বুঝাইয়া দেয়, তখন তাহারা যথাসময়ে রাজশক্তির দত্ত অস্ত্র লইয়াই বিপ্লবকারীদের দলপুষ্ট করিয়া থাকে। ফরাসী বিপ্লবে ঠিক এইরূপ ভাবই দেখা যায়। রুশ সম্রাটের সৈন্যদলেও এইরূপ দেশভক্ত লোকের সংখ্যা কম নহে। ইংলণ্ডেও যখন প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে প্রজাবর্গ যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন রাজার নিজের সৈন্যের অনেকেই ক্রমওয়েলের দল পুষ্ট করিয়াছিল। সৈন্যদিগকে এইরূপ বুঝান যায় বলিয়াই ভারতের বর্তমান ইংরাজ রাজ চতুর বাঙ্গালীকে সৈন্য দলে প্রবেশ করিতে দেয় না।

এই তিনটী প্রধান উপায় ব্যতীত অস্ত্র সংগ্রহের জন্য অন্য অনেক উপায় আছে। অবস্থা বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। বৈদেশিক রাজশক্তির সহায়তা লাভ করিয়া তাহা দ্বারা গোপনে অস্ত্র সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। ইটালী যখন স্বাধীনতার জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন ফরাসী দেশ তাহাকে নানারূপে সাহায্য করিয়াছিল। যাহা হউক আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতে বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে যে অস্ত্র সংগ্রহ ব্যাপারটা এমন কিছু কঠিন কার্য নহে। আর যদিই বা কঠিন হয় তাহাতেই বা কি? বিপ্লব আনয়ন না করিলে যখন দেশের বা সমাজের কোনও মঙ্গল সম্ভবপর হয় না, তখন যে কোন উপায়েই হউক মন্ত্রের সাধন করা চাইই। মোক্ষ লাভের জন্য যে যোগীর হৃদয় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, সাধনপথের বাধাবিঘ্ন তাহাকে নিরস্ত করিতে পারে না। বরং সংসারে বন্ধনই তাহার হৃদয়কে অসহ্য যন্ত্রণা দিতে থাকে। সমাজের মুক্তিকামী লোকের হৃদয়ও বিঘ্ন দেখিয়া ভয় পায় না। পরাধীনতাই বরং তাহার অসহ্য হয়। সুতরাং অস্ত্র সংগ্রহ ব্যাপার তাহার নিকট গুরুতর বলিয়া বোধ হয় না।

ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা

একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় থিয়সফিষ্ট বন্ধু বলিলেন—"ভারত বড় হয়েছিল ধর্ম্মে, রাজনীতির চোটে নয়। আর এখন যদি আমরা পশু বলে বড় হতে চাই ত সেটা ভ্রান্তি।"

ছেলে বুড়া অনেকেরই মুখে মাঝে মাঝে এইরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সুতরাং কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা বোধ হয় অসাময়িক হইবে না।

প্রাচীনকালে যাগযজ্ঞগুলির নাম ছিল ধর্ম্ম। সেগুলি যজমানদিগের ঐহিক ও পারত্রিক সুখকামনায় অনুষ্ঠিত হইত। ইহকালে ভোগৈশ্বর্য ও

পরকালে স্বর্গলাভ এই ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ধর্মকার্যগুলি সমস্তই প্রবৃত্তি ও ক্রিয়ামূলক। এমন কি আচার্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ বেদের যে অংশগুলি ক্রিয়ামূলক নহে সেগুলিকে বেদ বলিয়াই স্বীকার করিতেন না। "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যং অতদর্থানাম্"। ইহা পূর্ব-মীমাংসকগণের মত।

বেদের আর এক অংশ ছিল—তাহা নিবৃত্তিমূলক। কর্ম কেবল জন্মের পর জন্ম আনিয়া ফেলে। সুখদুঃখের চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া মানুষ যখন মুক্তির জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে তখন উপনিষদ তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যার ও শান্তির পথ দেখাইয়া দেন। বেদের এই নিবৃত্তিমূলক অংশ কর্মকে হেয় জ্ঞান করেন।

অতি প্রাচীনকালে এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক ব্যবস্থাগুলি পরস্পর কতকটা বিরোধী ছিল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু উত্তরকালে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছিল। প্রবৃত্তির মধ্যে আমাদের জন্ম ও নিবৃত্তির মধ্যে আমাদের চিরশান্তি। কাহাকেও একেবারে ছাড়িবার আমাদের উপায় নাই। অতএব প্রবৃত্তিকে কিরূপে ধীরে ধীরে সংযত করিয়া নিবৃত্তির পথে পরিচালিত করিতে হইবে—ইহাই জীবনের সমস্যা; এবং ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই সমস্যার যে সুন্দর মীমাংসা হইয়াছে তাহা লইয়াই ভারতের আর্যসভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব। যে সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি মানিয়া চলিলে প্রবৃত্তিগুলি সুসংস্কৃত হইয়া মানুষকে মোহের পথ দেখাইয়া দেয়—এক কথায় বলিতে গেলে সেই বিধিনিষেধগুলি কর্তৃক পরিচালিত হওয়ার নামই ধর্মসাধন।

মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের সহায়তার জন্যই পূর্বকালে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য হইতে সন্ন্যাস পর্যন্ত আশ্রমধর্মগুলি পালন করিলে মানুষ ভূমানন্দের অধিকারী হইত, কিন্তু সাধারণতঃ পূর্বাশ্রমের কার্যগুলি অনুষ্ঠান করিবার পূর্বে কাহারও পরবর্তী আশ্রম গ্রহণের অধিকার জন্মিত না। এবং এক আশ্রমের পক্ষে যাহা ধর্ম, অন্য আশ্রমের পক্ষে তাহা সকল সময় ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হইত না।

সুতরাং এটা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে 'ধর্ম' বলিতে একটা সর্বব্যাপক বস্তু বুঝায়; এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা রাজধর্ম, গার্হস্থ্য ধর্ম বা যতি ধর্ম সেই

এক মনুষ্যত্ব বিকাশোপযোগী মহাধর্মের অন্তর্নিবিষ্ট। রাজনীতিই হোক বা Religionই হোক সমস্তই এই বিরাট ধর্মের এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। অংশধর্মগুলির বিকাশ না হইলে ব্যাপকতর ধর্মের বিকাশ হইতে পারে না; সুতরাং "ভারতবর্ষ ধর্মে বড় হইয়াছিল, রাজনীতিতে নহে" এ কথার কোনও অর্থ নাই। আমরা "ধর্ম" কথাটার সহিত ইংরাজী Religion কথাটার গোলমাল করিয়া বসিয়া আছি। ধর্ম বলিতে নব্য সম্প্রদায় ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের কেহ কেহ আজকাল ব্রাহ্মণ্যধর্মের ও যতি ধর্মের অংশ মাত্রকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ফলে আমরা গৃহস্থ ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি। পিতৃঋণ পরিশোধেই এখন গৃহীর কর্তব্য শেষ হইয়া দাঁড়াইতেছে, পিতামাতাকে সেবার ন্যায় সমাজ ও জাতির রক্ষা ও সেবা যে গৃহীর অবশ্য কর্তব্য একথা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি, ধর্মের পূর্ণ মূর্তি আর আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতেছে না। সত্ত্বগুণের ভাণ করিয়া আমরা তমোগুণের হ্রদে ডুবিতে বসিয়াছি। ক্ষমার নাম করিয়া আমরা কাপুরুষতার প্রশ্রয় দিতেছি।

ধর্ম সাধনের জন্য আত্মরক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য যে পশুবলেরও আবশ্যক একথা ভুলিয়া আমরা সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছি। ভারতবর্ষে যখন ধর্মের পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল তখন তাহা কেবল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিকাশ নহে, ক্ষাত্রতেজ ও বৈশ্যের অর্থনীতিও তাহার সহিত সম্মিলিত ছিল। যজ্ঞের বিঘ্ন উপস্থিত হইলে মুনিঋষিকেও রাজার নিকট রাক্ষস বধের জন্য আবেদন করিতে হইত। অসুরের প্রতাপে ধরিত্রী পীড়িতা হইলে ভগবানকে অসুর বধ করিয়া ধর্মরক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইতে হইত। কারুণ্য-প্রতিমূর্তি ভগবান বুদ্ধকেও একদিন বুঝিতে হইয়াছিল যে, ধর্ম সাধনের জন্য শরীর রক্ষার প্রয়োজন। আর কর্ম ও জ্ঞানের যাহাতে পূর্ণবিকাশ, ভোগ ও ত্যাগের যিনি সম্মিলন স্থল, তিনিও ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্যই কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের আয়োজন করিয়াছিলেন। জ্ঞানরূপী ব্রাহ্মণ সমাজের মস্তক স্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সেই মস্তক রক্ষা করিবার জন্য যে ক্ষত্রিয়ের ভীমবাহু বিশেষ প্রয়োজন একথা ভারতবর্ষ বিস্মৃত হয় নাই। আর যতদিন বিস্মৃত হয় নাই ততদিনই ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল।

যেদিন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ভারতের ক্ষাত্রতেজ নির্বাপিত প্রায়

সেইদিনই এদেশে কলির 'প্রথম প্রবেশ। পরীক্ষিতের কোষমধ্যে অসির ঝনৎকার ধ্বনি শুনিয়া কলি আরও কিছুদিন চুপ করিয়াছিল; কিন্তু পরীক্ষিতের তক্ষক দংশনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণের সূত্রপাত। বহুবিধ অনার্য জাতির সংশ্রবে আর্য আচার ক্রমে কলুষিত হইয়া উঠিল। ভাবপ্রবণ বৌদ্ধধর্ম আসিয়া বৈদিক ধর্মকে হীনশ্রী করিয়া দিল। কর্মমার্গের হীনতা দেখাইয়া বৌদ্ধ আচার্যগণ সকলের জন্যেই ত্যাগমার্গের ব্যবস্থা করিলেন। এক এক মঠে দশ বিশ সহস্র সন্ন্যাসীর (?) সমাবেশ হইল। মহারাজ ধর্মাশোক তরবারির চোটে ভারতে পশু হত্যা নিবারণ করিয়া এক কথায় মানুষকে নিবৃত্তিমার্গে টানিয়া তুলিতে গেলেন। ফলে ভারত নিবীর্য হইয়া পড়িল। আত্মরক্ষায় অশক্ত হইয়া দাঁড়াইল। শক, হুণ প্রভৃতি বহুবিধ জাতি আসিয়া ভারতবর্ষে রাজ্য পাতিয়া বসিল।

পৌরাণিক যুগে আবার নূতন ক্ষত্রিয় জাতি উঠিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। "গান্ধ'র অবধি সীমা" আবার নবজীবন সঞ্চারে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু হায়! সেই সৌভাগ্য গর্বের মধ্যেই আমাদের পতনের বীজ নিহিত ছিল। নূতন করিয়া সমাজ গঠন করিবার সময় আমরা যাহাদিগকে হীনজাতি ভাবিয়া সমাজের একপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম তাহারা কেহ স্বদেশপ্রেমে সঞ্জীবিত হয় নাই। দেশ যেন কেবল ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের অন্য জাতি যেন কেহই নহে তাহারও ফল ফলিল। রাজপুত দিগের প্রতাপ যখন গৃহকলহে ব্যয়িত হইতে লাগিল; যুদ্ধ যে কেবল সমর কৌশল দেখাইবার জন্য নহে, স্বদেশ ও স্বধর্ম রক্ষার জন্য—একথা যখন রাজপুতরা ভুলিয়া গেল, তখন পশ্চিম হইতে ঝঞ্ঝাবায়ুর মত আসিয়া তুর্কীরা দেশ অধিকার করিয়া ফেলিল। অনাদরে অব্যবহারে ভারতের ব্রহ্মজ্ঞান ও ক্ষাত্রবীর্য নিষ্প্রভ হইতে লাগিল।

সমাজের বাহু গেল, মস্তক গেল, কিন্তু মোগল-পাঠানের সময় প্রাণটুকু যায় নাই, বৈশ্যশক্তি তখনও সজীব ছিল। ইংরাজের শুভাগমনে বুঝি তাহাও আর থাকে না। শৌর্য বীর্য গিয়াছে, জ্ঞান গৌরব গিয়াছে—প্রাণটুকুও যাইতে বসিয়াছে। এইবার বুঝি সমস্ত জাতিটা বা ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায়! তবে ভারতের আজ মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত! জগতের *শিক্ষা গুরুর কি শেষে এই পরিণাম!*—তাহা নহে। অমাবস্যার

গাঢ় অন্ধকারের পর ঐ দেখ পশ্চিম আকাশে প্রতিপচ্চন্দ্রের এককণা দেখা দিয়াছে। মাভৈঃ মাভৈঃ।

মিসর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম সকলেই জগতের উন্নতির জন্য আপন আপন সঞ্চিত জ্ঞান বিতরণ করিয়া অতীতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমরা ত মরি নাই—জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে আমাদের এমনও কিছু দিবার আছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় মহাধর্মের কথা এখনও আমাদের জগতের সমক্ষে প্রচার করিতে হইবে বলিয়া আমরা মরি নাই। সেইজন্যই আবার আমাদের বাঁচিয়া উঠিতে হইবে; স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। শক, হুণ, পারসী, গ্রীক, পাঠান, তুর্কী-একে একে সকলেই আসিয়া ভারতবর্ষে রাজ্য পাতিয়াছিল; কিন্তু ভারতবর্ষও প্রতিবার তাহাদের নিকট হইতে রাজশক্তি কাড়িয়া লইবার জন্য রাজপুত, শিখ, মারাঠা প্রভৃতি নূতন নূতন বীর জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। আর আজ ইউরোপীয় জাতি আসিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছে বলিয়াই কি ভারতবর্ষ হীন হইয়া থাকিবে? এবার অচিরে স্বাধীনতা লাভ ভিন্ন আর অন্য কোনও পথ নাই!

তবে উপায়?

—এবার আর জাতিবিশেষের উপর স্বাধীনতা অর্জনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। দেশ সকলের, সুতরাং সকলকেই স্বদেশের মুক্তির জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। এখন সকলকে বুঝিতে হইবে যে এ যুগের ধর্ম সাধনক্ষেত্র বনে বা কোণে নহে—রুধির প্লাবিত সমর প্রাঙ্গণে। ব্রাহ্মণকে এখন শিখিতে হইবে যে ভারতের জ্ঞান ভাণ্ডার রক্ষার জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন, এবং স্বাধীনতা লাভের চেষ্টাই ধর্মসাধনের প্রথম সোপান। ক্ষত্রিয়কে বুঝিতে হইবে যে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণদান অপেক্ষা তাহার পক্ষে আর উচ্চতর ধর্ম নাই। বৈশ্যকে বুঝিতে হইবে যে ভারতের ধনভাণ্ডার অপহরণের পথে বাধা দিতে গেলে স্বাধীনতা লাভ ভিন্ন আর উপায় নাই। আর শূদ্রের পক্ষে স্বদেশের সেবাই একমাত্র ধর্ম। সাধুকে এখন কিছুদিন মালাজপ স্থগিত রাখিয়া বিশ্বজননীকে জন্মভূমি মূলেতে উপাসনা করিতে হইবে, এবং সর্বসাধারণকে এই শিক্ষা দিতে হইবে যে আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য ঐহিক মুক্তির একান্ত প্রয়োজন। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"। যে দুর্বল, পরপদানত, সে কখনও আত্মশক্তির

পূর্ণ বিকাশ না দেখিয়া মুক্তিলাভে অধিকারী হইতে পারে না। যে পরাধীন, তাহার পক্ষে কখনও ধার্মিক হওয়া সম্ভবপর নহে; গুরুর আর এখন ইহা ভিন্ন অন্য কিছু শিখাইবার নাই, ছাত্রেরও আর শিখিবার অন্য কিছু নাই। ইহাই এখন যুগধর্ম।

নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে এই আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দাও। এবং যখন ইহা প্রবল হইয়া উঠিবে তখন ম্লেচ্ছ নিবহ নিধন করিবার জন্য, সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য, যিনি অবতীর্ণ হইবেন, এস আমরা তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদানুসরণের জন্য প্রস্তুত হই।

বিরোধ ও শত্রুতা

* * *

যিনি ন্যায়পরায়ণতাকে আপনার প্রকৃতিগত বা স্বভাবসিদ্ধ করিতে চান, ন্যায়ের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বীরভাবে তাঁহাকে দণ্ডায়মান হইতে হইবে; যিনি ধর্ম চান, ধর্মের অপমান অপনোদিত করিবার জন্য তাঁহাকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। যে দেশে বৃহৎ আকারে অন্যায় আচরিত হয়, সে দেশ যুদ্ধে জয়ী হইয়া ন্যায়নিষ্ঠ হইবে, অথবা জড়তার মোহবশে অন্যায় ও পাপে মগ্ন হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। অন্যায় ও অধর্মের সহিত বিরোধ ও শত্রুতা শুধু যে ধর্মসঙ্গত তাহা নহে—দুর্বল, নির্জীব, পাপগ্রস্ত জাতির পক্ষে উহা সঞ্জীবনী শক্তির উদ্বোধক, নবজীবনলাভের একমাত্র উপায়। কর্মেই মানুষ সংশোধিত ও সংস্কৃত হয়, ভাবের দ্বারা স্রোতের মুখ ফিরে মাত্র। দুর্বলতা ও বিশ্বাসহীনতা যাহাদের মজ্জাগত হইয়াছে, তাহাদের সংস্কার ও সংশোধনের নিমিত্ত উত্তালতরঙ্গ দুর্দমনীয় এক ভীষণ

কর্মবন্যার আবশ্যক। ধর্মকে অক্ষুণ্ণ ও জয়ী করিবার জন্য যে বিরোধ ও শত্রুতা, উহাই এই প্রবল কর্ম-বন্যার পূর্ব-সূচনা।

বঙ্গবাসি, তুমি কি আজও অস্বীকার করিতে পার যে তোমার ভবিষ্যদাকাশ এক ভীষণ শত্রুতার ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে? যে দুর্বল ও বিশ্বাসহীন, যে কর্মসংগ্রাম হইতে আপনাকে সহজেই সুদূরে সরাইয়া রাখিতে চায় তাহার প্রাণ যেন কোন মতেই আজ স্বীকার করিবে না যে আমরা বিরোধ ও শত্রুতার মধ্যে উপনীত হইয়াছি। যে ভবিষ্যৎ সাংসারিক জীবনের কত সুরঞ্জিত সুখ, আশা, কল্পনার মোহন ছবি আঁকিয়া নিশিদিন জল্পনা করিতেছিল, বিরোধ ও শত্রুতার ভেরীধ্বনিতে পাছে তাহার সুখ স্বপন ভাঙ্গিয়া যায় তাই তাড়াতাড়ি সে তাহার কর্ণবিবর ঐ দেখ চাপিয়া ধরিতেছে, সে স্বদেশের আহ্বান শুনিয়াও শুনিতে চাহে না। যে প্রথমাবস্থায় স্বদেশপ্রেমের প্ররোচনায় বহির্মুখী স্বদেশ সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া, সেই সেবার মাহাত্ম্যে কর্মশীল ও যশোশালী হইয়া উঠিয়াছে, সে আজ আচম্বিতে বিরোধ ও শত্রুতার নিষ্ঠুর আহ্বানে সচকিতভাবে তাহার চিরাভ্যস্ত সুপরিচিত বরদাত্রী বহির্মুখী সাধনাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া নয়ন সজোরে মুদ্রিত করিয়া আছে !!

সর্ববিধ বাদ্য সজোরে বাজাইতে বাজাইতে যাত্রার নেতৃগণ বহুক্ষণ যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিলেও, অতৃপ্ত সুপ্তিঘোর যেমন চক্ষু ছাড়ে না বলিয়া অনেকে আসরে বসিয়াও ঢুলিতে থাকে এবং মাঝে মাঝে ঘুমাইয়া পড়ে ও আবার জাগিয়া উঠে, তেমনি বঙ্গভঙ্গমঞ্চে বিরোধ ও শত্রুতার অভিনয় সমারোহে আরব্ধ হইয়া গেলেও, হে বাঙ্গালি, তুমি দুর্বলতা, স্বার্থপরতা বা ভাবপ্রবণতার সুপ্তিঘোর কাটাইতে পারিতেছ না। কিন্তু সেই নিদ্রালসতা ঠেলিয়া উন্মীলিত চক্ষে চাহিয়া দেখ, কখন যাত্রা সুরু হইয়া গিয়াছে, তুমি আসরে বসিয়া ঢুলিতেছ।

যে নির্বোধ সেই প্রকৃত বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া সেই বস্তুর অভাবজনিত স্বচ্ছন্দতালাভে প্রয়াসী হয়। ছেলেরা ভয় পাইলে চক্ষু বুজিয়া থাকে, কিন্তু ভয়কে নিরাকৃত করিতে হইলে চক্ষুর সাহায্য যে অপরিহার্য তাহা সে জানে না।০ বিরোধ ও শত্রুতা আরম্ভ হইয়াছে ইহা যদি আমরা অস্বীকার করি, তবে শত্রু বলবত্তর হইয়া উঠিবে। শত্রুর অভিপ্রায় এই

যে বিরোধ ও ভীষণ শত্রুতার অস্তিত্ব আমাদের হৃদয়ঙ্গম না হয়। আমরা স্বেচ্ছায় যদি শত্রুর অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করি, তবে আমাদিগের সহস্রবার ধিক্‌!

হে বঙ্গবাসি, যদি মুক্তি চাও, যদি নবজীবন চাও, যদি প্রকৃতভাবে অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, মনুষ্যের মত নিজস্বার্থকে নিরাপদ ও স্থায়ীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাও, তবে ভগবৎ প্রেরিত বিরোধ ও শত্রুতাকে সমাদরে আহ্বান করিয়া স্বগৃহে আসন দান কর। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐকান্তিক অনুকরণ, রাজশক্তির পদচর্যা ও পদলেহন, রাজভক্তির আয়াসপূর্ণ মনুষ্যত্ববিনাশী অনুশীলন, সহস্র লাঞ্ছনাপূর্ণ আবেদন নিবেদন তোমাকে যে সকল স্বত্ব প্রদান করে নাই ও করিতে পারে না, বিরোধ ও শত্রুতার নিকট সে সমস্তই এককালে প্রাপ্ত হইবে। বিরোধ ও শত্রুতাই তোমাকে মনুষ্য সমাজে উন্নত করিবে ও ভারতজননীর সমুন্নত উজ্জ্বল শিরে স্বাধীনতা মুকুট পরাইয়া দিবে। ভগবৎ প্রেরিত বিরোধ ও শত্রুতাকে আরও যদি পরিহার কর, তবে নিশ্চয় জানিও "বন্দে মাতরম্" বলিয়া যে জননীকে আহ্বান করিয়া থাক, তৎসঙ্গে তাঁহাকেও বর্জন করিবে; তাহা হইলে জানিও যে "বন্দে মাতরম্" নিষ্ঠুর গালি ও শ্লেষবাক্যে পরিণত হইয়া জগৎপূজ্য ভারতজননীর প্রতি আরোপিত হইবে !!

বিরোধ ও শত্রুতা অবলম্বন করিলে কিরূপে কর্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে? বিচার করিয়া দেখ, শত্রু কিভাবে স্বীয় কর্মপথে অগ্রসর হইতেছে। তাহার প্রধান মন্ত্র "বিষকুম্ভং পয়োমুখং" ও দ্বিতীয় মন্ত্র "রাখ খড়্গ শানাইয়া সেই দিন তরে, যেদিন দৈবাৎ হবে আহ্বান সমরে"*; তৃতীয়, শত্রুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধা বিপত্তিতে ব্যাপৃত ও ব্যস্ত রাখা। এক একটি মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক।

১। মনে মনে ভদ্রতার খাতির ও ঠাট বজায় রাখিতে গিয়া যদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটুকু না হারাও তবে মনোযোগ সহকারে ইতিহাস পাঠ করিলেই বুঝিবে যে আমাদের বিদেশী বিজেতারা "বিষকুম্ভং পয়োমুখং" মন্ত্রের কেমন পূর্ণ সার্থকতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের মুখ পয়োময় রাখা বড় কঠিন নহে; যাঁহারা অন্যায় দেখিলে সংযমহীন হন, তাঁহারা শত্রুসংস্রব ত্যাগ

* ইংরাজী "Keep your sword bright against the day of battle"-এর অনুবাদ।

করিলেই চলিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে প্রথমেই সর্বতোভাবে একান্তমনে বিষকুম্ভ হইতে হইবে; এমন বিষ চাই যে প্রতিকার যতদিন না হয় ততদিন বিষে দেহ মন জর্জরিত হইয়া যাইবে। বাঙ্গালি, তোমাকে বিষকুম্ভ হইতে বলিবার সময় বাস্তবিক হৃদয় কম্পমান হইতেছে, আরক্তিম নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিতেছে। এতকাল শত্রু সমক্ষে কি অপূর্ব সরলতার পরিচয় দিয়াছ! জগতে ইহার তুলনা নাই। এক রাজপুত বীরের সরলতা দেখিয়াছি যে সরলতা শত্রুর তীক্ষ্ণ তীরকে মারাত্মক ও অব্যর্থ করিয়া দিত। তোমাকে আজ সরলতা ভুলিতে হইবে। তপস্যার ফলে অধর্ম যখন দুর্জেয় হইয়া উঠে, ধর্ম তখন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সেই ছদ্মবেশে অধর্মকে প্রতারিত করিয়া তাহার ধ্বংসসাধন করে—পুরাণ ইতিহাসে এ কথার অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কার্যোদ্ধার করিবার জন্য বাঙ্গালীকে আজ ঘোর কুটিল নীতিকে আশ্রয় করিতে হইবে। "পয়োমুখং" নীতির স্থান বিশেষে ব্যতিক্রম করা যায়। যে সকল কার্যের দ্বারা দেশে শক্তির উদ্বোধন হয়, সে কার্যগুলি ত্যাগ করা যায় না। শত্রুর সহিত সংঘর্ষে বীরত্ব ও দৃঢ়তার পরিচয় দিলে, দশজন দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি কতকটা সংশোধিত হইতে পারে, এই জন্য মাঝে মাঝে দু এক স্থানে "পয়োমুখের" উল্টা ব্যবস্থাও হিতকর হইতে পারে।

সর্বদা একটা আয়োজন উদ্যোগের ভাব হৃদয়ে পোষণ কর, ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যতের হাতে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, এই মুহূর্তে, এইখানেই ভবিষ্যতের সূচনা করিয়া ফেল—ইহাই কর্মবীরের নীতি। বসিয়া বসিয়া প্রতি পদক্ষেপের সূক্ষ্মতত্ত্বের বিচার করিলে, এক পাও অগ্রসর হইবে না; এই মুহূর্তেই এক পা অগ্রসর হও, আর এক পা আপনি চলিয়া যাইবে এবং শেষে দেখিবে যে বসিয়া বসিয়া যে পথ তমসাচ্ছন্ন দেখিয়াছিলে তাহাতে আলো দেখা যাইতেছে।

* * *

"কেন মিছা ভাব বসি কি ক'রে কি হবে
যেটুকু উন্মুক্ত পথ, গিয়াছ কি তাহে?
বর্তমানে যথাসাধ্য করিলে দেখিবে
যা চাও তা পাবে সবে কালের প্রবাহে।
বসিয়া ভাবিলে শুধু কে কবে সন্ধান পায়
প্রতিপদক্ষেপে পথে তমসা কাটিয়া যায়।"

ভবিষ্যতে যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহার সূচনা এইক্ষণে ও এইখানেই করিতে হইবে। আমাদের শত্রু কেমন উদ্যোগী হইয়া চারিদিক হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া, নিজের আয়ত্তে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, আর আমরা কি অন্ধ হইয়া থাকিব ?

৩। ইংরাজী সমরনীতিতে যাহাকে "কভার" লওয়া বলে রাজনীতিক সাধনায় সে কৌশলের আবশ্যকতা অত্যন্ত অধিক। সর্বদাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধাবিপত্তিতে শত্রুকে ব্যাপৃত রাখিতে হইবে ; আজ বন্দে মাতরং প্রসেশন, কাল কন্‌ফারেন্স, কংগ্রেস, পরশ্ব দিন স্বদেশী বক্তৃতার আস্ফালন ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রবল শত্রুকে প্রলোভনে আকৃষ্ট করিয়া তারপর একটা ঘটনা লইয়া আন্দোলন আস্ফালন করায় কতকগুলি সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে এই সমস্ত হাঙ্গামা আমাদের প্রকৃত সাধনা নহে এগুলি অতি সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র। এই সকলের দ্বারা শত্রুকে ব্যস্ত রাখা যায়। নিজেদের শিক্ষা হয়, দেশও জাগ্রত অবস্থায় থাকে। সাগরের উপরিভাগে তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত, কিন্তু গভীর জলে নিস্তরঙ্গ আবাসে জলজন্তুর জীবনলীলার এইরূপ বৈচিত্র্যের আবশ্যক।

কৃতঘ্নের অর্ঘ্য

ইংরাজ বাঙ্গালীর উপর রীতিমত বিরক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী-বিরাগ তাহার শ্বেতাঙ্গের রক্তাভ ধমনীর মধ্যে প্রবলবেগে ছুটিয়াছে। কি তীব্র বিদ্বেষ! চার পাঁচ জন নিরীহ বাঙ্গালী একত্রিত হইয়া সমস্বরে কোনও সঙ্গীত বা বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে রাজপথের পথিক হইলেই ইংরাজের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে; এরূপ অধীর জাতির হাতে ভারতশাসনদণ্ড বানরকণ্ঠে স্বর্ণহারের মতই শোভা পায় বটে! মৈমনসিংহে হরিসংকীর্তনের মিছিল অথবা "বন্দে মাতরং" এর মিছিল পুলিশকর্তৃক দণ্ডনীয় অপরাধরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এমন কি প্রতিমা বিসর্জনের মিছিল ঐ কারণে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দশজন বাঙ্গালী দলবদ্ধ হইয়া কোন উৎসাহ-জনক কার্যে ব্যাপৃত হইলেই ইংরাজ কাতর হইয়া পড়িতেছেন, দশকণ্ঠে সমস্বরে "বন্দে মাতরম্" উচ্চারিত হইলেই, ইংরাজ বাহাদুর যুগপৎ মুক্তকচ্ছ ও বদ্ধমুষ্ঠি হইয়া উন্মত্তের মত আচরণ করিতেছেন, এ ব্যাপার বড় মন্দ নহে!

লর্ড কার্জন এসিয়ার বৃত্তান্তমূলক একখানি স্বরচিত পুস্তকে বাঙ্গালী "বাবু"র জন্য একটু উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি হৃদয়-কন্দরে বাঙ্গালী দমন রূপ সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যকে অনেকদিন হইতে পোষণ করিয়াছিলেন। এই নিগূঢ় উদ্দেশ্যটী একটী বৃহত্তর অভিপ্রায়েরই অঙ্গীভূত। লাট কার্জন ভাবিতেন যে ভারতে ইংরাজাধিকারকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করিবার জন্য তিনি জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার সকল বিধানের মূলে এই অভিপ্রায়ের অনুপ্রাণন বিদ্যমান ছিল। তিনি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, বঙ্গে বাঙ্গালীর দৃঢ় একতাসাধন হইলে বঙ্গে ইংরাজশক্তির মূল উৎসাদন হইতে পারে। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালার ভূমিতে এখনও রস আছে, এই রসের দ্বারা বাঙ্গালীকে পরিপুষ্ট হইতে না দিয়া উহাকে শোষণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; এই জন্য সরস পূর্ববঙ্গকে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল।

এই বঙ্গব্যবচ্ছেদের পূর্বেও বাঙ্গালী-বিরাগ ইংরাজের আচরণে পরিপুষ্ট

হইত, কিন্তু সেই ধূমায়মান বহ্নি আজ আকাশস্পর্শিনী শিখাসংযোগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। বেশ কথা; যাহা শত্রুর অন্তর্নিহিত তাহা পরিস্ফুট হওয়াই শ্রেয়স্কর ও সুবিধাজনক। ভাই ব্রজেন্দ্র, ভাই কেদার নাথ, তোমরা ইংরাজকে উত্তেজিত করিয়া, তাহার স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া দিয়া বাঙ্গালীর চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছ; তোমরা নির্ভয়ে অবস্থান কর, অত্যাচার অত্যাচারীকে পশুত্ব দান করে, অত্যাচারিতকে দেবত্ব দেয়।

যে বাঙ্গালীর উপর ইংরাজের এত আক্রোশ, সেই বাঙ্গালীর সাহায্যেই সে এখনও ভারতের নবাবী ভোগ করিতেছে, সে কথাটুকু আজ তাহাকে মনে করাইয়া দেওয়া ভাল। যখন কৃতাঞ্জলিপুটে, নতজানু হইয়া মুসলমান রাজার নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতে হইত, সেদিনকার কথা কি আজ মনে আছে? নিজদেশে রাজার সম্মুখে যে সম্মান ও দীনতা কখনও প্রকাশ করিতে হয় নাই, হে ইংরাজ ভারতবর্ষে আত্মরক্ষার জন্য তোমাকে তাহাও করিতে হইয়াছে। নবাবের প্রতি তোমার আবেদন পত্রাদির ভাষা দেখিয়া মনে হয় যে, তোমাকে কি গভীর শান্তিই ভোগ করিতে হইয়াছে। তৎকালীন নবাবদিগের ঔদার্যগুণেই তোমাদের প্রাণরক্ষা হইত, নচেৎ পিশাচবৎ আচারবিহীন ফিরিঙ্গিকুল ভারতে তিষ্ঠিতে পারিত না। সেই দিনকার কথা ভাবিয়া দেখ। সেই গভীর তিমিরের মধ্যে কে উদার ভাবে প্রদীপ হস্তে তোমাকে ভারতের বঙ্গদ্বার দিয়া দেশের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ভাবিয়া দেখ কে তোমাদের প্রথম বিজয়ী সেনাদলকে ভারতের পবিত্র ভূমিতে দাঁড়াইবার স্থান দিয়াছিল। ভাবিয়া দেখ, বজবজ হইতে পলাসী পর্যন্ত কে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে করিতে লইয়া গিয়াছিল। ভাবিয়া দেখ, বঙ্গের রাজমুকুট তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া কে তোমাদিগকে দিল্লীর পথে লইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালী অসার স্বার্থের মোহে অন্ধ হইয়া তোমাকে গৃহপ্রবিষ্ট করে নাই; তাহার মোহ উমিচাঁদের মত স্বার্থপ্রসূত ছিল না; তাহার হতবুদ্ধিতায় তাহার দুর্দশা ঘটিয়াছিল, তা' না হইলে নন্দ কুমারের ফাঁসি হইত না। তুমি অকৃতজ্ঞ, তাই বাঙ্গালীর প্রতি আক্রোশ হওয়া তোমার স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু নিশ্চয়ই জানিও বাঙ্গালী রাণীভবানী প্রদর্শিত] পথ বর্জন করিয়া যে অপরাধ করিয়াছে, অচিরেই তাহাকে উহাঁর উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

তারপর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা ভাবিয়া দেখ। হিন্দুস্থানে সেদিন কে তোমার সহায় হইয়াছিল? যখন বিদ্রোহীদের সমর তরঙ্গাঘাতে পশ্চিমপ্রদেশের স্থানে স্থানে মুষ্টিমেয় ইংরাজকুল শত্রুবেষ্টিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছিল তখন পুত্রসমন্বিতা ইংরাজ ললনাকে কাহারা গৃহে গৃহে রক্ষা করিয়াছিল, তাহা আজ কি কাহারও মনে আছে? সেই ভীষণ বিদ্রোহের সময় ভারতবর্ষের মধ্যে কে একমাত্র বিশ্বাসী বন্ধুর ন্যায় সাধ্যমত তোমাকে রক্ষা করিয়াছিল, সে সময় কাহাদের গৃহে তোমরা সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন বলিয়া ভাবিতে, মনে আছে কি? কাহার বিশ্বস্ততাতরণীতে আরোহণ করিয়া সেই বিদ্রোহতরঙ্গভেদ করিয়াছিলে, আজ মনে আছে কি?

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বিদ্রোহের সময় যে সমস্ত বাঙ্গালী কর্মচারী ইংরাজ সরকারে কাজ করিতেন, তাঁহাদের নিকট এইরূপ জানা যায় যে, সে সময় তাহাদের সাহস ও সহায়তার জন্য অনেক ইংরাজ রমণী বাঁচিয়া গিয়াছিল। অনুসন্ধান করিলেই এই সকল দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। সেই সময় বাঙ্গালী ইংরাজের অনুরক্ত ছিল বলিয়াই ইংরাজ ক্রমশঃ কৌশল বিস্তার করিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে পারিয়াছিল।

আজ বাঙ্গালীর সৌভাগ্য যে, সে ইংরাজের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান তাহাকে স্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার অবসর প্রদান করিতেছেন। বাঙ্গালীকে দমন করিবার সাধ্য ইংরাজের নাই; পলাশীতে বাঙ্গালীকে ইংরাজ দমন করে নাই, পলাশীতে বাঙ্গালী বঙ্গাধিপত্য সম্বন্ধে ইংরাজকে দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন মাত্র। সেদিন ইচ্ছা করিলে মীরমদন-মোহনলাল প্রমুখ বাঙ্গালী ফুৎকারে ক্লাইভকে গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিতে পারিত। যে বাঙ্গালীকে কখনও জয় করে নাই, যে বাঙ্গালীর প্রসাদে আজ রাজরাজেশ্বর, তাহার বলদৃপ্ত বাহুকে ও আরক্তিম নয়নকে বাঙ্গালী ভয় করে না। সমগ্র ভারতকে নাচাইবার কলকাটি বাঙ্গালীর হাতে; কাল যাহাকে তুলিয়াছি, আজ তাহাকে ফেলিতে কি?

আত্মবিস্মৃতি

"আজ যদি ইংরাজ দেশ থেকে চলে যায়, তা'হলে কাল তোমরা উৎসন্ন যাবে।"

একবার খুব সজোরে আমাদের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বন্ধুবর এইরূপে তাহার বক্তৃতার উপসংহার করিলেন।

এক আধ হাত পিছাইয়া বসিয়া একটু সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, বন্ধু কেন? এ আশঙ্কার কারণ কি?" "কেন! তোমাদের কি আছে? কবে কি করেছ?" তর্কস্থল ছাড়িয়া ধীরে ধীরে অতীত স্মৃতিবাহিনী গঙ্গার তীরে আসিয়া বসিলাম। আকাশ নির্মল, তরঙ্গিনীর বক্ষ স্তব্ধ কিন্তু মনের ভিতর সেই একই প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল—"তোমরা কবে কি করেছ?"

গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম সম্ভূতা বঙ্গজননি! তুমি কি চিরদিন আমাদেরই মত কৃমিকীট হৃদয়ে বহন করিয়া আসিতেছ? বৌদ্ধযুগে যাহারা তিব্বত ও চীনে ধর্মের পতাকা প্রোথিত করিয়াছিল, জাপানে ধর্ম মন্দিরের দ্বারে বঙ্গীয় অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত মন্ত্র যাহাদের কীর্তিকলাপ এখনও ঘোষণা করিতেছে, তাহারা কোন্ দেশের সন্তান? সর্বধর্মসমন্বয়কারী তন্ত্রশাস্ত্র কোন্ দেশে উদ্ভাবিত? ভক্তি শাস্ত্রের চরমোৎকর্ষ কোন্ দেশে হইয়াছিল? চৈতন্যদেব কোন্ দেশের? স্বাধীন রাজার অভাবে যখন দেশে অনাচার প্রবেশ করিতেছিল, তখন কোন্ দেশের রঘুনন্দন নব্যস্মৃতির উদ্ভাবন করিয়া সমাজ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? কোন্ দেশের রঘুনাথ জগদীশ নব্যন্যায়ের সৃষ্টি করিয়া প্রতিভার আলোকে ভারত উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন? আর আজ এ দুর্দিনেও যে মহাসত্ত্ব পুরুষের কণ্ঠস্বর চিকাগোতে ধর্মসভায় বেদান্তবার্তা ঘোষণা করিয়া পাশ্চাত্য ধর্মজগতে যুগান্তরের সূত্রপাত করিয়াছে—কোন্ দেশ তাঁহার জন্মভূমি?

শুধু জ্ঞান ও ধর্মের কথা বলি না। যাহার আশ্রয় ভিন্ন জ্ঞান ও ধর্ম বিকশিত ও রক্ষিত হয় না, সেই শক্তিতেও বাঙ্গালী হীন ছিল না। চিরদিন বাংলা দেশ লাঠি খেলিয়া "পুণ্যে বিশাল" হইত না। পাঠানেরা বাংলা

দেশে যে শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল তাহা রাজতন্ত্র (Monarchical form of Government) নহে, feudal system মাত্র। যে সকল ভূম্যধিকারীর উপর দেশের প্রকৃত শাসনভার ছিল তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী। আপন আপন অধিকারের মধ্যে তাঁহারাই সর্বেসর্বা রাজা। অত্যাচারী হইলে তাঁহারা মনের ব্যথা রাজসমীপে নিবেদন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। তাঁহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল বলিয়াই গৌড় বিজয়ের প্রায় ২০০ বৎসর পরেও রাজা গণেশ বাংলার স্বাধীন নরপতি হইতে পরিয়াছিলেন। আর আগন্তুক পাঠানেরা পর্যন্ত তাঁর শাসন প্রণালীতে এতদূর সন্তুষ্ট ছিল যে, "After his death, they claimed him as one of the faithful, and disputed with the Hindus whether his body should be buried according to their rites or burned on the funeral pyre" (Stewart's History of Bengal).

বাঙ্গালীর সে স্বাধীন রাজ্য কাহার বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? পাঠানদিগের প্রাধান্য সময়েও ত্রিপুরা, কোচবিহার, মনিপুর ও কামরূপ রাজ্য পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিত। কামরূপ ও কোচবিহার জয় করিতে গিয়া অনেক পাঠান নরপতিকে কিরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল ইতিহাস পাঠকের নিকট তাহা অবিদিত নাই।

তাহার পর কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসরের জন্য মোগল প্রাধান্য। বার ভূঞার তখনও প্রবল প্রতাপ; প্রতাপাদিত্যের তখন পাটনা পর্যন্ত রাজ্য। বাঙ্গালী তখনও মোগল সম্রাটকে লক্ষ্য করিয়া সদর্পে বলিত—

"লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে।"

অন্যান্য বাঙ্গালীর মধ্যেও প্রতাপাদিত্যের তেজস্বিতার অভাব ছিল না; প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। গৌড়েশ্বর তাহাকে অধীনতা স্বীকার করিয়া কর প্রদান করিতে বলিলে গোয়ালা ইছাই ঘোষ যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আজ এই অনুনাসিক ক্রন্দনের দিনে আবেদনপন্থীদিগকে তাহা একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

তবে আমাদের অভাব ছিল কিসের? কোন্ শক্তির অভাবে

বাংলাদেশে সম্পূর্ণ স্বাধীনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই? সে অভাব শুধু জাতীয় একতা জ্ঞানের।

বহিঃশত্রুর দেশব্যাপী উৎপীড়ন বা আক্রমণ ভয় অনেক সময় নেশন গঠনের সহায়। পাঠান বা মোগলের সময় নানা কারণে এককালে সেরূপ দেশব্যাপী উপদ্রব ঘটিতে পারে নাই। আমরা যে পরাধীন তাহা আমরা সে সময়ে আংশিকভাবে উপলব্ধি করিতাম মাত্র। একটা মনে মনে ক্ষীণ ধারণা ছিল যে, বুঝি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না হইলেও মানুষের চলে। আর সেই জন্যই বাংলায় নেশন গঠন অতি ধীরে ধীরে চলিতেছিল।

আর আজ আমাদের পরম বন্ধু ইংরাজ শাসন, শোষণ ও রেগুলেশন লাঠি দ্বারা এই একতার বিকাশ কত না দ্রুত করিয়া তুলিয়াছেন! এই কার্য সাধনের জন্যই ইংরাজের বঙ্গদেশে পদার্পণ, ও এই কার্য সিদ্ধ হইলেই ইংরাজের এদেশ হইতে—ছুটী।

অতীতের তিমিরগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া বরিশালের লাঠি পর্যন্ত বাংলা দেশে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা ঐ বাঙ্গালী নেশন গঠনের উদ্দেশ্যে। আপনাকে দুর্বল, দীন, হীন ভাবিয়া বিমর্ষ হইও না। আত্ম-বিস্মৃতি মৃত্যুর লক্ষণ। শুনিতেছ মায়ের আগমন বার্তায় দশদিক ভরিয়া গিয়াছে! বৃথা মোহ দূর কর—মায়ের দ্বিসপ্তকোটী ভুজ কবি কল্পনা নহে।

ধর্মরাজ্য ও মহারাজা শিবাজী

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে পুরাণাদি আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, প্রাচীন আর্যসভ্যতায় ধর্মরাজ্যসংস্থাপনরূপ একটী আদর্শ সুব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মহাভারতে বর্ণিত প্রসঙ্গের চরম পরিণতি এই ধর্মরাজ্য স্থাপনরূপ আদর্শের প্রতিষ্ঠায় এবং সেই বিচিত্র ঘটনাচিত্রে কেন্দ্রস্থানীয় ষড়ৈশ্বর্যশালী বসুদেব তনয়ের সকল চেষ্টা ও প্ররোচনার মূলে এই ধর্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠারূপ উদ্দেশ্য যে নিহিত ছিল তাহাও সূক্ষ্ম বিচারণার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। আরও প্রাচীনকাল হইতে দেখা যায় যে, ঋষিদিগের ধর্মসাধনার সর্ববিধ অন্তরায় দূরীভূত করা ভারতের প্রত্যেক নৃপতির একটী প্রধান কর্তব্য ছিল। রাজার রাজ্যে যাহারা বাস করে, বিবিধ অবলম্বনের মধ্য দিয়া পরমপুরুষার্থ সাধনরূপ তাহাদের ধর্মকে সংরক্ষণ করাই রাজার প্রধান কর্তব্য ছিল। দেশে এই ধর্মরক্ষা করিবার জন্যই রাজার আবশ্যকতা ছিল। যে রাজ্যে ধর্ম সুরক্ষিত হইত তাহাকেই ধর্মরাজ্য বলা হইত। যে রাজ্যে ধর্মের বা যজ্ঞের বিঘ্নগুলি অপ্রতিহত থাকিত, সে রাজ্য সাধকদিগের দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। প্রাচীনকালের অনেক সুপ্রসিদ্ধ ঘটনার মূলসূত্র এই ধর্মে বিঘ্ন-সংগঠনে নিহিত। ঋষিদিগের যজ্ঞে বলদৃপ্ত রাক্ষসদের উৎপাত হইতে রামায়ণের সৃষ্টি হইল। ধর্মে "দানবোত্থা বাধা"র প্রতিকার করিবার জন্য বারম্বার ভগবানকে ভারতে অবতীর্ণ হইতে হইল। বস্তুত স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভারতের আর্যসভ্যতা একটীমাত্র বিপদকে জানিত ও স্বীকার করিত ; উহাকে এক কথায় "ধর্ম বাধা" বলা যাইতে পারে।

এই ধর্মে বাধারূপ বিপদের পরিমাণই বা কি এবং পরিণামই বা কি তাহা কতকটা বুঝা আবশ্যক। ধর্ম বলিতে ইষ্টদেবতাপূজামূলক কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ বুঝায় না। অথবা বিশেষ কতকগুলি মতের সমষ্টিকে ধর্ম বলে না। এই সৃষ্টজগৎ, সংসার, সমাজ ইত্যাদিকে প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহাদের গতি নির্ণয় কর ; এই যে বিচিত্র নৈসর্গিক, সাংসারিক,

সামাজিক ঘটনা উৎপাদন করিতে করিতে বিশাল সৃষ্টিচক্রে আবর্তিত হইতেছে, ইহার দ্বারা মনুষ্যজ্ঞানের অধিগম্য একটি মূল উদ্দেশ্যের সাধনা হইতেছে। মানব বিবিধ ব্যক্তিগত, সাংসারিক, সামাজিক কর্মকে অবলম্বন করিয়া উত্থানপতনের মধ্য দিয়া সেই এক মূল উদ্দেশ্যের দিকে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে। আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা এই চরম উদ্দেশ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই লক্ষ্যস্থান নির্ণীত হওয়ায় প্রথম সমস্যা মীমাংসিত হইল। তারপর দ্বিতীয় সমস্যা এই যে, সংসারে মনুষ্যের কর্ম ও স্বভাব এতই বিচিত্র ও জটিল এবং মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বা চরমলক্ষ্য এমনই অখণ্ড ও অদ্বয় যে এই অদ্ভুত বৈচিত্র্য ও ঐক্যের সামঞ্জস্য সম্ভবপর কি না। জগতে prophet বা ঈশ্বরপ্রেরিতের বাক্য ও কার্যকে আশ্রয় করিয়া যে সকল অধ্যাত্মসাধনবিধি প্রচলিত হইয়াছে, এই সকল বিধানে বা "ধর্মে" এই দ্বিতীয় সমস্যার ভঞ্জন করা হয় নাই। তাহারা কর্ম ও স্বভাবের বৈচিত্র্যকে অবহেলা করিয়া, একই সাধনপথের খাতের মধ্য দিয়া সমগ্র মনুষ্যসমাজকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চান। তাই সহজ ও সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যের অভাবে ধর্মবিধিকে সপরিশ্রমে ব্যাখ্যা করিয়া জীবনের বিবিধ কর্মক্ষেত্রে খাটাইয়া লইতে হয়। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ এই কর্ম ও স্বভাবের বৈচিত্র্য ও জটিলতাকে স্বীকার করিয়া লইলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, এই বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী এবং উদ্দেশ্যের অখণ্ডত্ব ও একত্বের অনুকূল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, এক মহাচৈতন্য যেখানে যেরূপ কর্মপরম্পরার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, সেখানে তদবস্থায়ই আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি করিতেছেন। তাঁহারা এই সৃষ্টিকৌশল পর্যালোচনা করিতে করিতে দ্বিতীয় সমস্যার ভঞ্জন করিলেন। তাঁহারা উপদেশ দিলেন যে, সকলে "স্বধর্ম" পালন কর; তুমি এই বিশাল সংসারচক্রে যেখানে সংলগ্ন আছ, সেখানেই তোমার "স্বধর্মের" সন্ধান পাইবে, নতুবা সেই বিশেষ স্থানেইবা সংযুক্ত হইয়া বিশ্বক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে কেন? তোমার প্রাক্তন সংস্কার ও প্রবৃত্তিবর্গের প্ররোচনারূপ পুরুষকার তোমাকে সংসারচক্রের যে কক্ষে উপনীত করিয়াছে সেই কক্ষেই তোমার "স্বধর্ম" অধিষ্ঠিত আছে, তুমি সেই "স্বধর্ম" পালনের দ্বারাই আত্মস্বরূপ লাভের পথে আবার অগ্রসর হইবে। এই স্বধর্মনীতির আলোকে দেখিলে, গুণত্রয় বিভাগ, চতুর্বর্গ বিভাগ, বর্ণাশ্রম বিভাগ, দেশকালপাত্রবিচার প্রভৃতি

অনেক প্রাচীন তত্ত্ব সহজেই বোধগম্য হয়। এই স্বধর্মের শিক্ষা দিবার জন্য প্রাচীন শাস্ত্রকার গৃহস্থের জন্য গার্হস্থ্যনীতি, যোদ্ধার জন্য সমরনীতি, রাজার জন্য শাম-দান-ভেদদণ্ড প্রভৃতি, বণিকের জন্য বাণিজ্যনীতি, মুমুক্ষুর জন্য আত্মতত্ত্ব ইত্যাদির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত প্রাচীন নীতিশাস্ত্রের আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, প্রাচীন ঋষিরা সকল প্রকার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া মানবের উন্নতি, বা মনুষ্যত্ববিকাশ, অথবা আত্মস্বরূপ-লাভের পথ রচিত করিয়া দিয়াছিলেন। দেশকালপাত্রভেদে এই বিচিত্র কর্ম বা অনুষ্ঠানকে স্বাভাবিকরূপে অবলম্বন করিয়া জীবচৈতন্য সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য অথবা আত্মস্বরূপ লাভের পথে অগ্রসর হওয়াকে "স্বধর্ম" পালন বলে।

তৃতীয়তঃ যাহারা স্বধর্মপালন ও আত্মতত্ত্বের অনুশীলন দ্বারা মুমুক্ষু হইয়াছেন, তাহারা বিবিধ ধর্মের সীমা অতিক্রম করিয়া মোক্ষপথের পথিক হইতেন এবং প্রাচীন আর্যসমাজের বিবিধ ধর্মের উৎকর্ষ সাধন করান ও উহাদের তত্ত্বাবধান করা তাঁহাদের কর্তব্য ছিল। সমাজের অতীত হইয়াও এই সকল মোক্ষপথাবলম্বী ঋষিগণ সমাজের তত্ত্বাবধায়করূপে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়াই ধর্ম সকল উদ্দেশ্যের প্রতিরোধক বা প্রতিকূল হইতে পারিত না; উপায়কে শাস্ত্রবিধির দ্বারা সর্বদাই তাঁহারা উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া দিতেন। এই সকল মোক্ষপথাবলম্বী সমাজের নেতৃগণ কর্ম ও স্বভাবের বৈচিত্র্যের সহিত চরম উদ্দেশ্যের একত্বের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিতেন।

সমাজের মধ্যে এই স্বধর্ম পালনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ও স্থায়ী করিবার জন্য রাজশক্তির আবশ্যকতা ছিল। রাজা সমাজপতি ও সমাজের কেন্দ্রস্থানীয়। তিনি মোক্ষধর্মাশ্রিত আত্মতত্ত্বজ্ঞের সহায়তায় সমাজের বিবিধ ধর্মের বিঘ্ননাশ ও পরিদর্শন কার্যে সর্বদাই ব্যাপৃত থাকিতেন। বণিকের বাণিজ্য-কর্মে, অধ্যাপকের অধ্যাপনায়, শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যে, কৃষকের কৃষিকর্মে, যাজ্ঞিকের যজ্ঞে, শিল্পীর শিল্পকার্যে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রধর্মে কোনরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার প্রতিবিধান করিয়া সকলের স্বধর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। যাহাতে সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যতদূর সম্ভব নিরাময় ও নির্বিঘ্ন থাকিয়া স্বধর্ম পালনে রত থাকে, রাজা সর্বদাই তাহার ব্যবস্থা করিতেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন ঋষিরা যখনই স্থির করিলেন যে,

স্বধর্ম পালনের দ্বারাই মানুষকে মোক্ষলাভের অধিকারী করিতে হইবে, তখন হইতেই স্বধর্ম পালনে বিঘ্ন বা ধর্মে বাধা একটী ঘোরতর বিপদের আকার ধারণ করিয়া ভারতের আর্যদের কল্পনাকে অধিকার করিল। ধর্মে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে ঋষিদিগের সমস্ত ব্যবস্থা বিপন্ন হইবে। স্বধর্ম-পালন ব্যহত হইলে, মনুষ্যগণ মোক্ষলাভের অধিকারী হইতে পারিবে না এবং ক্রমশই ভারত হইতে মোক্ষসাধন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই ভীষণ আশঙ্কা প্রাচীন আর্যসমাজের হৃদয়কে প্রায়ই স্পন্দিত করিয়া দিত। ধর্ম বিঘ্ন কেবলমাত্র গো-ব্রাহ্মণ বধ বা দেবমন্দিরোৎসাদন প্রভৃতিতে পর্যবসিত নহে; যখনই স্বধর্ম পালনের দ্বারা উন্নততর মনুষত্বের বিকাশ হইবে না, যখনই স্বধর্ম পালনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া মোক্ষলাভের অধিকার জন্মাইবে না, তখনই বুঝিতে হইবে স্বধর্মে মারাত্মক বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে,—স্বধর্ম লোপ পাইয়াছে, বাহিরের আবরণমাত্র অবশিষ্ট আছে। কৃষক যখন কৃষিকর্মের আশ্রয়ে উন্নত হইতেছে না, শিল্পী যখন স্বধর্মকে অবলম্বন করিয়া উন্নত হইতেছে না, শিক্ষার্থী যখন শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া উন্নত হইতেছে না, অধ্যাপক যখন অধ্যাপনার দ্বারা উন্নত হইতেছে না, বণিক যখন বাণিজ্যের দ্বারা উন্নত হইতেছে না, ক্ষত্রিয় যখন ক্ষাত্রধর্ম হইতে উপযুক্ত ফললাভ করিতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে যে ধর্মে মারাত্মক বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। যে রাজ্যে এই সকল বিঘ্ন উপস্থিত হয় ও সেই বিঘ্নের কোন প্রতিকার হয় না, সেই রাজ্যকে ধর্মরাজ্য বলে না। যে রাজ্যে কৃষিশিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, মোক্ষসাধন প্রভৃতি নির্বাধে উন্নতিলাভ করে, এবং যে রাজ্যে এই সকল ধর্মে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার হয়, সেই রাজ্যই ধর্মরাজ্য।

এই ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একান্ত চেষ্টার বিষয় মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মরাজ্যস্থাপন দ্বারা তিনি একদিকে যেমন ভারতে স্বধর্ম-পালনের সুব্যবস্থা করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন, অপরদিকে মোক্ষতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি ধর্মকে মোক্ষের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি স্বধর্ম পালনের জন্য যেমন একদিকে অর্জুনকে বলিতেছেন "তস্মাত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব", 'অপরদিকে মোক্ষের প্রতি অনুরাগী করিবার জন্য তাহাকেই বলিতেছেন "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।"

আর্যসভ্যতা বা আর্য্যসভ্যতার দুইটী মূলতত্ত্ব স্বধর্ম ও মোক্ষ গীতাতে পরিকীর্তিত হইয়াছে।

প্রাচীনকাল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভারতে মুসলমান বিজয়ের পর একমাত্র শিবাজীকেই ভারতে ধর্মরাজ্য সংস্থাপন ব্রত গ্রহণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শিবাজী ধর্মরাজ্য সংস্থাপন কার্যে যখন প্রথম উদ্যোগী হন, তখন রামদাস স্বামী তাহাকে একখানি পত্র লেখেন। "আমাদের তীর্থ সকল বিধ্বস্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমিসমূহ অপবিত্রীকৃত হইয়াছে, সমগ্র পৃথিবী বিপ্লবপূর্ণা হইয়াছে, ধর্ম বিলুপ্ত হইয়াছেন। এই কারণে আমাদিগের ধর্মের, দেবমূর্তিসমূহের ও গো-ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য নারায়ণ আপনার হৃদয়স্থ হইয়া প্রেরণ করিয়াছেন।" বাস্তবিকই ধর্ম বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা হইতেই মহারাষ্ট্র দেশে সপ্তদশ শতাব্দীর অদ্ভুত বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল।

আশ্চর্য বীরত্ব ও কর্মকুশলতার সহিত আজীবন যুদ্ধ করিয়া দেশ জয় করিবার মূলে শিবাজীর একটীমাত্র আন্তরিক উদ্দেশ্য ছিল, উহা ধর্মরাজ্য সংস্থাপন ইহার যথেষ্ট ; প্রমাণ আছে। একজন বিখ্যাত লেখক শিবাজী সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে শিবাজী মোক্ষ সাধনের নিমিত্ত সদগুরুর সন্ধান করিতে করিতে "মহাসমর্থ" রামদাস স্বামীর বিষয় সম্যক অবগত হন। তারপর তাঁহার দর্শনলাভ করিবার জন্য তিনি প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। অতঃপর নানাস্থানে অনুসন্ধান করিতে করিতে সহসা এক পর্বতে স্বামীর সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎকার ঘটে। তিনি সমর্থের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রোপদেশ গ্রহণের ও তাঁহার সেবার অধিকারী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্বামী বলিলেন, "তুমি প্রাসাদ বিহারী রাজপুত্র, আমরা অরণ্যচর সন্ন্যাসী ; ধর্মসাধনও সহজ সাধ্য নহে। অতএব তুমি এই বিসদৃশ অভিলাষ পরিত্যাগ কর। অকারণ 'ভেক ধারণ' করিয়া জগৎকে প্রতারিত করায় ফল কি?" এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র বাস্পাকুললোচনে বলিলেন,—"রাজ্যধন সমস্তই আপনার চরণে সমর্পণ করিয়াছি। এই দাসকে দীনহীন জানিয়া অনুগ্রহ প্রকাশে সনাথ করিবার আদেশ হউক।" শিবাজীর সংকল্প অটল দেখিয়া রামদাস তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত

হইলেন। শিবাজী স্নানাদি সমাপন করিয়া ভক্তিপূত হৃদয়ে যথারীতি স্বামীর নিকট পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। ঘটনা ১৫৭১ শকাব্দের (১৬৪৯ খৃঃ) বৈশাখ শুক্লা নবমী বৃহস্পতিবার দিবসে শিবাজীর দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সংঘটিত হয়। স্বামীর উপদেশে "আত্মজ্ঞান" লাভ করিয়া সংকল্প বিকল্পাত্মক সংসারের প্রতি শিবাজীর বিরাগ জন্মিল। রামদাস তাঁহাকে গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলে তিনি বলিলেন,— "রাজ্য বৈভব ইতঃপূর্বেই শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছি। আর এই 'দুর্নিবার মায়াবিভ্রমে' মুগ্ধ না হইয়া গুরুদেবের চরণ সেবায় জীবনপাত পূর্বক পরমার্থ সাধন করিব।" ইহা শুনিয়া রামদাস শিবাজীর সংশয় ভঞ্জনের জন্য তাঁহাকে গীতোক্ত কর্মযোগের উপদেশ প্রদান করিলেন। সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্বক অনাসক্তভাবে ধর্মপালন করিয়া জনক, হরিশচন্দ্র, অম্বরীষ প্রভৃতি ভাগবত ধর্মপরায়ণ রাজর্ষিগণ যেরূপে মোক্ষপদবীর লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি শিবাজীর নিকট বিবৃত করিলেন, এই প্রসঙ্গে দেশের দুরবস্থার বর্ণনা করিয়া শিবাজীকে তৎপ্রতিকারে প্রবৃত্ত করিবার জন্য তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা "শিবদিগ্বিজয়" নামক গ্রন্থ হইতে এস্থলে অবিকল অনূদিত হইল,—

"যবনগণ বহুদিবস হইতে যথেচ্ছাচার করিতেছে; তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারে, হিন্দুগণের মধ্যে এরূপ পরাক্রমশালী পুরুষ কেহ নাই। দুষ্টগণের অত্যাচারে দেব-ব্রাহ্মণের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে; সমস্ত ধর্ম কর্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে; নামসংকীর্তন বিলুপ্ত হইয়াছে; পাপিগণের বলবৃদ্ধি হওয়ায় ধার্মিকগণ দুর্বল হইয়াছে; এই সঙ্কটকালে সকলের সুখসম্মান লোপ পাইয়াছে। বিপদাগমন হেতু এই পাপকালের আবির্ভাব হইয়াছে; দেবতাগণ (দেবমূর্তিসমূহ) অত্যাচার ভয়ে লুক্কায়িত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ তিলকমালা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যবনদিগের অনুকারী হইয়াছে। যবনগণ দুর্বল প্রজাকুলের প্রতি বিবিধ কটুভাষা ব্যবহার করে; নানা প্রকারে তাহাদিগকে যন্ত্রণা দেয়; রঘুপতি এই সকল সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া যবনদিগের বিরুদ্ধে তোমার যোজনা করিয়াছেন। তুমি ঈশ্বরাংশসম্ভূত পুরুষ, তুমি প্রজাদিগের কিছু হিতসাধন কর। এক্ষণে সময়ের অনুরূপ ধর্মস্থাপন করা তোমার কর্তব্য।

ধর্মের জন্য জীবন বিসর্জন কর; নিজের প্রাণপণ করিয়াও শত্রুদিগের সকলকে বিনাশ কর। তাহাদিগকে প্রহারে জর্জরীভূত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে আপনার রাজ্য প্রতিগ্রহণ কর। ধর্মনীতির উপর রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ধর্মনীতি পালন না করিলে সকলই মিথ্যা; সত্যপথে বিচরণ করিলে ঐশ্বর্য সম্ভ্রম লাভ হয়। আপনার মানরক্ষার জন্য অসি গ্রহণ করিয়া যিনি বৈরিকুল সংহার করেন, জগতে তাঁহার বহুলকীর্তি প্রচারিত হয়। সকলের প্রতি আনন্দময় ভাব ধারণ করিবে; শৌর্য সহকারে উপার্জন করিবে; উপার্জনকারী জগতে সুখের অধিকারী হইয়া থাকে। এ সময়ে শৌর্য প্রকাশ করিয়া ভগবৎ কৃপা লাভ কর। বাহুবলে ধর্ম স্থাপন কর। এ বিষয়ে আলস্য করিও না। কাপুরুষতা ও ভীরুতা পরিত্যাগ কর। বিপদকে যিনি ভয় করেন, সৌভাগ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করে।"

রামদাস স্বামীর কর্মযোগমূলক উপদেশবাক্যে শিবাজীর হৃদয়ে ধর্মরাজ্য স্থাপনের সংকল্প বিপুল উৎসাহ সহকারে আবার জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি গুরুদেবের আদেশমত আবার লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই দিন হইতে যে সুমহৎ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন তাহার পরিচয় জগৎ প্রাপ্ত হইয়াছে।

সাহিত্য ও স্বাধীনতা*

ভারতে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যের সৃষ্টি হইল না কেন? কালিদাস ভবভূতির সেই মধুময় সংস্কৃত যুগ, যখন দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, গণিত, নাটক, ইতিহাস প্রভৃতি সাহিত্যের সকল অঙ্গগুলিরই সমান উন্মেষ হইয়াছিল, তখনকার সে যুগের অমর সাহিত্য সম্পদের তুলনা নাই; তখন মানুষ যাহা লিখিত তাহাই সুধায় ভরিয়া সুমিষ্ট দেবভোগ্য করিয়া তুলিতে পারিত; প্রতি পুস্তকের ছত্রে ছত্রে আর্যের খাঁটি আর্যত্ব ফুটিয়া উঠিয়া সেকালের জাতীয় জীবনের শৈশব লীলা, যৌবন লীলা ও বার্দ্ধক্য লীলা দেখাইত। সে সময়ে হিন্দুর জীবনে অপূর্ব ঘটনাবৈচিত্র্যেরও অভাব ছিল না, এবং আশা সার্থকতারও সীমা ছিল না। তখনকার যে পুস্তকখানাই পড় না কেন, তাহাতে হিন্দু জীবনের একটী ষোল কলায় পূর্ণ চিত্র দেখিতে পাইতে। তাই বলি সে কালের সাহিত্যের মত মধুগর্ভ পদ্ম আর ফুটিল না কেন? প্রকৃত সাহিত্য সত্য সত্যই অনন্তদল পদ্মবিশেষ, তাহার সৌরভের বিরাম নাই, মধুর অন্ত নাই; কোমল লাবণ্যের ক্ষয় নাই, আর প্রস্ফুটনশীল পদ্ম পল্লবেরও শেষ নাই। আজ দুইটি দল ফুটিল, কাল আবার চারিটি ফুটিল, মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে দলের পর দল ফুটিতে লাগিল; তথাপি সে সাহিত্য-পদ্ম চিরদিনই মুকুল, আবার চিরদিনই স্ফুটনোন্মুখ অর্দ্ধ উন্মুক্ত দল! বঙ্গে বা ভারতে তেমন অনন্তদল সাহিত্য কমল আর ফুটে না কেন?

কেন ফুটে না সে উত্তর অতি সহজ; ভারতের মাটি ও জলে যে সার থাকিলে সেরূপ সাহিত্য পুষ্প ফুটিতে পারে, সে সার ফুরাইয়া গিয়াছে। তাহা কি? ইতালির উদ্ধারকর্ত্তা ম্যাজিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, "Without a country and without liberty we cannot produce vital art". "দেশ ও স্বাধীনতা না থাকিলে কলা বিদ্যায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না।" কালিদাসের যুগে হিমাদ্রিকুন্তলা জলধিকৃতমেখলা ভারতলক্ষ্মী আমাদেরই জননী ছিলেন, আর্যের স্বতন্ত্র জীবনে মনুষ্যত্ব-স্ফূর্তি

* 'যুগান্তর'—১১ই চৈত্র, ১৩১২

বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল, আর ক্ষেত্রও ছিল। মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান ধর্মপ্রবৃত্তির স্ফূর্তি অনুকূল রাজশক্তির ক্ষেত্রে, জ্ঞানের স্ফূর্তি ধনের আত্ম-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, এবং শূরত্ব ও শক্তির স্ফূর্তি সামরিক ক্ষেত্রে হইত। এইরূপে অগণ্য ক্ষেত্রে অসংখ্য গুণের বিকাশ ঘটিয়া জাতীয় জীবন পুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ করিত। এইরূপ পরিগণিত সম্পূর্ণ জাতীয় জীবনের শৈশব লীলা, যৌবনলীলা এবং বার্দ্ধক্য লীলার ইতিহাসই সাহিত্য। এইরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি সংস্কৃতযুগে হইয়াছিল : আর্যজাতির ঘটনাবৈচিত্র্যময় জীবন হইতে, শত সদ্‌গুণপূর্ণ চরিত্র হইতে বিরাট রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের মহাযজ্ঞ হইতে, সে সাহিত্যের জন্য নিত্য নব উপাদান সংগৃহীত হইত ; সে অভিনব সাহিত্য একটি মহাদেশস্থ সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় সাহিত্য।

তাহার পর মুসলমান আক্রমণ ও দিল্লী তক্তের স্থাপন সময়ে অত বড় রাষ্ট্রীয় সাহিত্য না হউক বঙ্গদেশে, মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সে মুসলনান প্রাধান্যের সময়েও হিন্দু জাতীয়তার পূর্ণগ্রাস ঘটে নাই, কারণ বিদেশী মুসলমান শক্তি সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া একছত্র সম্রাট হইলেও শস্য-দুগ্ধময়ী ভারতকে আপন গরীয়সী জন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। অধিকন্তু দেশে দেশে স্বাধীনভাবে বা মুসলমান সম্রাটের অধীনে কত হিন্দু রাজার রাজছত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। হিন্দুর রাষ্ট্রীয় জীবন ভাঙ্গিয়া গেলেও প্রাদেশিক জীবনের অবসান হয় নাই ; তাহা বঙ্গে, মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে, রাজোয়াড়ায় ক্ষণে গড়িতেছিল, ক্ষণে ভাঙ্গিতেছিল, আবার ক্ষণে নব উদ্দীপনাবলে পুনরভ্যুত্থিত হইয়া জাতীয়তায় লীলা দেখিতেছিল, তাই রাষ্ট্রীয় সাহিত্য গিয়া দেশে প্রাদেশিক সাহিত্যের বিকাশ হইতেছিল।

এই প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির বিকাশ ও সৃষ্টির কারণ দুইটি, এক দেশাভিমান ও অপরটি ধর্মপ্লাবন। যখন রাজোয়াড়া বা মহারাষ্ট্র বা পাঞ্জাব উৎপীড়কের অত্যাচার দমনকল্পে অসিহস্তে জনশক্তির উদ্বোধন করিতেছিল, তখন কোথাও চারণমুখে, কোথাও তুকারাম, রামদাসের লেখনীতে, আবার কোথাও শিখগুরুর গ্রন্থে সাহিত্যের আংশিক পরিণতি ঘটিতেছিল। আবার হিন্দু শাসন কালেই কি, আর মুসলমান প্রাধান্য সময়েই কি, যখনই শান্তির অবসরে বুদ্ধ, শঙ্কর বা চৈতন্যের ন্যায় যুগস্রষ্টা নরদেবতার জন্ম

হইতেছিল তখনই তাঁহাদের প্রচারজাত এক একটি নূতন ভাবতরঙ্গ আসিয়া অর্ধ-বিকশিত সাহিত্যগুলিকে অধিকতর পুষ্ট করিয়া দিয়া যাইতেছেল। মহারাষ্ট্র সাহিত্যে দেবগিরির যাদব রাজগণের সময়ে জ্ঞানদেবের যুগে ধর্ম উন্মাদনায় এইরূপ কত অমর গ্রন্থ রচিত হয়, আবার শিবাজী এবং পেশোয়াদিগের সময়ে দেশাভিমান ও ধর্মপ্রবাহ উভয়েরই সঞ্চারে রামদাস-তুকারাম সে সাহিত্যকে উচ্চতর ও মধুরতর করেন। অন্যদিকে চৈতন্য-দেবের প্রভাবকালে বাঙ্গালার সাহিত্যে চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের মত কত কবিগুরু মধুমন্ত্র রচিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহার পর আর তো তেমন হইল না! যাঁহারা বর্তমান যুগের নূতন সভ্যতায় সুসভ্য, তাঁহারা বলিতে পারেন, কেন বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ইঁহারা কি কিছুই করেন নাই? এ প্রশ্নের উত্তরে আবাব ম্যাজিনির সেই কথা বলিতে হয়, "Without a country and without liberty, we might, perhaps, produce some prophet of art, but no vital art. If we are successful in creating a country for ourselves, the art of Italy would bloom and flourish over our graves." দেশ ও স্বতন্ত্রতার অভাবে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের সূচনা মাত্র হইতে পারে, তাহার প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। যদি আমরা কখনও প্রাণ বিনিময়েও আপন "দেশ" গড়িয়া লইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সে শ্মশানের বক্ষেই উন্নত কলাকল্পনার বিকশিত উদ্যান রচিত হইতে পারিবে।

প্রকৃত কথাই তাই; আগে দেশের মুক্ত জীবন, তাহার পর সে জীবনের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ ধনসম্পদ, ধর্মসম্পদ, কৃষিসম্পদ, বাণিজ্য সম্পদ, ও সাহিত্য সম্পদের সৃষ্টি, জাতীয় জীবনে এগুলি বিলাসদ্রব্য বিশেষ বলা যাইতে পারে। যেমন ধনী না হইলে কাহারও বিলাসসুখ হয় না, তেমনি কোন জাতি বিশেষও স্বতন্ত্রতা ও চরিত্রধনে ধনী না হইলে এই সকল সম্পদের ও বিলাস সম্ভারের সঞ্চয় করিতে পারে না।

তবে অধীনতা সত্ত্বেও যাহা হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যৎ সাহিত্য গৌরবের সূচনা মাত্র। কিন্তু দাসত্বের প্রভাবে ও দেশের অভাবে যদি কিছুই হইতে না পারে তাহা হইলে এই বর্তমান সাহিত্যিক সূচনাটুকুই হইল কেন?

তাহার প্রধানতঃ দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, ইংরাজ রাজত্বে

ভারতবাসীর শোচনীয় দাসত্বের আরম্ভ হইলেও মুসলমান যুগের সহিত জাতীয় শক্তি নষ্ট হইতে যথেষ্ট সময় লাগিয়াছে ; সুতরাং যতদিন তাহার প্রভাব অত্যল্পও ছিল ততদিন তাহা সাহিত্যের ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কার্য করিয়াছে। কিন্তু সে জাতীয় শক্তি যতই নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে ততই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, সার টি, মাধব রাও, রাণাডে ও বঙ্কিমের মত মহাপুরুষ বিরল হইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ভারতবাসিগণ কত অধিকার, উন্নতি ও স্বায়ত্ত শাসনের আশা পাইয়াছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতায় নূতন পূর্ণতর জাতীয় জীবন গড়িয়া লইবে ভাবিয়াছিল। এ সাহিত্য সেই আশার ফল, বাঙ্গালী দাসত্ব সত্ত্বেও আশামায়াবিনীর বংশীরবে আত্ম অবনতি বিস্মৃত হইয়া এই রমণীয় সাহিত্য পুষ্পের রচনা করিয়া ফেলিয়াছে। যে সাহিত্যের স্ফুরণ কেবল ক্ষণিক আশার তাড়নায়, তাহা সুন্দর হইলেও সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে কেন? প্রতিভার চরম সার্থকতা না হইলে সাহিত্যে গম্ভীরতা ও অনবদ্যতা আসে না। বাঙ্গালীর সাহিত্য তাই ক্ষণিক আশা প্রণোদিত বলিয়া কল্পনার সাহিত্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে দর্শনের গম্ভীরতা, বিজ্ঞানের তীব্র আলোক, ন্যায়ের ক্ষুরধার গতি, মহাকাব্যের সান্দ্র গাম্ভীর্য নাই; আছে শুধু কোমল ললিত ভাবের ক্রীড়া, হাস্য পরিহাসের লহরী ও ছন্দের রাগ।

বাঙ্গালীর উপন্যাস রচনাশক্তির পরাকাষ্ঠা বঙ্কিমচন্দ্রে নহে, বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক কল্পনাশক্তি ও প্রতিভা নিখুঁত সন্দেহ নাই, সে রচনা-কলার পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্ক স্পর্শ হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার উপযোগী উপাদান দাসত্ব নিগড়ে নিগড়িত বঙ্গে দুর্লভ ; তাই বলিতেছিলাম বঙ্কিম পূর্ণ বঙ্কিম হইতে পারেন নাই ; বাঙ্গালী সুবিধা পাইলে, আপন দেশে জাতীয়তার সম্যক সার্থকতা দেখিলে কত সুন্দর উপন্যাস রচনা করিতে পারে বঙ্কিম তাহার পূর্ব সূচনা মাত্র। তেমনি বাঙ্গালীর কবিত্ব অবসর পাইলে, এবং স্বাধীন বঙ্গের মনোহারী চিত্র দেখিয়া সে অক্ষয় খনি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে পাইলে কি সুন্দর কাব্য সম্পদের রচনা করিতে পারে, তাহা রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র আভাসে দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের কবিতা ভবিষ্যৎ বঙ্গের ভাবী কাব্য কলার বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী মাত্র। যে বঙ্গ সন্তান হইয়া বলে আমরা হেমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীন ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ

কবিগণকে লইয়া মহা-সাহিত্যের রচনা করিয়াছি এবং তাঁহাদের দ্বারাই বাঙ্গালীর মেধা ও কল্পনার চরম সার্থকতা হইয়াছে, সে আজও বঙ্গ সন্তান হইতে শিখে নাই।

যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে দিয়া যেটুকু হইয়াছিল, তাহা সাহিত্যই হউক আর সূচনাই হউক, তাহার অধিক আর হইল কই? সূচনা যে সূচনাতেই পর্যবসিত রহিয়া গেল! আর একটি বঙ্কিম দূরে থাক, আর একজন মধুসূদন দূরে থাকে, এখন আর মৌলিকতার ক্ষীণ স্ফুরণ তো কোথাও দেখি না। সাহিত্য নির্ঝর পবত হইতে কল কল শব্দে আসিয়া অবশেষে অর্দ্ধপথেই গলিত পঙ্কের শৈবালজালে বাঁধা পড়িল! সে জলে আর স্রোত নাই, ঊর্মি নাই, কলতান নাই, মলিন জলের স্থির পঙ্কশয্যায় কেবল শৈবাল ও কীটাণুই জন্মিতেছে। এই ত আমাদের সাহিত্যের দশা!

শুধু আমাদের কেন? পৃথিবীর যে দেশে ইচ্ছা খুঁজিয়া দেখ না কোথায় দেশ হারাইয়া, জাতীয় প্রাণ হারাইয়া, মুক্তি হারাইয়া কে কবে সাহিত্যের অক্ষয় মধুচক্র রচিয়াছে? যাহা স্বভাব নিয়মের বহির্ভূত, মানব ইতিহাসের বিরোধী, তাহা তর্কে, যুক্তিতে ও বক্তৃতার জোরে গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। অধীন জাতি স্বভাবতঃ ভীত ও স্বার্থান্ধ এবং স্বভাবতঃ ক্ষুদ্রাশয়।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। আশা ও সাধনা যেরূপ, সিদ্ধি তাহার অনুরূপ হয়। তাহা হইলে অধীন জাতির ক্ষুদ্র আশা রক্ষে বৃহৎফল ফলিবে কিরূপে, ফলিলেও টিকিবে কেন? ফলের ভারে ক্ষীণ শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িবে যে!

॥ পরিশিষ্ট ॥

ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতীয় বিপ্লববাদ

॥ ১ ॥

কিছুদিন পূর্বে ভগিনী নিবেদিতার জন্ম শতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হলো। তাঁর চিন্তাপ্রণালী ও কর্মধারা সম্বন্ধে পত্রপত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি বের হয়েছে "Nivedita Commemoration Volume" (জুন, ১৯৬৮)। গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন অধ্যক্ষ অমিয় কুমার মজুমদার। গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে নিবেদিতার জীবনের বিভিন্ন দিক পর্য্যালোচিত হয়েছে। ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতীয় বিপ্লব সম্বন্ধে বড় প্রবন্ধ লিখেছেন "যুগবাণী" সম্পাদক স্বর্গত দেবজ্যোতি বর্মণ। বস্তুত, উক্ত বিষয়ে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে "যুগবাণী" শারদীয়া সংখ্যায় সম্পাদক দেবজ্যোতিবাবু যে বাংলা নিবন্ধ বের করেছিলেন, Nivedita Commemoration Vo'ume-এ সন্নিবিষ্ট রচনাটি তার ইংরেজী সংস্করণ মাত্র। দেবজ্যোতিবাবুর প্রবন্ধটি মূলত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর লেখা "ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ" (১৯৬০) গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, আবার উক্ত গ্রন্থের মূল বনিয়াদ হলো নিবেদিতার ফরাসী জীবনচরিতকার লিজেল রেমঁ (Lizelle Reymond)। লিজেল রেমঁ এবং তাঁর অনুসরণকারী লেখক গিরিজাবাবু উভয়েই বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তাতে কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে প্রচুর। নিবেদিতার ঐ দুই বিশিষ্ট জীবনচরিতকার সম্বন্ধে বর্তমান লেখকদের বক্তব্য হলো এই যে, ইতিহাস রচনার নামে তাঁরা বিনা প্রমাণে অনেক জায়গায় কথা বলেছেন এবং তাঁদের রচনায় বহু ভ্রান্ত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। গিরিজাবাবুকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেবজ্যোতি বর্মণ মহাশয়ও অনুরূপ ভ্রান্তি করেছেন। বাংলা বা ভারতের বৈপ্লবিক সাধনায় ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকাকে এঁরা

সকলেই কিছু অতিরঞ্জিত করে দেখাচ্ছেন, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচয়িতার পক্ষে এঁদের মত গ্রহণ করা কঠিন।

॥ ২ ॥

বাংলার বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার প্রারম্ভকালে এবং তারপরও কয়েক বৎসর ধরে অরবিন্দ ঘোষই ছিলেন এই নব আন্দোলনের প্রধান মন্ত্রণা গুরু। তৎকালীন গোয়েন্দা পুলিশী রিপোর্টের ভাষায়: "...that he (Aravinda) was the head and front of the whole movement need not be doubted" (I. B. Records. West Bengal, F. N. 1022-17, p. 1.)। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রমুখ তৎকালীন বৈপ্লবিক কর্মীরাও বিভিন্ন উপলক্ষে অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। ১৯০১-১৯০২ সনে বরোদা থেকে অরবিন্দ প্রেরিত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় কলিকাতার সার্কুলার রোডে (রাজাবাজারের নিকট) যে বিপ্লব সমিতি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তার সঙ্গে নিবেদিতার কিঞ্চিৎ সম্পর্ক থাকলেও ১৯০৫-০৬ সনে ভারতপ্রাণা আইরিশ ভগিনীর বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না।

গিরিজাবাবুর গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ১৯০২-এর অক্টোবর মাসে বরোদায় অরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় ঘটে। তারও কয়েক মাস পূর্বে—১৯০২-এর প্রথম ভাগে অরবিন্দ যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলা দেশে বিপ্লব সমিতি স্থাপনোদ্দেশ্যে কলিকাতায় প্রেরণ করেছিলেন (পৃঃ ৩০-৩১)। তৎকালীন গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশে প্রেরিত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষারও পূর্বে—১৯০১-এর শেষভাগে, আর বারীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রেরিত হয়েছিলেন ১৯০২-এর প্রথম ভাগে (I. B. Records, L. N. 54/A pp. 1, 12)। বারীন্দ্রকুমার নিজে লিখেছেন, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় আসার ছয় মাস পরে তিনিও কলিকাতায় চলে আসেন এবং তখন দেখতে পান যে সার্কুলার রোডে বিপ্লব সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তার পরিচালনা করছেন। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারেরও কয়েকমাস পূর্বে অরবিন্দের উৎসাহ ও নির্দেশে যতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রথম বিপ্লব

সমিতি স্থাপন করেছিলেন। বাংলার এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার প্রথম পর্বের মেয়াদ চলেছিল ১৯০৩-এর শেষ ভাগ পর্যন্ত (অর্থাৎ যতীন্দ্র-বারীন্দ্রের বিরোধ সুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত)। গিরিজাবাবুর অভিমতে, নিবেদিতা বরোদা থেকে কলিকাতায় ফিরে এসে "অরবিন্দ প্রবর্তিত গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন"। প্রমাণ স্বরূপ গিরিজাবাবু বারীন ঘোষের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: "Nivedita was connected with us since her first Boroda visit" অর্থাৎ নিবেদিতার প্রথম বরোদা সফরের সময় থেকে তিনি অরবিন্দ-বারীন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। গিরিজাবাবু বারীন্দ্রকুমার ব্যবহৃত "কানেকটেড্ উইথ আস্" বাক্যাংশের সরল অর্থ করে লিখেছেন "কলিকাতার গুপ্ত সমিতির দলে আসিয়া যোগ দেওয়া" (পৃঃ ৩২)। সম্পর্কযুক্ত হওয়া আর "সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করা", এমনকি যোগদান করাও একার্থক কিনা তা যুক্তিনিষ্ঠ পাঠকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। দেবজ্যোতি বর্মণ তাঁর ইংরেজী প্রবন্ধে যে লিখেছেন: "In Calcutta, Nivedita took charge of the secret societies set up by Aurobindo" (p. 197) তা বাস্তবতাবর্জিত ও কল্পনাপ্রসূত। তাঁর এই ভ্রমের জন্য মূলত দায়ী গিরিজা শঙ্কর রায় চৌধুরী এবং লিজেল রেমঁ।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ১৯৩১ সনে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, ভগিনী নিবেদিতা বাংলার প্রথম বিপ্লব সমিতিকে "তাঁর লাইব্রেরীর জাতীয়তা বিষয়ের প্রায় একশ দেড়শ বই দিয়াছিলেন"। বাংলার প্রথম বিপ্লব সমিতির সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার বিশেষ ধরণের সম্পর্ক প্রদর্শনের প্রমাণ স্বরূপ গিরিজাবাবু তাঁর নিবেদিতা বিষয়ক গ্রন্থেও ঐ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৮৫)। এই পুস্তকদানের কাহিনী আমরা স্বর্গত অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের মুখ থেকেও শুনতে পেয়েছি। অবিনাশ বাবু এক স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে (৪।৪।১৯৬১) আমাদের জানিয়েছিলেন যে, বই দেওয়া ছাড়া "অন্য কোন ব্যাপারে আমাদের সমিতির সহিত নিবেদিতার কোন সম্পর্ক ছিল না।" তাঁর বিবৃতিতে তিনি বলেছেন:

"বাংলার প্রথম বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপিত হবার অল্প দিন পরই ১৯০২-এর শেষ ভাগে আমি ঐ সমিতিতে যোগদান করি। তখন ঐ সমিতির

পরিচালনা যে executive committee-র উপর অর্পিত ছিল তাহাতে ভগ্নী নিবেদিতা ছিলেন না। ১৯০২ ও ১৯০৩ সনে আপার সার্কুলার রোডে এই বৈপ্লবিক সমিতির কার্যালয় ছিল। তখন তাঁহার সহিত বিপ্লববাদ সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা হয় নি। আমাদের সমিতিকে কিছু সংখ্যক জাতীয়তাবাদ বিষয়ক বই উপহার দিয়াছিলেন তাহা সত্য ঘটনা। কিন্তু অন্য কোন ব্যাপারে আমাদের সমিতির সহিত নিবেদিতার কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি torrorism শিক্ষা দেন নাই। আমাদের আসল পরিচালক ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ।" পুস্তক প্রদানের ঘটনাটি থেকে গিরিজাবাবু প্রমাণ করতে চেয়েছেন "গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বেও নিবেদিতা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন" (পৃঃ ৮৫), কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে তাঁর যে যুক্তি প্রয়োগ তা স্পষ্টতই ভ্রান্ত। নিবেদিতার ভারতপ্রীতি ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি গভীর আনুগত্য কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখে না। কিন্তু বাংলার বিপ্লববাদে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ইদানীংকালে অনেক সুচতুর পণ্ডিত যে সব গল্প লিখতে সুরু করেছেন, তাঁদের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ প্রচুর। বাংলার বৈপ্লবিক সমিতির যুবকদের নিবেদিতা কিছু সংখ্যক জাতীয়তাবাদ বিষয়ক বই উপহার দিয়েছিলেন শুধু এইটুকু তথ্যের উপর ভর করে গিরিজাবাবু ও অন্যান্য অনেকে যে সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, নিবেদিতা ঐ বিপ্লব সমিতির কাজে "সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন" তা সঠিক নয়। কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ না করেও ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে কমিউনিষ্ট দল পরিচালিত কোন আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানকে আত্মিক বা আর্থিক সমর্থন জানানো কোনো অচিন্ত্যনীয় ঘটনা নয়। বাংলার সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে স্বর্গত অতুল চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ঐ একই যুক্তি নিবেদিতা প্রসঙ্গেও কি প্রযোজ্য হতে পারে না ?

॥ ৩ ॥

১৯০২ খৃষ্টাব্দে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আপার সার্কুলার রোডের সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সমিতির বৈপ্লবিক চেহারা ও চরিত্র ফুটে ওঠে নি। ১৯০২-০৩-এ সমিতির জাতীয়তাবাদী চেহারা পরিস্ফুট

হলেও ওর আবহাওয়ায় বিপ্লববাদের আগ্নেয় স্বাক্ষর তখনও অস্পষ্ট। এমন অবস্থায় বিবেকানন্দ দীক্ষিত ভারতপ্রাণা নিবেদিতার উক্ত সমিতির প্রতি আত্মিক সহানুভূতি প্রদর্শন একান্ত সম্ভব ও স্বাভাবিক। "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৪৯) পুস্তকে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এমন কথাও লিখেছিলেন যে, ঐ বিপ্লব সমিতির পরিচালনার জন্য প্রথমে যে কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছিল তাতে নিবেদিতাও নাকি অন্যতম সভ্যা ছিলেন। তাঁর এই অভিমত স্বীকার্য নয়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ইংরেজী আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলিকাতায় প্রেরণের অল্পদিন পরেই তিনি বাংলা দেশের বিক্ষিপ্ত বৈপ্লবিক শক্তিগুলিকে ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের অধিনায়কত্বে সুসংহত করতে চেয়েছিলেন, এবং তদুদ্দেশ্যে নিবেদিতা সমেত পঞ্চ সভ্যের এক কর্মপরিষদ গড়ে তুলতেও প্রয়াস পান (পৃঃ ১১৬)। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় তিনি নিবেদিতার সক্রিয় সহায়তা খুব বেশী পেয়েছিলেন বলে কোন প্রমাণ নেই। বাংলার অন্যতম আদি বৈপ্লবিক কর্মী অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্যকে ঐ প্রসঙ্গে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তিনি সরাসরি জবাব দেন যে, তৎকালে বিপ্লব সমিতি পরিচালনার জন্য যে কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছিল তাতে ভগিনী নিবেদিতা সংযুক্ত ছিলেন না। অবিনাশবাবু ১৯০২-এর শেষ ভাগ থেকেই যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত বিপ্লব সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ডক্টর ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় আমাদের "স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ" (১৯৬১) গ্রন্থে পরিশিষ্ট স্বরূপ সন্নিবিষ্ট হবার জন্য তাঁর একটি প্রবন্ধ রচনাকালে বহুবার উল্লেখ করেছিলেন যে, পূর্বোক্ত বিপ্লব সমিতির কার্যকরী পরিষদের অন্যতম সভ্য হিসাবে তিনি যে নিবেদিতার নামোল্লেখ তাঁর কোনো কোনো গ্রন্থে ইতিপূর্বে করেছেন, সে বিষয়ে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। নিবেদিতা উক্ত কার্যকরী সমিতির সভা ছিলেন বলে তিনি যা ইতিপূর্বে লিখেছেন, তা নিবেদিতার ফরাসী জীবনচরিতকার লিজেল রেমঁর মুখ থেকে শোনা কথা। লিজেল রেমঁর বিবরণ সম্বন্ধে নানা কারণে ডক্টর ভূপেন দত্ত মৃত্যুর পূর্বে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। শ্রীঅরবিন্দ নিজে লিখেছেন, তিনি নিবেদিতাকে অন্তর্ভুক্ত করে পঞ্চ সভ্যের এক কার্যকরী পরিষদ গড়ে তুলতে "চেষ্টা করেছিলেন"। সফল হয়েছিলেন কিনা বা নিবেদিতা শেষ পর্যন্ত ঐ পরিষদের সভাপদ গ্রহণ

করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে তিনি নীরব। এ বিষয়ে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না, কারণ তিনি প্রথম দিকে বিপ্লব সমিতিতে যোগদান করেন নি। পক্ষান্তরে, অবিনাশবাবু এই প্রসঙ্গে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে।

১৯০৫-০৬ সনে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে বাংলায় বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার যে দ্বিতীয় পর্ব সুরু হয় তার সঙ্গেও নাকি নিবেদিতা প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িত ছিলেন—গিরিজা বাবুর এবং সেই সঙ্গে তাঁর অনুসরণকারী লেখকদের সিদ্ধান্তও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। নিজ সিদ্ধান্তের সপক্ষে লিজেল রেমঁর অভিমত উদ্ধৃত করে গিরিজাবাবু লিখেছেন, "পুনরায় ১৯০৬ মার্চ মাসে দেখিতেছি নিবেদিতার বাড়ীতেই বারীন্দ্রকুমার ও স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যুগান্তরের সকল রকম প্ল্যান স্থির করিয়া প্রথম সংখ্যা লিখিয়া ফেলিলেন। সুতরাং যুগান্তরের আড্ডায় বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ভগিনী নিবেদিতার নেতৃত্ব ও পরামর্শ ব্যতীত আরম্ভ হইল না। এই ঘটনার মধ্যেই ইতিহাসে নিবেদিতার নির্দিষ্ট স্থান কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না" (পৃ: ৮৫)। তৎকালীন বৈপ্লবিক দলের মুখপত্র "যুগান্তর" পত্রিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যাঁরা প্রথম থেকেই প্রত্যক্ষভাবে ও নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে (সম্পাদক) ও অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে (ম্যানেজার) স্বতন্ত্রভাবে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়েই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মন্তব্য করেন যে, গিরিজাবাবুর এ প্রকার উক্তি একেবারেই কল্পনাপ্রসূত ও অসত্য। অবিনাশবাবু ১৯৬১ সনে এক স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে আমাদের জানিয়েছিলেন: "আজকাল কেহ কেহ রটাইতেছেন যে ১৯০৬ সনে 'যুগান্তর' পত্রিকা আমরা নিবেদিতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বাহির করিয়াছিলাম। ইহা একেবারেই মিথ্যা। 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করিবার সঙ্গে নিবেদিতার কোন সম্বন্ধ ছিল না।...বর্তমান লেখক প্রথম হইতেই 'যুগান্তর' পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ বা ম্যানেজার ছিলেন। কাজেই 'যুগান্তর' প্রকাশে নিবেদিতার কোন হাত ছিল না তা নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতে পারি। নিবেদিতাকে সন্ত্রাসবাদী বা Terrorist বলে প্রচার করিবার পিছনেও কোন বাস্তব সত্য আছে বলিয়া মনে করি না" (৪-৪-১৯৬১-তে অবিনাশবাবুর স্বাক্ষরিত বিবৃতি দ্রষ্টব্য)। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ

দত্ত মহাশয়ও মৃত্যুর পূর্বে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন যে নিবেদিতার বাড়ীতে বসে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে বৈপ্লবিক সমিতির যুবকেরা 'যুগান্তর' চালাচ্ছেন, তা একান্ত অসত্য। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্বে এক প্রবন্ধে বাংলার বিপ্লববাদে নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে বাজারে প্রচলিত অনেক আষাঢ়ে গল্পের মূলে কুঠারাঘাত করেন। এই রচনাটি বর্তমান লেখকদ্বয়ের অনুরোধক্রমে লিখিত হয়ে তাদের লেখা "স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ" গ্রন্থে (১৯৬১, পৃঃ ২৪৮-২৭২) পরিশিষ্ট স্বরূপ সংযোজিত হয়েছে। এ নিবন্ধে ভূপেন দত্ত লিখেছেন, "ভগ্নী নিবেদিতা Nihilist ছিলেন না। ইহার অর্থ কি তাহাই বোধ হয় প্রয়োগ কর্তা জানেন না, তিনি Vivekanandist ছিলেন (*My Master as I Saw Him* দ্রষ্টব্য)। তিনি নাকি Sinn Fein দলভুক্ত ছিলেন এবং বাঙ্গালী তরুণ বিপ্লবীদের তাহার কর্মপদ্ধতি শিখাইতেন। এই গল্প কখনও কাহার কাছ থেকে শুনি নাই। আয়র্লণ্ডের সিন্‌ফিন্‌ আন্দোলন আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের ন্যায় খাঁটি স্বদেশী আন্দোলন। আইরিশ জাতিকে তাহাদের মৃত ভাষা শিক্ষাদান এবং ইংরেজীয়ানা ছাড়ানোর চেষ্টা ছিল। এই বিষয়ে অনেক বইও আছে। সন্ত্রাসবাদ ইহার সহিত বিজড়িত ছিল না। নিবেদিতা আলষ্টারের স্কচ্‌ বংশজাত প্রটেস্টাণ্ট ধর্মীয় বংশের লোক। তাঁহার পিতৃপুরুষ ছিল ইংরেজ ও তাঁহার মাতৃভাষা ছিল ইংরাজী। কাজেই কেল্টিক আইরিশদের ন্যায় পুরাতন ভাষা ও আচারের পুনঃ প্রচলনে তাঁহার কোন উৎসাহ না থাকাই সম্ভব। তারপর তিনি ইংলণ্ডে বর্ধিত হইয়াছেন।...

"আবার ইহাও লিখিত হইয়াছে, তিনি (নিবেদিতা) নাকি বাঙ্গালী তরুণদের 'বোমা' প্রস্তুত শিখাইতেন। এর মত অপ্রাকৃত ও মিথ্যা গল্প আর নাই! তিনি শিক্ষায় Botanist (উদ্ভিদ্‌তাত্ত্বিক) ছিলেন। স্বামীজির জীবনকালে তিনি বেলুড়ে তাহাই পড়াইতেন, কেমিস্ট্রি-চর্চা তাঁহার ছিল না। তাঁহার ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী মিস্‌ এডিংটনও তাই ছিলেন। ১৯১২ খৃঃ নিউইয়র্কে তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা ও কথবার্তা হইয়াছিল। এই জন্য বলি, এই সব গল্প সত্য নহে।"...

"এই বিষয়ে শেষ কথা, নিবেদিতার যেটুকু সম্পর্ক বাঙ্গলার বিপ্লববাদী

দলের সহিত ছিল তা অতি গোড়ার ভাগে ছিল। তিনি পি. মিত্র, অরবিন্দ, সুরেন ঠাকুর প্রভৃতিকে চিনিতেন এই পর্যন্ত।

"লেখক নিবেদিতাকে বাল্যকাল থেকেই চিনিতেন। আমেরিকায় ১৯০৯ ও ১৯১১ সালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিশেষভাবে আলাপ করার সুবিধাও তাঁহার হইয়াছিল। এই জন্যই এইসব আজগুবী ও অপ্রাকৃত গল্পের প্রতিবাদ করে বর্তমান লেখক সত্যের মর্যাদা স্থাপনে প্রয়াসী। নিবেদিতার সহিত জাতীয়তাবাদীদের যে কিঞ্চিৎ সম্পর্ক এক কালে ছিল তা বোধ হয় লেখকের কলম হইতেই প্রথম বাহির হয়, কারণ একদল লোক তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ তখন চাপিয়া রাখিতেছিল। আসল নিবেদিতা এই কাল্পনিক নিবেদিতা হইতে মহৎ। যাঁহারা তাঁহাকে কিম্ভূতভাবে চিত্রিত করেন, তাঁহারা তাঁহার মহত্ত্বের বিষয় জানেন না বা প্রকাশ করেন না।...

"ঋগ্বেদের 'ইন্দ্রসেনা মুগদলিনি' (দশম মণ্ডল) হইতে আজ পর্যন্ত ভারতে বীরাঙ্গনার অভাব হয় নাই। বাংলাতেও Vera Susilov Vera Figner শ্রেণীর সন্ত্রাসবাদিনী তরুণীর অভাব হয় নাই। ঐতিহাসিক বস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দ্ববাদে যদি তেমন প্রয়োজনীয় বাতাবরণ সৃষ্টি হইত তাহা হইলে জোয়ান অব আর্কের মতো নারীও স্বাধীনতার ধ্বজাহস্তে আবির্ভূত হইতেন। এই জন্য বলি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘের এক ব্রহ্মচারিণীকে অস্বাভাবিক ভাবে সাজাইয়া বাংলার জোয়ান অব আর্ক রূপে পরিচিত করিবার কোন্ হেতু থাকিতে পারে ?"*

প্রবন্ধটি পুলকেশ দে সরকার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'দীপান্বিতা' পত্রে ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ সনে প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ের উপর আমাদের প্রথম বিস্তৃত আলোচনা "ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ" নিবন্ধে (যুগান্তর, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬১) পাওয়া যায়। উক্ত নিবন্ধে বাংলার বিপ্লববাদে নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে প্রচলিত বহু ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা হয়েছে। বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা তেমন কিছু বড় ছিল না। ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারও তাঁর "History of Freedom Movement in India", গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, ১৯৬২, পৃঃ ৫৩৩-৫৩৪) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণেও (১৯৭১, পৃঃ ৪১২) ডাঃ মজুমদারের অভিমত অপরিবর্তিত দেখতে পাই